প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭
এপ্রিল ১৯৬০

Original Title ALIDAMELE (*Kannada*)
Bengali Translation MRITYUR PARE

ডিস্ট্রিবুটার
সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি
22, রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা-1

ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নিউ দিল্লী-16 কর্তৃক প্রকাশিত এবং নব মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড, 170এ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-4 হইতে মুদ্রিত।

ভূমিকা

উপন্যাস তো লিখলাম, তবে ভূমিকা লেখবার উৎসাহ তো পাচ্ছি না। উপন্যাস পড়ে যদি তার উদ্দেশ্য বোঝা না যায়, তো ভূমিকা দিয়ে আর কতটুকু বোঝা যাবে? তাই ভূমিকা লেখার আগ্রহ আমার নেই।

তবে মাঝে মাঝে কিছু বলবারও তো ইচ্ছে যায়, তা প্রকাশ করবার লোভ সামলাতে পারছি না। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে কি নিঃশেষ হয়ে যায়? না, কিছু রেখেও যায়? কি রেখে যায় তা খুঁজে বার করাই এ উপন্যাসের উদ্দেশ্য। মৃত্যুর পর বিগতজীবনের স্মৃতিটুকুই শুধু রয়ে যায়। পথিক যেমন পথ চলতে চলতে তার পদচিহ্ন রেখে যায়, তেমনি মৃত্যুর পর মানুষ কাকে কত প্রভাবান্বিত করেছে তা দেখে তার জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যেকের ধারণা মৃত্যুর পর সে কারুর মনে দাগ কেটে যাবে। কিন্তু এমন সৌভাগ্য আর ক'জনের হয়? এই উপন্যাসের যশবন্তের মত লোকও পৃথিবীতে জন্ম নেয়, সারা জীবন ধরে কত রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, অবশেষে একদিন এ জীবন থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়। এঁর সম্পর্কে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কারুর কাছে তিনি একেবারে নিজের লোক হয়ে গেছেন আবার এমন অনেকে আছেন যাঁদের কাছে তিনি কেউ নন। জীবদ্দশায় যাঁদের সঙ্গে ওঁর সম্বন্ধ ছিল, তাঁদের উপর উনি কিরকম ছায়াপাত করেছেন, তা দিয়েই আমি ওঁকে প্রস্ফুটিত করবার চেষ্টা করেছি।

উনি ছিলেন পথিক, সদাই পথ চলতেন। সামান্য পরিচয়ের পরই আমি ওঁর পদচিহ্নের অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলাম। আমি নিজের বিবেক দিয়ে ওঁর জীবনের মূল্যাঙ্কন করেছি। এই উপন্যাসে আমি একজন দর্শক মাত্র। 'বেটুদ জীব' উপন্যাসে আমার যে ভূমিকা ছিল তারই পুনরাবৃত্তি এতেও। তবে ওটা ছিল জীবিত অবস্থার সত্য, আর এটা হচ্ছে মৃত্যুর পরের সত্য।

মৃত্যুর পর আমাদের জীবনও কত লোকের দ্রষ্টব্য হতে পারে। তারা হয়তো আমাদের বুঝতে চেষ্টাও করবে, তবে সফল হবে কিনা তা জানা নেই। জীবনে আমরা যা কিছু করি, যা কিছু বলি, তার স্মৃতি আশেপাশে ছড়িয়ে থাকে। এভাবে সবার স্মৃতি জগতের চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। মৃত্যুতেই জীবন মুছে যাবার নয়। মানুষের ধর্ম জীবনকে সার্থক করা।

ছাপা হয়ে গেলে, আমার উপন্যাস আমি বন্ধুদের কাছে পাঠাই। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের মতামত স্পষ্ট লিখে জানান, কেউ আবার সাক্ষাতে বলেন। আমার একজন তরুণ বন্ধু শ্রী বি. এ. তুঙ্গ এই ধরনের মানুষ। এই উপন্যাস লেখবার সময় তাঁকে একবার চিঠি লিখেছিলাম, "আজ আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। সম্প্রতি নূতন ধরনের বেশ কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। কোনটা সুখের আবার কোনটা-বা দুঃখের। তবে দুঃখই বেশী—তাই উপন্যাস লিখছি, আশা করছি এটা লিখেই আমার দুঃখ লাঘব হবে।"

উপন্যাস লেখা শেষ করে ছাপাতে দিলাম। আশা ছিল, বেদনায় অভিভূত অবস্থায় রচিত আমার এ উপন্যাস পড়ে এই বন্ধুটি আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন। কিন্তু সেদিন আর এলো না। উপন্যাস ছেপে বেরুতে বেশ কিছুদিন লেগে গেল। ইতিমধ্যে বন্ধু তুঙ্গের এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো। তাই এ উপন্যাসটি তাঁরই স্মৃতিতে উৎসর্গ করছি। উনি আমার চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের ছোট। স্বপ্নেও ভাবিনি এ বইয়ের সমালোচনা না করেই উনি চলে যাবেন।

তুঙ্গ বাককুত্তরতে জন্মেছিলেন, সেটা আমার জন্মস্থান থেকে পাঁচ মাইল দূরে। আমাদের পরিচয় মাত্র সাত আট বছরের। ১৯৫১ সালের নির্বাচনের সময় উনি প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার সংবাদদাতা হয়ে আমাদের গ্রামে এসেছিলেন। তখনই আলাপ।

পরে পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হল। তুঙ্গের রং ফর্সা, একহারা চেহারা। চোখে সর্বদাই একটা দুষ্টুমির হাসি। স্মিতমুখ ও উজ্জ্বল চোখ প্রখরবুদ্ধির পরিচায়ক। তার উপর মিষ্টভাষী।

উন্মুক্ত উদারহৃদয় আর প্রখর বিচারশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। দুঃসাহসিক হওয়ার দরুণ এত অল্প বয়সেই, পত্র-পত্রিকাতে এবং পি. টি. আই-এর সংবাদ-প্রতিষ্ঠানে, উচ্চস্থান অধিকার এবং যথেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ওঁর বন্ধুর সংখ্যা নগণ্য ছিল না। পাকিস্তানে দু-তিন বছর পি. টি. আই-এর সংবাদদাতা ছিলেন। ভারতসরকার ওঁর কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন। আয়ুব খাঁর প্রেসিডেন্ট হবার খবর উনিই সবচেয়ে আগে প্রকাশ করেন। পণ্ডিচেরীর আন্দোলনে আশ্রমের কতটা হাত ছিল সে খবরও উনিই প্রথম দিয়েছিলেন। মৃত্যুর দু-এক মাস আগে তাঁর নেফা যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আসামের বাস-দুর্ঘটনায় ওঁর মৃত্যু হ'ল। ওঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আকাশবাণী থেকে তৎকালীন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডঃ কেশকর সমবেদনা জানিয়ে বার্তা প্রচার করেন ; তাঁর যোগ্য সম্মান।

গরীবের ছেলে। ছোটবেলায় পিতাকে হারিয়েছিলেন। তারপর মাও গেলেন তাঁকে অনাথ করে। শুধু এস. এস. এল. সি. পর্যন্ত পড়েছেন। কিন্তু অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের গুণে জীবনে উন্নতি করতে পেরেছিলেন। নিরহঙ্কার মানুষ, অর্থলোলুপও নন। লোকচক্ষুর অন্তরালে মানবসমাজে যা কিছু ঘটে, তার অন্তস্থল পর্যন্ত দেখবার সাহস ছিল ওঁর।

মৃত্যুর পর যশবন্তবাবু যেমন তাঁর স্মৃতি রেখে গেছেন, তেমনি তুঙ্গও আমাদের বন্ধুদের মনে গভীর রেখাপাত করে গেছেন।

আজ তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি কথা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হৃদয় আমার তাঁর সঙ্গে অবিরত আলাপে মুখর।

29. 1. 1960

পুত্তুর, দঃ কঃ —শিবরাম কারন্ত

এক

এ জীবন যেন একটি যাত্রা। প্রথম সাত আট বছর তো আমরা নিজেরাই নিজেকে চিনি না। শৈশবে মা-বাপ ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন চারপাশে ভিড় করে আসে। তবুও শৈশবের সব স্মৃতি ধূমিল হয়ে যায়। বাল্যকালে বাড়ি ও পাঠশালায় সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাধুলা আরম্ভ হয়। তখনকার বন্ধুদের কথা বেশী মনে থাকে। তবে এগুলোও স্পষ্ট মনে থাকে না। লেখাপড়া শেষ হলে যৌবনের প্রারম্ভে কত সুমধুর স্মৃতি থাকা সত্ত্বেও সংসারের ঝামেলায় পড়ে সব বন্ধুরাই প্রায় স্মৃতি থেকে মুছে যায়। বাছা বাছা অল্প কয়েক-জনের কথাই শুধু মনে পড়ে।

তারপর একেবারেই অন্য পরিবেশ। জীবনের রঙ্গমঞ্চে নিত্য নূতন নটের আবির্ভাব। তার মধ্যে কেউ-বা হিতৈষী, কেউ-বা সহায়ক, আবার কেউ-বা আমাকে তুচ্ছ করে দূরে সরে যায়। খুব কম লোকেই হৃদয়ে গভীর দাগ কাটতে পারে। বৃদ্ধাবস্থায় প্রায় সব স্মৃতিই লোপ পায়, অন্য সবার সঙ্গে সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়। সে সময়ে সুখ-দুঃখের সঙ্গী খুঁজে পাওয়া ভার। ষাট-সত্তর বছরের জীবনযাত্রায় যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, যাদের সঙ্গে গল্পসল্প খেলাধুলায় কেটেছে, যাদের নিয়ে সাংসারিক সম্পর্ক গড়েছে ও ভেঙেছে তাদের সংখ্যা বোধহয় হাজারের কোঠায় পড়ে। এতো লোকের সঙ্গে সম্পর্কে আসা সত্ত্বেও পৃথিবী থেকে যখন বিদায় নিই, তখন যেন নিতান্ত একলা ও অনাদৃত। ভাগ্যবান বিদায় নেবার সময় অন্ততঃ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব একটু কাঁদবে, বা না কাঁদলেও, 'আহা বেচারা চলে গেল, এ বয়সে তো যাবারই নিয়ম' ইত্যাদি বলে মর্মবেদনা প্রকাশ করবে।

কত দীর্ঘ এ যাত্রা। না জানি কবে এর আরম্ভ।. কতরকম ও কি কি ভাবে শেষে তার এই পরিণতি, জানি না। আয়-ব্যয়ের হিসাবে বাঁচে শুধু ঘরবাড়ি আর কিছু টাকাকড়ি। সে চলে গেছে, তার মৃত্যুতে আমাদের জীবনে একটা অভাববোধ জাগাবার মত ভাগ্য আর ক'জনেরই বা থাকে?

এরকমই জীবন। বিরাট নাটকের এক ক্ষণিক দৃশ্য। গ্রামে গ্রামে বেড়ানো। একটি যাত্রা আর কি। কার্যসূত্রে আমরা বাসে, গাড়ীতে বা জাহাজে সর্বদাই যাতায়াত করি। ভাগ্য-অন্বেষণে, কাজের সন্ধানে, সুখ-সুবিধার আশায় আমরা, আপনি, সকলেই এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাই। জাহাজ ও রেলেও যাত্রা করা চলে। তখন বাইরে কি হচ্ছে, না হচ্ছে সে দিকে আমাদের নজরই থাকে না। তখন আমরা চলার পথে। যে গাড়ী বা জাহাজের যাত্রী তাতে অগুন্তি সহযাত্রী দীর্ঘযাত্রায় বেরিয়েছে। গাড়ীতে বা জাহাজে যাত্রাকালে যতক্ষণ না গন্তব্যস্থানে পৌঁছই ততক্ষণ ওটাই আমাদের বাড়ি। গাড়ীতে যদি ভিড় থাকে তো নূতন যাত্রীদের আমরা নিজের শত্রু ভাবি। কেউ কেউ চুপচাপ সামনে বসে শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ আবার দিনের বেলায়ও বিছানা পেতে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকার ভান করে। নূতন যাত্রীকে একটু বসার জায়গা দেবার কথা প্রায় কারুরই মনে হয় না। জায়গা না থাকলে তো কোন কথাই নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েই যেতে হয়। তখন বসে থাকা যাত্রীদের উপর রাগ হয়। মনে হয় আমরা সবাই যেন পিজঁরাপোলে রাখা জন্তু। অনেকের শোরগোল অসহ্য হয়ে ওঠে। বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে গেলে তবুও বন্ধুদের সঙ্গে আলাপে-আলোচনায় রেলের কষ্ট ভুলে থাকা যায়। কেউ আবার অপরিচিত সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ করে তদণ্ডেই বন্ধুত্ব করে নিয়ে গালগল্পে সময় কাটিয়ে দিতে পারে আর একটি ছোট্ট নমস্কার করে গন্তব্যস্থানে নেমে যায়। তারপর কোথায় সে আর কোথায় তারা।

যারা সর্বদা যাতায়াত করে তাদের মধ্যেও নানা রকমের লোক।

ইংল্যাণ্ডের মত দেশে রেল যাত্রায় নানারকম অভিজ্ঞতা হয়। ওখানে কেউ কারুর জায়গা জুড়ে বসে না। যারা জায়গা পায় তারাই বসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা পাশাপাশি চুপচাপ বসে থাকে। বই থাকলে পড়ে। আপনার দেশ কোথায়? কোথায় যাচ্ছেন? কি কাজ করেন? কতো উপার্জন করেন ইত্যাদি প্রশ্নবাণে কেউ কাউকে জর্জরিত করেন না। গাড়ীতে চড়ার উদ্দেশ্য শুধু যাত্রা। কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা নয়। ভালো বা মন্দ হোক্ ওদের এই চিন্তাধারা।

বড় উৎসাহে যাত্রা শুরু করে শেষে তিতবিরক্ত হয়েছি এমন ব্যাপারও কতবার ঘটেছে। সেসব ঘটনা আপনাদের শোনাতে চাই না। শুধু আমার প্রবাসকালের মনস্তত্ত্বের একটু বিশ্লেষণ করতে চাই। বেশী ভিড় আমার সহ্য হয় না। লোকে যখন খুব মুখর হয়ে ওঠে তখন আমি একেবারে চুপ। দেখে যাই গাড়ীতে যাত্রীরা উঠছে, নাবছে। কেউ কেউ আসন-প্রাণায়াম করছে। শবাসনে বসে আছে। যখন ভিড়ের চোটে শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয় তখন রেগে হা-হুতাশ করি, কখন গাড়ী থেকে নামবো। সেইজন্য কয়েক বছর হলো মনস্থ করেছি যে একটু বেশী ভাড়া দিয়ে বরং আরাম করে যাওয়া ভালো। তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়া আমার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠেছে। ইন্টার ক্লাস মানে আজকালকার দ্বিতীয় শ্রেণী, তাতে যাওয়া বরং ভালো, আর সে সামর্থ্যও আমার আছে। তবে স্বাধীনতার পর দেশের মধ্যবিত্ত লোকের মত রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীরও শোচনীয় অবস্থা। ওটাকে শুধু দামের তারতম্যে উঁচু শ্রেণী বলা যায়। নতুবা ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি তৃতীয় শ্রেণীর চেয়ে কম নয়। তাই নিজের সুবিধার জন্য আজকাল আমি প্রথম শ্রেণীতেই ভ্রমণ করি। সেখানে সবই যে আমার মনোমত তা নয়। টিকিট নিয়ে আগেই নিজের জায়গা সুরক্ষিত করে নিতে কোনও অসুবিধা নেই। একপাশে পা ঝুলিয়ে বা আসনপিঁড়ি হয়ে বসা আমার স্বভাব। তবে সহযাত্রী যে কত রকমের বলা যায় না। প্রথম শ্রেণীর টিকিট

কেনার পরই কেউ ভাবে এটা আমার বাড়ি, আর কারুর প্রবেশ নিষেধ। গোটা চার-পাঁচ বিছানা, আট-দশটা তোরঙ্গ, ফলের ঝুড়ি, জলখাবারের কৌটো, বাচ্চাদের কমোড—এসব লটবহর নিয়েও যারা ভাবে টাকার পুরোপুরি মূল্য উসুল করতে পারে নি, তেমন যাত্রীরও অভাব নেই। কারুর ব্যবহার দেখলে মনে হয় পুরো গাড়ীটাই কিনে ফেলেছেন। শুধু টাকা হলেই তো লোক সভ্য হয়ে যায় না? তবুও এরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের থেকে অন্ততঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাই যাত্রাটা একটু বেশী সুখকর হয়ে ওঠে। তাছাড়া এখানে অত ভিড়ের কষ্টও নেই, রাতে আরামে ঘুমোনও যায়।

আমি নিদ্রার ব্যাঘাত করতে একেবারেই রাজী নই। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে আমার জীবনের কোন সময়টা সবচেয়ে সুখের আমি তৎক্ষণাৎ বলি, ঘুমোবার সময়, তখন সুখ-দুঃখ, সব থেকে মুক্ত। তবে হ্যাঁ, আমার ঘুমেরও একটা সীমা আছে। অনেকের মত প্রথম শ্রেণী দেখেই আমার ঘুম আসে না। দিনের বেলা ঘুমোতে চাই না, কিন্তু ঘুম পেয়ে গেলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নি। বাকী সময় জেগে থাকতে হয়। তখন বই পড়ি বা নীরবে বসে থাকি। এসময় সহযাত্রীদের কথাবার্তা চুপচাপ শুনি। নিজে মুখ খুলি না। ভাগ্যবশতঃ ভালো সহযাত্রী জুটে গেলেও যে কথা বলব না তাও নয়। কখন কখন এরকম লোক পেয়েও যাই। এঁদের মধ্যে কারুর স্মৃতি আমার মনে এখনও অম্লান; সে অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

এমন একজনের কথাই আমি বলতে যাচ্ছি। একবার বেশ কিছুক্ষণ যে বৃদ্ধের সঙ্গ পেয়েছি, যদি বলি তাকে নিয়েই এই উপন্যাসটি লিখছি, আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। এঁর সঙ্গে আলাপ হবার পরে ওঁর প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম, পরে ঘনিষ্ঠতা হয়। বেঁচে থাকতেই উনি আমার জীবনে গভীর রেখাপাত করেন। মৃত্যুর পর তাঁর কোন কোন আত্মীয়স্বজনকেও আমি দেখেছি যাঁরা ওঁকে ভালবাসতেন। ওঁর একটা ডায়েরী পেয়েছি—এসব

থেকে একটি চরিত্র খাড়া করার সুযোগ হয়েছে। গোটাকতক দৃশ্য ও চিত্র আছে যাদের মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদি জানতাম ওঁর একক জীবন এতো অভিজ্ঞতাপূর্ণ আর আমি তা নিয়ে উপন্যাস লিখবো, তাহলে আমার এ লেখা আরো বেশী সজীব হত। সে অবস্থায় .উপন্যাস না লিখে একটি জীবনীই লিখতাম। যে সব সমস্যা নিয়ে আমি আজ জড়িয়ে পড়েছি, উনি বেঁচে থাকলে তাঁর কাছেই সেগুলির মীমাংসা করে নিতে পারতাম। মাত্র পাঁচ-ছ বছর হলো ওঁর সঙ্গে পরিচয়, তার মধ্যে বছরে ছু-একবারই আমাদের দেখাশুনা হয়েছে। মনের মত বন্ধু পেলে আমি যত বেশী কথা বলি তার তুলনায় আমার বন্ধুটি খুবই স্বল্পভাষী ছিলেন। প্রথম প্রথম আমাদের মধ্যে নামমাত্র কথাবার্তা হত। প্রায় পাঁচ বছর পরে আমরা সহজে মন খুলতে পেরেছিলাম। চিঠিপত্রের প্রয়োজনও বোধ করিনি। ওঁর বাড়িতেই আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হত। গ্রামে ফিরে আমি ওঁর আর কোনো খোঁজখবর নিতাম না। দেখবার ইচ্ছে হলে আমি তাঁকে চিঠিতে জানাতাম। উত্তরে সাদর আমন্ত্রণ জানাতেন, আমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

চিঠিপত্রের আদান প্রদান শুধু ওটুকুই। ওঁর জীবনের শেষ ছু-বছরে তো কালেভদ্রে চিঠি দিতেন। আমিও উত্তর দিতাম। গুরুজন বলে শ্রদ্ধা করতাম। আমি বয়োকনিষ্ঠ বলে ওঁর চিঠির উত্তরের আশা করতাম না। বয়সোচিত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কোনো ব্যাপারে যখন তিনি আমার পরামর্শ চাইতেন আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম। দ্বিধায় পড়তাম।

ওঁর চিঠি পড়ে বুঝতে পারতাম উনিও অনেকের মত জীবনের নানারকম সমস্যায় জড়িত। রীতিমত জটিল প্রশ্ন, আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া কঠিন হতো। শেষে কোনরকমে একটা কিছু গোলমেলে জবাব দিয়ে রেহাই পাবার চেষ্টা করতাম। খুব সংক্ষিপ্ত জবাবেই সারতাম। সত্যি বলতে কি, শুধু তর্ক করার জন্য তো ওঁর প্রশ্নগুলি নয়? জ্ঞানে, বিচারে উনি আমার থেকে বড়; চিঠিতে

সে ভাবটাও থাকত না। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যে গভীর ও শাশ্বত প্রশ্ন জাগে, তা কি তর্ক করে বোঝানো যায়? আমাদের জীবনের এ এমন প্রশ্ন যা আমাদের বিশ্বাস ও আস্থার গোড়া ধরে নাড়া দেয়। অন্ধ শ্রদ্ধায় এর সমাধান হবার নয়। এ অবস্থায় ওঁর প্রশ্নের সদুত্তর দেবার সাহস আমি কোত্থেকে পেতাম? খুব বেশী হলে লিখে দিতাম, "আপনার মত আমারও সন্দেহ তাই।"

পাঠকদের কাছে আমার এ ভূমিকা নিশ্চয় ধাঁধাঁর মত লাগছে। আমার বন্ধুর জীবনও একটি ধাঁধাঁই বটে। ওঁর শেষ চিঠিতে উনি লিখেছিলেন, "আপনি বোম্বাই আবার কবে আসছেন? মাস তিন আগে এসেছিলেন ঠিকই। কিন্তু আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে। ক্ষমা করবেন। মন বলছে, আপনাকে আর দেখতে পাবো না। জানি না কেন। তাই আমার ইচ্ছা,' যত শীগ্গির সম্ভব আপনি চলে আসুন। আবোল-তাবোল কিছু লিখে রেখেছি আমি; এখনও কাউকে দেখাই নি। দেখাবার ইচ্ছেও নেই। জীবন থাকতে ওসব কাউকে দেখাবোও না। কিন্তু লেখাটা ব্যর্থ হয় তাও চাই না। লেখাগুলি আপনাকে দিয়ে যেতে চাই। আশাকরি আমার মৃত্যুর পরে আপনি পড়বেন—এর বেশী আর কিছু চাই না।

"আরেকটি কথা: আমাদের কয়েকজন পূর্বপুরুষ ও ঋষিরা সংসার ও সৃষ্টির বিষয়ে নানারকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, এই সত্য, এ পরম সত্য। বেদ বা উপনিষদ কিংবা যাকে ঈশ্বরের বাণী বলা চলে, তাতে আমার কিন্তু সবসময়ই একটা সংশয়। বিশ্ব ও 'সৃষ্টির সম্বন্ধে আমিও পড়েশুনে কিছু জেনেছি। সমগ্র সৃষ্টির এ অনন্ত যাত্রা। না জানি কবে থেকে আরম্ভ; এর লক্ষ্য কি তাও জানি না।' তারপর যাত্রার বহুদিন পরে পথে এক স্টেশনে কোনো এক মানুষ যাত্রীর মত এ গাড়ীতে উঠেছে, আবার একসময় নেবেও গেছে। কিন্তু জীবনযাত্রা এখনও চলমান। তার লক্ষ্য এখনও অজ্ঞাত। এখনও অনেক দূর। এখন কেউ যদি গর্ব করে বলে, 'আমি এর কারণ জানতে পেরেছি.' সেটা কি হাস্যাস্পদ হবে না?"

এই ধরনের কথাতেই ভরা ছিল ওঁর চিঠিটা। ওঁর প্রশ্ন যেন সমস্ত ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের গোড়ায় কুঠারাঘাত করল।

নিজের জীবনকে সবদিক দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝেছিলেন, যা কিছু জানেন সে সবও সম্পূর্ণ সত্য নয়। গোটাকতক প্রশ্নের ছোটখাটো যে মীমাংসা তাঁর ডায়েরীতে লিখে গেছেন সেটা শুধু কল্পনা হতে পারে না। আমি বেঁচে থাকতে আমার লেখা কেউ পড়বে না, এরকম কথা যে বলতে পারে, সে তো প্রশংসা পাবার জন্য লিখছে না। তাহলে ? কেন লিখছেন ? কার জন্য লিখছেন ? ওতে কি আছে ? —এরকম অনেক প্রশ্ন আমার মনে ভিড় করে এল। যতদিন পর্যন্ত উনি বেঁচে থাকবেন ওঁর লেখা পাওয়া সম্ভব নয়। উনি আমার কাছে এমন আশা কেন করলেন ? আমার শুধু একটা কথাই মনে হল, বাইরের জীবনে তৃপ্তি না পেয়ে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়েছেন। এমন কি কারণ হতে পারে যার জন্য উনি নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন ? আমার মনে হয়, উনি হয়ত ভেবেছেন ওঁর আত্মকথা বোধহয় অন্যের হাসির উদ্রেক করবে। তবে মৃত্যুর পর যদি তাঁর রচনা নিয়ে কেউ ঠাট্টা-তামাসা করে তাতে ওঁর কিছু এসে যাবে না।

তখন বোম্বেতে আমার কোনও কাজ ছিল না। বরং ঠিক করে-ছিলাম মাস তিন চার আর আমার বোম্বে যাবার কোনো দরকার নেই। অবশ্য একবার ইচ্ছেও হয়েছিল, যাই বোম্বে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। কিন্তু আলস্যবশতঃ হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া অনেক ঝামেলায়ও তখন পড়েছিলাম। এসব ছেড়েছুড়ে বোম্বে চলে যাবার তাগিদ পাইনি। তাই ওঁর মৃত্যুর আগে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। একদিন বোম্বে থেকে একটা 'তার' পেলাম—"আপনার ভাই অসুস্থ, শীগ্গির চলে আসুন।" ওঁর প্রতিবেশী আমাকে ওঁর ভাই ভেবেছেন। নিশ্চয়ই আমার বন্ধু ওঁকে তাই বলে থাকবেন। তক্ষুনি বোম্বাই যেতে হ'লো। কিন্তু উনি তাঁর বাড়ীতে ছিলেন না। পাড়ার লোকের থেকে জানলাম ওঁকে কে. ই. এম. হাসপাতালে

ভর্তি করা হয়েছে। তাড়াতাড়ি ওখানে গেলাম। ভাবলাম উনি আমায় দেখতে চেয়েছেন—আমি ছাড়া ওঁর কোনো বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজন নেই বোধহয়। আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু উনি আমাকে যেরকম বিশ্বাস করতেন তার কি উপযুক্ত ছিলাম? হলে ওঁর চিঠি পেয়েই কি আমি তৎক্ষণাৎ বোম্বে চলে আসতাম না?

ওঁর কি অবস্থা এখন তো হাসপাতালে গেলেই জানতে পারব। ওঁর প্রতিবেশীরাও ওঁর অসুখটা কি, সঠিক বলতে পারলেন না। একজনের কাছে জানতে পারলাম যে উনি একটা কাগজের টুকরো দেখিয়েছিলেন যাতে আমাব নাম লেখা ছিল। তখন ওঁর খুব জ্বর। দু-তিন দিন ধবে কেউ জানতে পারেনি। তারপর ডাক্তার ডাকা হল—তিনি বললেন এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যান। তখন আমায় 'তার' করা হল।

হাসপাতালে ছুটলাম। কিন্তু আমার হাসপাতালে পৌঁছুবার একটু আগেই ওঁর শব মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আমার আসাই সার হ'ল। ওখানে থাকাটাও না থাকারই মতো। তবুও আধঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে বইলাম। সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তভাবে যেন ঘুমিয়ে আছেন। কিন্তু বেশীক্ষণ সেভাবে থাকতে পারিনি। আমাকে বলা হ'ল, "যা করবার চটপট করে ফেলুন।"

'তার' পেয়ে যখন এখানে এসেছিলাম তখন ভাবতেও পারিনি যে আমাকে এসবও করতে হবে। বোম্বেতে আর কে কে বন্ধু আছে চিন্তা করলাম। হাসপাতাল থেকে বাইরে এসে টেলিফোন করে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ডেকে নিলাম। ওঁর সাহায্যে আমার বন্ধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কবলাম। কিন্তু তারপর?

আবার ওঁর বাড়িতে আমার কি যাওয়া উচিত? আমি কে? উনি কে ছিলেন? আমি ওঁর বন্ধু বটে। আমার বন্ধুকে হারালাম আমি, সেটা আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু উনি যা রেখে গেছেন তার উপর আমার কি অধিকার? এসব ভাবতে লাগলাম। বোম্বের বন্ধুটি বললেন: "ও কিছু নয়। ওঁর বাড়িতে আপনি যান।

ওঁর ঘরে যে সব জিনিস আছে সে সব নিয়ে ওঁর আত্মীয়স্বজনের কাছে পাঠিয়ে দিন। এতো আপনাকে করতেই হবে। আপনার উপর এতো বিশ্বাস ছিল বলেই তো আপনার নাম নিয়েছিলেন?” বন্ধুটির সঙ্গে আমি ওঁর বাড়ি গেলাম। প্রতিবেশীদের অনুমতি নিয়ে ঐ একদিন আমি ওঁর সব জিনিসের মালিক হলাম।

উনি মালাবার হিলে থাকতেন। আপনারা বোধহয় জানেন ধনী লোকরাই মালাবার হিলে থাকেন। কিন্তু বড়লোকদের অট্টালিকার আশেপাশে অনেকগুলি গরীবের কুঁড়েঘরও আছে। এককালে যে সব বাড়ি বড়লোকদের ছিল পুরনো হয়ে যেগুলো এখন প্রায় গরীবের কুঁড়েঘরে পরিণত হয়েছে। আমার বন্ধু এরকম একটি বাড়িতে থাকতেন। ‘বেক-বে’ সমুদ্রের ধারে একটি ছোট্টখাট্টো পৃষ্ঠভূমি, ‘আউট হাউসের’ মত। একতলায় দোকান ও পেছনে একটি গরীব গৃহস্থের বাসা। এই দোতলা বাড়িটা বেশ বড়। একটা কুঁড়েঘরের মুখ ছিল সমুদ্রের দিকে। সামনের দিকে দুটি পরিবার থাকত। সিঁড়ির পাশের বাড়িটাই ছিল স্বর্গীয় বন্ধু যশবন্ত রাও-এর। তিন ঘরের ফ্ল্যাট। বোম্বেতে তিনটে ঘরের ফ্ল্যাট মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে পাওয়া খুবই কঠিন। বড় বড় ঘরে খুবই আলো-বাতাস। এর অন্যদিকের বাড়িতে যাঁরা থাকতেন তাঁদেরই আমি প্রতিবেশী বলেছি। ওরা পার্সী। বাড়ীর কর্তা জামশেরবাবু কনট্রাক্টার। উনিই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন।

আমার এই বন্ধুটির নাম মাধব রাও। ইনি বোম্বেতে বছর কয়েক ধরে ব্যবসা করছেন। যশবন্ত রাও-এর বাড়ীতে পৌঁছুতে পৌঁছুতে অন্ধকার হয়ে গেল। আমার বন্ধুটি দরজা খুলে, আলো জ্বেলে বেতের চেয়ারটায় বসলেন। আমি বললাম, “মাধব রাওবাবু, আপনি আমার জন্য অনেক কষ্ট করলেন। এখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, আপনিও নিশ্চয় খুব ক্লান্ত। আমার খাওয়ার কথা আজ ওঠে না, রাত্রে আমি এখানেই থাকবো। কি করা যায় কাল সকালেই ভাবা যাবে।”

মাধব রাওবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার সঙ্গে ওঁর পরিচয় বহুদিনের, না ?" ইতিমধ্যে কারুর পায়ের শব্দ শোনা গেল।

আমি বললাম, "কাল আপনাকে সব বলব।"

প্রতিবেশী কনট্রাক্টার বাবু ঢুকলেন। খোলা দরজা ও আলো দেখে অভ্যাসবশতঃ 'হ্যালো' বললেন, যশবন্ত রাও-এর নাম নিতে গিয়েই হঠাৎ চুপ করে গেলেন। উনি আমাদের কাউকেই চিনতেন না। অবশ্য আমাকে এক-আধবার দেখেছেন। এখন আমার নামও জেনে গেছেন। বললেন, "আমি হাসপাতালে যেতে পারিনি। জানেন তো, আমি কাজের মানুষ। বলুন তো, যশবন্তবাবু এখন কেমন আছেন ?"

আমি হাতের ইশারায় জানালাম তিনি আর নেই, আর সঙ্গে সঙ্গেই বললাম যে, "এইমাত্র দাদরে আমার বন্ধুর শেষকৃত্য সমাধা করে এলাম।"

তা শুনেই একেবারে ঘাবড়ে গিয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন, "কি, মারা গেছেন ?" তাড়াতাড়ি নিজের স্ত্রীকেও ডেকে এ খবর দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই চলে এলো। দুঃখিত স্বরে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার নামই কানতি, না ?

"তাই ধরে নিতে পারেন।"

"না, না ঠিক করে বলুন।"

"কান্তি।"

"আর আপনি ?" মাধব রাওবাবুর দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমার বন্ধু, মাধব রাওবাবু।"

জামশেরবাবু বললেন, "কান্তিবাবু, আপনি বছরে দু-একবার আসতেন বলে আপনাকে আমার মনে আছে। ওঁর বিষয় আপনি সব জানেন নিশ্চয়। উনি আপনার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন, না ? আমিও ওঁর ঘনিষ্ঠতমদের একজন। আমরা দুজনে একই সময়ে বা একই মুহূর্তে এই বাড়িতে এসেছি। তখন যুদ্ধের ভয়ে বোম্বে থেকে

লোকেরা পালাচ্ছিল। তাই এ বাড়ি এতো সস্তায় পেয়েছিলাম। যশবন্তবাবু কথা বেশী বলতেন না। আমার ছেলেমেয়েরা ওঁকে 'দাদা' বলতো। আমার স্ত্রীও ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। ছোটদের সঙ্গে ছাড়া উনি আর সকলের সঙ্গে খুব কম কথা বলতেন। আমার ছেলেমেয়েরা যখন ওঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করত বা ওঁর কাছে কিছু চাইত, উনি ওদের গল্প শোনাতেন কিংবা ওদেব ছবি আঁকতেন। ওঁকে খুব বড় শিল্পী অবশ্য বলা চলে না, তবে উনি একজন নির্লিপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। যেমন সবল, তেমনি বুদ্ধিমান। তাঁর বয়সকে সম্মান দেখিয়ে এ কথা বলছি ভাববেন না। ওঁর সরলতা আর চিন্তাশীল চেহারায় কি যেন একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠত, না?"

আমি সায় দিলাম, "ঠিক বলেছেন।"

"কখনো কখনো উনি আমার সঙ্গেও কথা বলেছেন, কিন্তু এত কম যেন এক চুল এধার ওধার হবার জো ছিল না। উনি বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতেন। আজে বাজে কথা বলতেন না। সত্যি, ওঁর জীবন ছিল মহৎ। আপনার কেমন লাগত ওঁকে?…আমি তো ভাবতেও পারি নি, ওঁকে এতো শীগ্গির হারাতে হবে। পরশুই কে. ই. এম. এ গিয়ে ওঁর খবরাখবর নিয়েছিলাম। ওরা বলল, বোধহয় 'সেরিব্রাল ইনাবসিয়া'। তাছাড়া যে ডাক্তাবকে আমি ডেকে এনেছিলাম তিনিও বাঁচবাব আশা দেন নি।…একেই বলে নিয়তি আর কি? টেবিলের উপর কাগজেব একটা টুকরোয় লেখা ছিল 'উইল য়ু কনটাক্ট দিস ফ্রেণ্ড ফর মি?' তাই আপনাকে টেলিগ্রাম করি।"

বললাম, "তার জন্য আপনাব কাছে কৃতজ্ঞ।"

"উনি নেই তাই এ ঘরটা একেবারে ফাঁকা। বিপদে-আপদে ছিল অদ্ভুদ ধৈর্য। সর্ব্বদা আমায় সাহায্য করতেন। একবাব জানি না, কেমন করে উনি জেনে ফেলেছিলেন আমাদের টাকাব টানাটানি যাচ্ছে। নিজেই এসে বললেন, 'যদি দরকার হয় কিছু টাকা দিতে পারি।' তখনই এক হাজার টাকার চেক আমায় লিখে

দিলেন। ওঁর কাছে এতো টাকা আছে জানতাম না। ওঁর পরিবারের কথা জিজ্ঞাসা করলে কোনো জবাব দিতেন না। আমি ভাবতাম, ওঁর ছেলেরা বড় হয়ে গেছে, বাইরে চাকরী করছে, তারাই ওঁকে টাকা পাঠায়। সেদিন না চাইতেই এতগুলো টাকা দিয়ে দিলেন। পরে ওঁকে ও টাকাটা ফেরৎ দেওয়ায় আমার মান রক্ষা হল।…দু-তিন মাস পরে পরে একবার উনি মহাবালেশ্বর, পুণা, বোর্ডী ঘুরে আসতেন। ফটো তুলতেন। তখন ওঁর বাড়িটা একেবারে ফাঁকা লাগত। উনি এখানে থাকলে বাড়িটা যেন গমগম করতো।”

ওঁর কথা শেষ হলে আমি মাধব বাওবাবুকে বিদায় দিলাম। কনট্রাক্টরবাবুও তখুনি ‘আসছি’ বলে বাড়ি চলে গেলেন। ওখানেও উনি বোধহয় যশবন্তবাবুর কথাই বলছিলেন ; ওঁর স্ত্রী ও দুটি ছোট ছেলেমেয়েব কান্নার আওয়াজ সমানে ভেসে আসছিল। আমি কি যে করবো কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি কেন এসেছি ? এখন কি করবো ? মাথায় কেবল প্রশ্নগুলোই ঘুরছিল। কোনো উত্তর পাচ্ছিলাম না। চেয়ারে বসে বসেই তন্দ্রা এল। আমি জানতে পারিনি কখন জামশেরবাবু এসেছেন, কখন বলছেন “আপনি ক্লান্ত, ঘুমিয়ে পড়ুন না—। কিন্তু খাওযার…?…উনি অসুস্থ হবার আট দিন আগেই দাদা তো ঝগড়াঝাঁটি করে চলে গেছে। পাঁচ বছর ধরে ওঁর ছায়ার মত ছিল। একদিন ধার চেয়েছিল, উনি দেন নি। রেগে গিয়ে বলেছিল, ‘আপনি কি মরবার সময় এ টাকা সঙ্গে নিয়ে যাবেন ?’ উঃ, কিরকম বেইমান আব অকৃতজ্ঞ ছিল লোকটা ! খাওয়া পরা ছাড়া ও চল্লিশ টাকার বেশী মাইনে পেত। তবুও সন্তুষ্ট ছিল না।”

জামশেরবাবু বলেই চললেন, “ওব স্পর্দ্ধা দেখে যশবন্তবাবু বললেন, ‘মরবার সময় কি হবে তা তো জানি না, দাদা। পয়সা তো দূরের কথা নিজের শরীর পর্যন্ত এখানেই ছেড়ে যাব।…এরকম কথা তোমার বলা উচিত হয়নি। যেদিন তুমি টেবিল থেকে একশো টাকা সরিয়ে ছিলে, আর কত রকম দিব্যি গেলে সব কিছু অস্বীকার

করেছিলে—তখনই আমি বুঝেছি তুমি মানুষ নও। তখন থেকেই তোমার হাতের বাড়া অন্ন আমার রোচেনি। তবুও আমি তোমাকে চাকরী ছাড়তে বলি নি। তবে হ্যাঁ, এবার বলতেই হবে—তুমি চলে যাও, আর না।' খুবই দুঃখিত হয়ে উনি বলেছিলেন, 'দেখ দাদা, পয়সা আসে আবার চলেও যায়। আমি উপার্জ্জনও করেছি, হারিয়েওছি।···তবে বিশ্বাস একবার ভাঙ্গলে আর ফিরে পাওয়া খুবই মুশকিল।' শুনে দাদা বলল, 'আপনার বিশ্বাস পাবার জন্য কে মাথা ঘামাচ্ছে? টাকার অহঙ্কার হয়েছে বুড়োর।' দাদা যখন গালাগালি দিচ্ছিল আমার স্ত্রী এসে ওকে বকে বাইরে বের করে দিলেন। তারপর থেকে উনি নিজেই স্টোভে চা ও টোস্ট তৈরী করে নিতেন।"

জামশেরবাবুর স্ত্রী ছোট বাচ্চাদের হাতে আমার জন্য দুধ, পাউরুটি, ফল ও মাখন পাঠিয়ে দিলেন। আমার মনে হচ্ছিল যেন যশবন্তবাবু আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। যেন দাদাকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন। আমি খাবার দিকে না দেখাতে জামশেরবাবু বললেন, "নিন, এগুলো ধরুন।" আমি বললাম, "ক্ষিধে নেই।" সত্যিই ক্ষিধে ছিল না আমার।

"সকাল থেকে আপনি কিছু খাননি নিশ্চয়···"

"হ্যাঁ, কাল থেকে···"

"ও, তাহলে তো খেতেই হবে। ভাইয়ের জন্য মন কেমন করা স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি তো জানেন মৃত্যুকে কেউ এড়াতে পারে না।"

"মৃত্যুর জন্য অত দুঃখ নেই। এক মাস আগে উনি আসতে লিখেছিলেন। তখনই আমার আসা উচিত ছিল। ওঁর থেকে অনেক কথা জানার ছিল।"

"উনি খুব উদার ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের দশ কথার উত্তর উনি এক কথায় দিতেন। আমি তো ওঁর এত কাছাকাছি ছিলাম তবুও উনি বেশী কথা আমার সঙ্গে বলতেন না। ···আচ্ছা উনি আপনার কে?"

এ প্রশ্নের জবাব তক্ষুনি দেবার সাহস ছিল না। অবশ্য বলতে পারতাম, বন্ধু। তাহলে ওঁর সম্পত্তি ছোঁবার অধিকার থাকে না। তা আমার দরকারও নেই, কিন্তু উনি আমায় ওরকম চিঠি কেন লিখে-ছিলেন তা তো জানতে হবে। ওঁর কাগজপত্র থেকে ওঁর আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা বের করতে হবে। তাই জামশেরবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি একটু দ্বিধান্বিত হলাম।

উনি নিজেই বললেন, "খুব সম্ভব ওঁর দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয়।"

আমি সায় দিয়ে দিলাম। ঘুমে ও ক্লান্তিতে আমার চোখ বুঁজে আসছে। জামশেরবাবু খাওয়াবার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। কি যে খেলাম কিছুই মনে নেই। ক্লান্তি, ঘুম, মৃত্যু, দুঃখ, স্মৃতি সব একসঙ্গে মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। একটু দুধ বোধহয় আমি খেয়েছিলাম। জামশেরবাবু চলে গেলে, দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে কাছেই যে পুরনো সোফাটা ছিল তার উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। সারারাত স্বপ্নের ঘোরে কাটল। আমি যেন অসুস্থ আর যশবন্তবাবু আমার মাথায় হাত রেখে বসে আছেন। যেন বলছি আমার মরতে ভয় করছে। উনি অভয় দিচ্ছেন, 'ভয়ের কি আছে? এখানকার কাজ তো এখন শেষ হয়ে গেছে, না? তুমি যে কাজের জন্য এসেছিলে তা তো হয়ে গেছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু কাল কি হবে?"

উনি বললেন, "কালকের ভাবনা কেন?"

"তাহলে, আমার নিজের কি হবে?"

"থাকবেন না।"

"তারপর? পুনর্জন্ম?"

"কি জানি।"

"হবে না?"

"সে ভাবনা তোমার কেন? তুমি শুধু আজ আছো, গতকাল ছিলে না, আসছে কালও থাকবে না।"

স্বপ্নের ঘোরে এসব কথার পরই আমি গাঢ় নিদ্রায় ডুবে গেলাম। জানালা দিয়ে সকালের রোদ ঘরে এসে পড়ায় উঠে পড়লাম। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছিল। আমার মুখ্যে যেন নতুন জীবনের উন্মেষ হল। যশবন্তবাবুর স্মৃতিই ওঁর মৃত্যুর সব বেদনা লাঘব করে দিয়েছিল। আমরা যখন কোনো নাটক দেখি, নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে নিজেদেব তুলনা করতে থাকি। নাটক শেষ হলে বাড়ি ফিরে আসি। সাধারণ নাটক আমরা সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাই। কিন্তু উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নাটক বহুদিন পর্যন্ত আমাদের মনে ছাপ রেখে যায়।

যশবন্তবাবুকে প্রায় মনে পড়তো। তাঁব স্মৃতি অত্যন্ত মধুর। অবশ্য উনি এখন আমাকে কোনরকমই কিছু দিতে পারেন না। তবুও আমার জীবনে উনি যে স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছেন তা ভোলবার নয়। সে স্মৃতি অন্তরে বাঁচিয়ে রাখা বা হারিয়ে ফেলা আমার নিজের উপর নির্ভর করে। আমি ভাবলাম তাঁব গাম্ভীর্যময় চরিত্রের যে স্মৃতি আমাব হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে, আমার নিজের জীবনে তা বহন করে বেড়ানো—সেটা কি তাঁর পুনর্জন্ম নয়?

যশবন্তবাবুকে হয়তো আমি মোট আট দশবার দেখেছি। ওঁর স্মৃতি আমার হৃদয়ে রেখে এখন আমি তা রোমন্থন করছি। আমার মনে হয় যদি ওঁকে আমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে ওঁর জীবনের ঘটনা প্রবাহ আমায় পথ দেখাবে।

উঠে আড়মোড়া ভাঙ্গলাম। মুখ ধুয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ মুছতে মুছতে দেয়ালের দিকে দৃষ্টি পড়ায় দেখলাম, আয়নার দুপাশে গোটা আট-দশটি ছবি রয়েছে। এগুলো যশবন্তবাবুরই আঁকা। ছবি আঁকতে ও ফটো তুলতে উনি খুব ভালবাসতেন। কোনো ট্রেনিং উনি নেননি। আর টেকনিকের তো ধারই ধারতেন না। কিন্তু সখ মেটাতে, সময় কাটাতে এসব নিয়ে উনি বেশ আনন্দে থাকতেন। আমি ওঁর ছবিগুলো বেশ কয়েকবার দেখেছিলাম। অবশ্য যশবন্তবাবু নামকরা শিল্পী হতে পারেননি, কিন্তু যখন যা মনে আসত তাকে রূপ ও রং দেবার জন্য তখনই বসে পড়তেন।

ছবিগুলো দেখে মনে হল শুধু সময় কাটাবার জন্যই এগুলো আঁকতেন ; কারণ ওতে কোনো বড় শিল্পীর ছাপ ছিল না। চিত্র-কলায় নিজের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হন নি। যেমন বিদেশে গিয়ে সেখানকার ভাষা না জানলে শুধু হাত মুখ নেড়ে ইশারায় আমাদের কাজ চালিয়ে নি সেইরকম উনি যদি ছবিতে তাঁর ভাবের প্রকাশ করে থাকেন, তাতে আমাদের কারুর কিছু বলবার নেই।

আমার কৌতূহল হলো— এইসব ছবিতে উনি কি বলতে চেয়েছেন ? অনেকক্ষণ ধরে দেখার পরও কিছুই বোধগম্য হলো না।

ভাবলাম কোনো হোটেলে গিয়ে চা খেয়ে আসি। তারপরই ওঁর বিষয় সম্পত্তি দেখে যথাসম্ভব শীঘ্র গাঁয়ে ফিরে যাই।

দুই

সেদিন কিন্তু আমি মাধব রাওবাবুর প্রতীক্ষা করিনি। উনি ছুটি নিয়ে বেশ সকাল সকালই এসে পড়লেন। আমাদের দুজনেরই অবস্থা তথৈবচ। কি যে করবো দুজনের কেউই জানতাম না। প্রতিবেশী জামশেরবাবু সকালবেলা এসে নমস্কার করে চলে গেলেন। আমরা দরজা বন্ধ করে এখন কি করা যায় ভাবতে লাগলাম। সব চেয়ে আগে আমি যশবন্তবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার সব কথা মাধব রাওবাবুকে জানালাম। আমার সন্দেহের কথাও পাড়লাম। জানি না, যশবন্তবাবু আমার কাছ থেকে কি রকম সাহায্য চেয়েছিলেন। মাধব রাওবাবু বললেন, "ওর কাগজপত্র দেখবার পরই সব বোঝা যাবে।" আমরা সেইমত কাজ আরম্ভ করলাম। ওঁর ঘরের বাক্সগুলো সব বইপত্রে ভরা ছিল। পরিষ্কার হাতের লেখা দু-একটি হিসাবের খাতা, ব্যাঙ্কের পাসবুকও। পাসবুক দেখে বোঝা গেল শুধু পাঁচদিন

আগেই পনেরো হাজার টাকা তোলা হয়েছে। শেষে জমা করা হয়েছে প্রায় দেড় হাজার টাকা। যে টাকা তোলা হয়েছিল তার কি হলো ? সে টাকাটা তো বাড়িতেই থাকার কথা, না ? ওঁর চাকর, দাদা চুরি করে পালায় নি তো ? সন্দেহ হতে লাগল। রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লাম। যদি সত্যিই তাই হয় তো পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে না জানা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। আমি ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেলাম। এ অশান্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমি প্রতিবেশী কনট্রাক্টারের স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদা কবে কাজ ছেড়েছিল ?" জানতে পারলাম টাকা তোলার আগেই দাদা কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। তবুও সন্দেহ ঘুচল না। ওঁর অসুখের সময় চুপি চুপি আসেনি তো ? প্রতিশোধ নেবার জন্য ওঁর খাবারে বিষ মেশায় নি তো ? নানারকম সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল।

যশবন্তবাবু কাদের চিঠিপত্র লিখতেন আমরা খুঁজতে লাগলাম। গোটাকতক চিঠি পাওয়া গেল। বাকীগুলোর কোনো হদিস পাওয়া গেল না। উনি লিখেছিলেন অনেক জরুরী চিঠিপত্র রেখে যাচ্ছেন। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। ঘরে যত কাগজপত্র ছিল খুঁটিয়ে পড়লাম কিন্তু কাজের কিছু না পেয়ে বিরক্ত হলাম। ভাবলাম দেয়ালে টাঙ্গানো ওঁর জামার পকেটে কি আছে দেখা যাক। পকেটে একটা চেকবুক ও ডাকঘরের রসিদ পেলাম। রসিদটা দেখে বোঝা গেল উনি আমার নামে ডাকঘর থেকে একটা রেজিষ্ট্রী পাঠিয়েছেন। এছাড়া পকেটে একটা ব্যাগ ছিল যাতে ১৫০ টাকা ছিল। তবে ব্যাঙ্ক থেকে তোলা অতগুলো টাকার কি হল তা জানা গেল না। ওটা যদি চুরি গিয়ে থাকে তো এ দেড়শো টাকাই বা এখানে রয়ে গেল কি করে ? আবার ভাবলাম যতক্ষণ না রেজিষ্ট্রীর খবর পাই ততক্ষণ দাদার উপর সন্দেহ করা বৃথা।

শুধু ভেবে কি হবে ? আমরা দুজনে মিলে ঘরের সব জিনিষ-গুলোর লিস্ট তৈরী করলাম। ছবিগুলো জড়ো করে একটা বাক্সে

পুরে দিলাম। যে বইগুলো উনি পড়তেন সেগুলোও দেখলাম। বেশীর ভাগ বই, মতবাদ, ধর্ম ও দর্শনের উপর। বইগুলোতে জায়গায় জায়গায় লাল নীল পেন্সিলের দাগ দেওয়া ছিল। কোথাও কোথাও প্রশ্নচিহ্ন ও আশ্চর্যচিহ্ন। তবে কি নিয়ে ওঁর মনে আলোড়ন চলতো, তা জানতে তখন আমি ব্যগ্র ছিলাম না। বন্ধুর মৃত্যুর বেদনা ছাড়া তখন আমার প্রধান চিন্তা, তাঁর সে টাকাটা কি সত্যিই হারিয়ে গেল ? যে সব জিনিষ ছিল সেগুলো একসঙ্গে বাঁধার পর বাক্সে যা কাগজপত্র পেয়েছিলাম, সেগুলো আগাগোড়া পড়তে আরম্ভ করলাম। কাগজগুলোয় যারই ঠিকানা পাওয়া গেল তাদের বিষয় জানবার কৌতূহল আমাদের হতে লাগল। ভাবতে থাকলাম যশবন্তবাবুর সঙ্গে ওদের সম্বন্ধ কিরকম। এদের মধ্যে এরকম লোকও ছিল যারা ওঁর কাছে টাকা চেয়েছিল। আবার এরকম লোকেদেরও চিঠি ছিল যাঁরা সাহায্য পাওয়ার দরুণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ওঁর চিঠি ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এসেছিল। মনে হল যশবন্তবাবু টাকা তুলতেন আর বিলিয়ে দিতেন। অনেক লোককে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন—কাউকে প্রতি মাসে আবার কাউকে বা ছ-মাসে। হিসাবের শেষে দেখা গেল যে আলাদা আলাদা খাতায়, পনেরো হাজার, দেড় হাজার আর দেড়শো টাকা বাঁচবার কথা।

যাদের ঠিকানা জানা গেল তাদের একটা ফিরিস্তি করলাম। কয়েকটা চিঠিতে ওঁর টিপ্পনী ছিল : 'যোগ্য নয়।' 'দান গ্রহণ করার যোগ্যতা তো চাই' ? 'কতবার চাওয়া' ? 'নিজের পায়ে কবে দাঁড়াবে' ? এরকম মন্তব্য উনি অনেক চিঠিতে লিখে রেখেছিলেন। বাড়িওয়ালার হিসাব থেকে জানা গেল সারা বছরের ভাড়া দেওয়া আছে। অর্থাৎ তিনমাসের ভাড়া বাকি, ন মাসের ভাড়া আগাম দেওয়া রয়েছে। এ সব বাদে আমাদের দু-একদিন কেটে গেল। এর মধ্যে আমি বাড়িতে তার পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, "বোম্বে থেকে আমার নামে কোনো রেজিষ্ট্রী এসে থাকলে টেলিগ্রাম করো।" উত্তর না

আসা পর্যন্ত আমায় অপেক্ষা করতে হবে। জামশেরবাবুদের কাছে যশবন্তবাবুর দৈনিক কার্যক্রম জানা গেল। অবসর পেলে মাধব রাও-বাবুর বাড়ি গিয়ে পরে কি করবো না করবো পরামর্শ নিতাম, আর ওখানেই খাওয়াটা সারতাম। তারপর যশবন্তবাবুর পুরনো সোফাটায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতাম, কিন্তু কিছুতেই যখন মন বসত না আর বই পড়ারও ধৈর্য থাকত না তখন ওঁর বাক্স খুলে ছবিগুলো দেখতাম। তখন আমার শুধু এই কাজ। আগেই বলেছি, চিত্রকলা ওঁর পেশা ছিল না। উনি দামী ক্যানভাস কিংবা অয়েল কালারের মত দামী জিনিষ ব্যবহার করেন নি। পেন্সিল, ক্রেয়ান, পেস্টল, ওয়াটার কালার দিয়ে ছবি আঁকতেন। সব বিষয়ের ওপর ছবি। এরকম প্রায় একশোটা ছোট বড় ছবির মধ্যে মাত্র আট-দশটা আমার মনে ধরেছিল। বৈচিত্র্য বা সৌন্দর্যের জন্যে ছবিগুলি ভাল লাগেনি, তার কারণ এগুলি থেকে শিল্পীর স্বভাবের পরিচয় পাওয়া আমার পক্ষে দুষ্কর। টেকনিক না জানলে রঙ বা রেখার কেরামতি কিছুই বোঝা যায় না। ছবির বিষয়টা যে কি তা না জেনে আমার মত আনাড়ির পক্ষে অর্থ বের করা খুব কঠিন। কয়েকটা ছবিতে উনি নিজের নাম লিখেছেন, আর ছবিগুলো কি নিয়ে তাও। এ রকম ছবি বেছে আলাদা করে রেখেছিলাম।

বোম্বে আসার ছ-সাত দিন পরে স্ত্রীর 'তার' পেলাম—'ড্রাফট্, উইল, ম্যানাসক্রিপট রিসিভড।' টেলিগ্রাম পেয়ে আরও আশ্চর্য হলাম। উইল কি রকম? আমাকে টাকা পাঠাবার কি কারণ থাকতে পারে? যার সঙ্গে হঠাৎ একদিন পরিচয় হয়েছিল তার ওপর এতো বিশ্বাস? কি করে অত টাকা পাঠালেন? যাই হোক, টাকাটা চুরি যায়নি এটাই সবচেয়ে বড় কথা। ভাবলাম বাড়ি ফিরলে জানা যাবে ও টাকাটা কোথায় পাঠাতে হবে। আর এও তো আশ্চর্য, উনি কি করে বুঝলেন এতো শীঘ্রির উনি মারা যাবেন? আমাকে লেখা একটা চিঠিতে এ ধরনের কথা তো ছিলই। অনেক ব্যবস্থা তিনি তো বেশ সজ্ঞান অবস্থাতেই করে গেছেন। মৃত্যু

আসন্ন জেনেই বোধহয় এসব করে গেছেন। হতে পারে হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু বিছানা নেবার পর জ্বরের মধ্যে কি এতশত করতে পারতেন? নিজেই কি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারতেন? আমায় এসব পাঠালেন কি করে? কিংবা ওঁর যে অসুখ হয়েছিল সেটা সেবিত্রিক ম্যালেরিয়াও হতে পারে। ডাক্তারের রোগ নির্ণয়ে ভুলও হতে পারে। জ্বর বাড়ার আগেই উনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন আর বাঁচবেন না।···এই রকম সব নানান চিন্তা আমার মাথায় ঘুরতে লাগল। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, ওঁর বিষয়সম্পত্তির আমিই একমাত্র অধিকারী এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে বোম্বে থেকে রওনা হলাম।

গাঁয়ে পৌঁছে আমার নামে আসা কাগজপত্রগুলো না দেখা পর্যন্ত আমার যেন কোন হুঁশ ছিল না। বার বার যশবন্ত-বাবুর জীবনের ঘটনা-প্রবাহ একটার পর আরেকটা সাজাতে চেষ্টা করলাম। আমার ওপর কি ধরনের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে বোম্বে থেকে মঙ্গুকরের জাহাজে চড়লাম। জাহাজে প্রায় পাঁচশো যাত্রী ছিল। কিন্তু আমার মনে হলো আমি যেন একা। নীল সমুদ্রে জাহাজটা যেমন একা ভেসে যাচ্ছিল তেমনি সেই জনসমুদ্রে আমিও একা। এরকম ভাবে দুদিন কাটল। তৃতীয় দিন মঙ্গুকর বন্দরে জাহাজ পৌঁছুল। ওখান থেকে বাড়ি যেতে আরও দুঘণ্টা লাগল। ভারী ভারী বাক্সগুলো তাড়াতাড়ি কুলির মাথায় চাপিয়ে বাইরে এলাম। বাড়ি পৌঁছে চাতালের ওপর বাক্সগুলো নামাতে না নামাতে আমার অবস্থা একেবারে কাহিল। চোখের সামনে শুধু যশবন্তবাবুর ছবিই ভাসছিল।

বোম্বে থেকে ফিরে, নেয়ে ধুয়ে খেয়ে, একটু বিশ্রাম করবার পর রেজিস্ট্রী কাগজটা চাইলাম। রেজিস্ট্রীর প্যাকেটটা বিশেষ বড় ছিল না। তার মধ্যে ওঁর ডায়েরী ছিল—একটা ছোট্ট বই যাতে উনি নিজের মনের কথা স্বল্প বাক্যে ব্যক্ত করেছিলেন। বইটা

বেশ পুরনো। গত আট দশ বছরের অভিজ্ঞতা উনি শুধু খেয়াল-খুশী মত লিখে রেখেছেন। সময় পেলেই বইটা ভালো করে পড়া যেতে পারে। আমার নামে একটা চিঠিও ছিল, তাতে অনেক কিছু লেখা। সঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে তোলা পনেরো হাজার টাকার একটা ড্রাফ্ট। ড্রাফট দেখেই আমি লজ্জিত হলাম, দাদাকে অনর্থক সন্দেহ করেছিলাম। দ্বিতীয় কথা, এত বেশী টাকা আমাকে এতো বিশ্বাস করে, এত দূরে আমার নামে ড্রাফটে কেন পাঠানো হ'ল? এ দায় আমি কেমন করে মেটাব? ওঁর চিঠি পড়ার পরও এ সমস্যা থেকেই গেল। চিঠির প্রথমেই লেখা ছিল—"এ ড্রাফট আপনার নিজের জন্য পাঠাচ্ছি না। আমার ধারণা আর বেশীদিন আমি বাঁচবো না। যদি তাই হয় তাহলে আপনিই আমি, এই ভেবে এটাকে খরচ করবেন। একাজ সহজ নয় তা আমি জানি। আমি না থাকলেও আমার ইচ্ছা, এ টাকাটা ভালো কাজে ব্যয় করা হোক্। যে সে লোক তো দানের পাত্র হতে পারে না। আপনি যেমন ঠিক বুঝবেন সেইমত খরচ করবেন। আমার আশ্রিত তিন চার জন আছেন, তাঁদের প্রত্যেককে প্রতিমাসে পঁচিশ টাকা করে পাঠাবেন। সেটা মূল টাকা থেকে দিন কিংবা সুদ থেকে। ওঁদের যেন বরাবর এ সাহায্য দিয়ে যাওয়া হয়। এঁদের আমি কিছু না কিছু সাহায্য করে এসেছি।"

ওঁদের সকলের ঠিকানাও চিঠিতে দিয়েছিলেন। চিঠির পরের অংশে সবিস্তারে লিখেছেন। তার সারাংশ তুলে দিচ্ছি—

"অনেক দিন থেকেই আমি আপনার সঙ্গে এ সব বিষয় আলোচনা করতে ইচ্ছুক। আপনাকে আর কেন কষ্ট দি, সেটা ভেবেই যখন আপনি এসেছিলেন, কিছু বলতে পারিনি। পরশু হঠাৎ আমার মনে হ'ল, আর আমি বেশী দিন নেই। মৃত্যুর ভয় আমার নেই। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে কারুর কিছু লাভ হলো কি? এই প্রশ্নই আমার মনকে বার বার খোঁচা দিচ্ছে

এ জীবনে যতো নিয়েছি তার চেয়ে দেওয়াটা আমার যেন কোনও অংশে কম না হয়, এটাই আমার অস্বস্তির কারণ। আমি এটা বুঝতে পারছি না। এটার সঙ্গে টাকার কোনো সম্পর্ক নেই, এ হলো মানুষের জীবনের হিসাব-নিকাশ। ব্যক্তি সমাজের কাছে ঋণী। মরবার সময় পর্যন্ত যে ঋণ, সেটাকে যে শোধ দিয়ে যায় তারই জন্ম সার্থক। তা না হলে ওর জন্ম সমাজের অকল্যাণ করবে। আমার চিন্তাধারা এইরকম। এইরকম ভাবলে টাকা পয়সার কোনও মূল্য নেই। কিন্তু জীবনধারণের জন্য তো তার দরকার।

"ইয়াল্লাপুর মহকুমার একটি গাঁয়ে আমার বাল্যকাল কেটেছিল। আমি বেশ অবস্থাপন্ন ঘরেই জন্মেছিলাম। লেখাপড়াও করেছি। আমি যখন কিশোর তখনই আমার পূর্বপুরুষের সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলাম। অন্যদের দুঃখ আমি সহ্য করতে পারতাম না। আমার দয়া বেশী ছিল। সে সময় যে কেউ আমার কাছে এসে কেঁদে পড়েছে তাকে মুঠো মুঠো টাকা বিলিয়েছি। আমার ভগ্নীপতি, মামা, আত্মীয়স্বজন সবাই আমায় সাবধান করেছে। ওঁরা বলেছিলেন, তুমি অনর্থক বেশী খরচ করো। ওঁরা ঠিকই বলতেন, আমি খুব খরচে ছিলাম। পরের উপার্জিত টাকা সবাইকে দান করার অধিকার কি আমার ছিল? কিছুদিন পরে এটা বুঝতে পারলাম। যা ছিল তা শেষ হবার পর কষ্টে পড়ে বুদ্ধি এলো। এর প্রতিক্রিয়া হ'ল সবার ওপর অবিশ্বাস।

"পঁচিশ বছর ধরে কিছু বাছবিচার না করেই তাড়াহুড়োয় জীবন ক্ষয় করেছি তা বলতে আজ আমার দ্বিধা নেই। এরই মধ্যে আমার বিয়ে হ'ল, পুরোপুরি সংসারী হলাম। আমার একটি সন্তান হলো। তারপর থেকে আমার আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে লাগলো। ধার-কর্জ করতে লাগলাম আর সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগে অস্থির। এইভাবে আমি এ নিগূঢ় সত্য আবিষ্কার করলাম যে যতক্ষণ ফুলে মধু থাকে ততক্ষণই ভ্রমরের আকর্ষণ। তখনও আমি

সম্পূর্ণ নিরাশ হই নি. কেননা তখনও আমার কাছে পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাছাড়া লোকেদের যে ধার দিয়েছিলাম তা সবটা উসুল করা যায় নি। ভাবলাম, যাদের সম্পত্তি নেই তারাও নিজে খেটে বেশ ভালোভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে। তারপরই আমি জীবনের মোড় ফেরালাম। আমার মামার বাড়ীর কাছে কুমটা বলে একটা বড় গ্রাম আছে। আমি সেইখানে গিয়ে থাকতে লাগলাম। একজন ব্যবসাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে একেবারে নতুন করে জীবন আরম্ভ করলাম। প্রথম দিকে যথেষ্ট কষ্ট সইতে হলো. তবে পরিশ্রম করে কিংবা বলতে পারেন, অনুকূল পরিস্থিতির দরুণ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করলাম। যত নষ্ট করেছিলাম তার চেয়েও বেশী। কিন্তু এসব হবার পরও আমি বিশেষ সুখী হতে পারি নি। এ সাফল্য শুধু টাকার ক্ষেত্রেই রয়ে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম, লোকেদের উপর আমার মনে যে অবিশ্বাস ও বিরূপতা ছিল তার জন্যই এতো উপার্জ্জন করতে পেরেছি। টাকা থেকেই মোহ, ঈর্ষা, বিদ্বেষের উৎপত্তি। তার জন্যই স্ত্রী পুত্র পরিবার আমার শত্রু হয়ে উঠলো। সত্যিই আমার লোভ খুব বেড়ে গিয়েছিল। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার আশায়, আমার যা পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তার সঙ্গে নিজের কিছু সম্পত্তি যোগ করে স্ত্রী পুত্রের নামে করে দিয়ে একদিন গাঁ ছেড়ে পালিয়ে এলাম। বোম্বেতে আপনি যখন আমায় দেখেছিলেন সে সময় ওখানে একরকম বানপ্রস্থ জীবনই যাপন করছি। শুনেছি প্রাচীন— কালে গৃহস্থরা বানপ্রস্থে যেতেন। বনে না গিয়ে আমি বোম্বাই শহরের জনবহুল জায়গায় ক্রমে অজ্ঞাতবাস করতে লাগলাম। প্রতিবেশী কনট্রাক্টর জামশেদবাবু ছাড়া আর কারুর সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখতাম না। এই পার্সী পরিবারের সঙ্গেও আমি খুব বেশী মেলামেশা করি নি। চাকর দাদা ছাড়া কারুর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতাম না। দাদা শুধু পেটের জ্বালায় আমার চাকর হলো। কারুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না. কিন্তু দেখি সম্পর্ক রাখা ছাড়া গতি নেই। নিজের ছেলেপিলের মোহ কাটিয়ে

দাদার মোহে পড়লাম। ধীরে ধীরে সেও বুঝে নিল, একজন কাউকে না ভালবেসে আমি থাকতেই পারি না। চাকর হয়ে এলো কিন্তু আমার দাদা হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত আমার উপর ওর অধিকার আমার নিজের দাদার চেয়েও বেশী হয়েছিল। ওর সঙ্গে চাকরের মতো ব্যবহার করতে আমার বাধতো। চাইলে কি আমি ওকে একমিনিটেই তাড়িয়ে দিতে পারতাম না? কিন্তু দয়াপরবশ হয়ে ওকে বলেছিলাম, যতদিন বেঁচে থাকব ওর দেখাশুনা করবো। তাই ওকে অনেকদিন নিজের কাছে রেখে ছিলাম। কিন্তু ও আমাকে ঠকাতে আরম্ভ করলো। টাকা পয়সা চুরি করতে লাগল। পাড়া-প্রতিবেশীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে লাগল। তারপর নিজেই ঝগড়া বাধিয়ে চলে গেল। এক বছর হলো আমি একটু বেশী অশক্ত হয়ে পড়েছি। তবুও কুমটায় যে বন্ধুরা আছে তাদের কাছে ফিরে যাবার ইচ্ছা হয় নি। ওদের কোনো খবরও আমি রাখিনি।

"সেদিন পুণা থেকে বোম্বে পর্যন্ত আমরা দুজনে একসঙ্গে গিয়ে ছিলাম, মনে আছে তো? সেদিন থেকেই আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি। মনে হ'ল, আপনি যেন আমার জীবনের প্রতীক। যেন আমরা দুটি ভাই। আমি একলা এসে বোম্বেতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তবুও যেন মনে হ'ল আমার শেষসময়ে এখানে থাকা ঠিক হবে না। যখনই ভাবি কোথায় আমি যাবো, তখনই আপনার কথাই মনে হয়। আপনার সঙ্গে থাকলে আমার জীবনকাহিনী আপনাকে শোনাতে পারতাম। কিন্তু আমার জীবনের যে সব সন্দেহ, সমস্যা, জটিল প্রশ্ন আমাকে উদব্যস্ত করে রেখেছে তা এখন আপনার ঘাড়ে চাপাচ্ছি না তো? সেজন্য আপনাকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, আপনি কবে আসছেন? আমার জীবনকাহিনী আপনাকে শোনাবার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল। দাদা চলে যাবার পর থেকেই কেন জানি মনে হচ্ছে আমার জীবন নাট্যের অন্তিমদৃশ্য খুবই নিকট, যবনিকা পতন হতে দেরী নেই। যদি পর্দা না পড়ে, আপনার গ্রামে এসেও

পড়তে পারি কোনোদিন। পর্দা পড়লে আমার অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গেই তো শেষ হয়ে যাবে। হাজার হাজার অভিজ্ঞতার ভেতর কি আট দশটাও ভালো কথা বেরুবে না, যা অন্যদের শোনানো যায়? এইজন্য যা কিছু আমি লিখতে পেরেছি তা আপনাকে পাঠাচ্ছি।

"এদিকে তুদিন থেকে যখনই চোখ বুঁজি আমার মায়ের যে চেহারাটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম সেটাই ভেসে উঠছে। যেন তিনি আমায় ডেকে বলছেন, চলে এসো বাবা, নাটক শেষ হয়ে গেছে। তোমার কাজ তুমি সম্পন্ন করেছো। নাটকের পাত্রের ভূমিকা একদিন না একদিন শেষ হবারই তো কথা। সাজসজ্জাটা নির্বিচারে নষ্ট করে ফেলার চেয়ে ওটা ভাবী পাত্রের জন্য ছেড়ে যাওযাই সমীচীন নয় কি? আমি যা কিছু পাঠাচ্ছি তা এই নাটকীয় সাজসজ্জা।"

একটা অদ্ভূত চিঠি বটে। আমার পক্ষে এ এক অমূল্য উপহার। পনেরো হাজারের ড্রাফট এর কাছে কিছুই নয। এ টাকা ওঁর, ওঁর ইচ্ছানুসারেই খরচ করা হবে। বোম্বে থেকে উনি আমার এখানে এসে পড়লে আমি চিন্তা থেকে রেহাই পেতাম। ওঁর টাকার বিষয় যে তুশ্চিন্তা ছিল তা এখন দূর হ'ল। আমাকে এতো বিশ্বাসযোগ্য মনে করে উনি যে ডায়েরী পাঠিয়েছেন তাতে তাঁর স্মৃতির প্রতিটি মুক্তামালা খতিয়ে দেখতে হবে। যেসব ছবি এনেছি, তার চেয়েও ডায়েরিটাই বেশী মূল্যবান। আমার জানা দরকার, ওঁর জন্মস্থান কোথায়, কোথায় প্রতিপালিত হয়েছেন, ওঁর দাম্পত্যজীবন সার্থক ছিল কি না, সংস্কার কি রকম ছিল, আত্মীয়স্বজন ওঁর কেমন ছিল, কি রকম তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল, সুখের না তুঃখের—এসব আমায় জানতে হবে। শেষ পর্যন্ত যাঁদের উনি সাহায্য করেছেন তাঁরা কেমন লোক। ওঁদেরও তো আমার দেখা দরকার। ওঁর ইতিহাস জানতে পারলে অনেক মালমশলার জোগাড় হবে যা আমি আমার বংশধরদের দিয়ে যেতে পারি।

ওঁকে স্মরণ করতেই ওঁর কথাগুলি আমার কানে অর্থপূর্ণ হয়ে বাজছে। তবে এটুকু জানাই যথেষ্ট নয়। (উপনিষদ থেকে বা

বুদ্ধের মহাবাণী থেকে আমাদের ধর্ম্মের জ্ঞান হয়েছে ও হচ্ছে। অন্য-দের মত আমিও অবশ্য এসব একটু বুঝি। তবে আমার এ জ্ঞান যৎকিঞ্চিৎ। সমাজের কোন সময়ের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে সে সময়ের বিশ্বাস ও ধারণা নিয়েই লোকেদের কিছু ব্যক্ত করার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সেইসময় কেটে গেলে ও তৎকালীন অভিজ্ঞ মনীষীদের চলে যাবার পর তাঁদের বাণী আমাদের কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। একটা শব্দের অর্থ অনেক। এইসব শব্দ দিয়ে সূত্র রচনা করা হয়েছে। বুদ্ধের বাণী একরকম বাক্যে নিবদ্ধ। রামের বাণীকে বাল্মীকির মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। কিন্তু কৃষ্ণ কি নিজের বাণীকে নিজের ভাষায় রেখে গেছেন? তা কেমন করে বিশ্বাস করতে পারি? তাছাড়া যাঁরা ওসব কথা বলেছিলেন তাঁদের মৃত্যুর পর হাজার বছর কেটে গেছে. সে সময়ের সব কিছুই কালপ্রবাহে ভেসে গেছে। প্রত্যেকটা শব্দ তার মূল অর্থও হারিয়ে ফেলেছে। আবার বোধহয় তাকে নতুন অর্থ দেওয়া হয়েছে। আজ কি আমরা সে সব শব্দের মূল অর্থ জানতে পারি?)

যশবন্তবাবুর ডায়েরী কিছুক্ষণ পড়বার পর ওঁর কথাগুলি থেকে আমার সামনে ধীরে ধীরে কয়েকটি ছবি ফুটে উঠল কিন্তু ওঁর জীবনের সব কিছু কি আমি জানতে পেরেছি? তাই গোটাকতক আলগা ছবি জুড়ে জুড়ে তাঁর জীবনের পূর্ণ ছবি আমি রচনা করতে পারিনি। যাইহোক, এমন ভাবে কয়েকটা ছবি দেখার পর মনে হল এদের মধ্যে যেন একটা মিল রয়েছে। ছবি তো প্রবাহমান কালের দলিল মাত্র। একটি মুহূর্তের ভাবকে বেঁধে রেখেছে। ঐ ছবিগুলি কাকে প্রকাশ করছে? যদি তাঁকে সম্পূর্ণভাবে ফোটাতে পারা যায় তবেই সব বোঝানো যায়। আমার এ কথাগুলো ধাঁধার মত লাগছে নিশ্চয়। এ ছবিগুলিকে আমি যেমন দেখছি একটি গল্পের মত করে আমার ক্ষমতা অনুযায়ী আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। তার গল্প শোনাবার আগে যশবন্তবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের বিষয়ও কিছু বলি।

ছ-বছর আগের কথা। তখন গরমকাল। আমি খারবাড় থেকে বোম্বে যাচ্ছিলাম। আগের রাত গাড়ীতেই কেটেছিল। সকালে পুণায় পৌঁছে বোম্বের গাড়ী ধরলাম। প্রথম শ্রেণীতে চড়েই দেখলাম কামরাটা বেশ বড। আমি চড়ার আগেই সেটা লোকে ও জিনিষে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। আমার লাগেজ বেশী ছিল না, শুধু একটা বিছানা। বিছানাটা নিয়ে কুলী এক দরজা দিয়ে ঢুকলো, আমি অন্য দরজা দিয়ে। কুলীকে খুঁজে নিজের জায়গা পেতে বেশ বেগ পেতে হলো। জানালার পাশে বসে বাইরের দৃশ্য দেখার সাধ মিটল না। আমি এদিকেই বসে পড়লাম। জানালার কাছে একজন বৃদ্ধ বসেছিলেন। তাঁর বেশভূষা একেবারে সাদাসিদে। সামনে এক কালো সাহেবের পরিবার। বোধহয় গোয়া থেকে আসছেন। এমন হাবভাব যেন এইমাত্র লণ্ডন থেকে ফিরলেন। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার থেকে বছর দশেক বড় হবেন. উনিও স্যুটবুটধারী। সবাই একেবারে চুপচাপ বসেছিলেন।

তখন পর্যন্ত আমার জল খাওয়া হয়নি। কফি খাবার খুব লোভ হচ্ছিল। তাই চারিদিক দেখছিলাম।...পাশের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু হারালো নাকি ?"

এঁরই নাম যশবন্ত রাও।

"না। একটা চা-ওয়ালার খোঁজে ছিলাম। রাত্রিবেলা ঠিক খাওয়া হয়নি কি না !"

"চা—ওয়ালা ? এই এলো বলে, ওদের কাজেই তো এই।" গাড়ী ছেড়ে দিল। রেস্তোরার ছোকরারা দৌড়াদৌড়ি করছে। আমি হাততালি দিয়ে ওদের ডাকলাম। কিন্তু কেউ গ্রাহ্য করল না। আমার সাদামাটা পোষাক দেখেই এলো না নিশ্চয়। অন্যগুলো সাহেবের মধ্যে আমি 'হংস মধ্যে বকো যথা' লাগছি বোধহয়। আমার বৃদ্ধ সঙ্গীটি একটি বেয়ারাকে ডাকলেন। 'আসছি' বলে ছোকরা চলে গেল আর এলো না। তখন উনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্রেকফাষ্টে আপনার কি কি চাই ?"

আমি বললাম, "ও ছেলেটা তো কারুর জন্যই এলো না।"

"তা হোক্। আমিও তো চা খাবো এখন, আপনি কি খাবেন বলুন ?"

"ছেলেটা এলেই··· ।"

"টোষ্ট কফি ? কিংবা ওমলেট...?"

"আমি ওমলেট খাই না...।" বলতে বলতেই উনি উঠে সোজা ম্যানেজারের কাছে চলে গেলেন। আমার হয়ে উনি নালিশ জানালেন আর নিজেই দুটো ছেলে ধরে দু-প্লেট জলখাবার আনালেন। মজা করে বললেন, "এ ছেলেগুলো নিশ্চয় ভেবেছে আমরা দামী খাবার খাবো না।" আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। প্লেট দুটোতে টোস্ট, চীজ, ঝুরিভাজা ও কড়া কফি ছিল। খুব ক্ষিদে পেয়েছিল তাই তাড়াতাড়ি খেতে আরম্ভ করে দিলাম। খাওয়ার শেষে প্লেটগুলি নীচে নামিয়ে রাখলাম। ওগুলো নিয়ে যাবার জন্যও ছেলেগুলোকে ডাকতে হ'ল। সঙ্গে বিলও। শুধু একটাই বিল দেখে আমি আশ্চর্য হ'লাম। ব্যাগ বার করে পয়সা দিতে গেলে ভদ্রলোক আমায় নিরস্ত করলেন। "অর্ডার তো আমিই দিয়েছিলাম, ইচ্ছেটা তো আমারই ছিল, না ?" আমি বললাম, "আমার জলখাবারের বিলটা তো অন্ততঃ আমার দেওয়া উচিত।"

"ট্রেনে আবার আমার, তোমার কি ?

ভাবলাম, এ আবার কেমন লোক বাবা।

উনি বললেন, "একলা খাওয়ার অভ্যাস নেই, তাই এমন করেছি।"

"আপনি যে বড় ।"

"তা বয়সে হবো ।"

আমি শুধু একটু হাসলাম।

আমাদের গাড়ী সেসময় লোনাবকা ষ্টেশন ছেড়ে গিয়েছিল। খাণ্ডালা পাহাড়ের দৃশ্য বড়ই চমৎকার। কিন্তু আমি জানলার কাছে তো বসে নেই। ইচ্ছে করছিল উঠে দাঁড়িয়ে দেখি কিন্তু সামনের

সাহেব পা ছড়িয়ে বসেছিল। শুধু মাথা উঁচু করেই দেখবার চেষ্টা করলাম। বাইরের পৃথিবীর রূপে আমার মন মজে রইল। টানেলে গাড়ী ঢুকতেই সব অন্ধকার ; টানেল ছেড়ে যখন গাড়ী প্রথম বাইরে এল তখন আমার বন্ধুটি উঠে পড়েছেন। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "জানালার কাছে বসে পড়ুন।"

"না, না আপনি বসুন।"

"আপনার বাইরের দৃশ্য দেখবার বেশ ইচ্ছে দেখছি। আমি তো বছরে অনেকবারই পুনা যাই," বলে উনি আমায় টেনে জানলার ধারে বসিয়ে দিলেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলাম, ইনি কি অন্তর্যামী ? কিছুক্ষণ ওখানে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। পাহাড়ের দৃশ্য শেষ হতে চলল। এরপর দৃশ্য নিতান্তই সাধারণ, তাই আমি উঠে ওঁকে ওঁর জায়গায় বসতে অনুরোধ করলাম।

"আর তো শুধু দু ঘণ্টারই রাস্তা, আপনিই বসে থাকুন," উনি বললেন। ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাইছিলাম। কিন্তু আশে-পাশের লোকেদের হাবভাব দেখে জোরে কথা বলার সাহস হল না। ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?"

"বোম্বে।"

"আপনি বোম্বের লোক ?"

"না, না, আজকাল বোম্বেতেই থাকি। আপনি কি বোম্বে যাচ্ছেন ? আপনার মাতৃভাষা কি কন্নড় ?"

এতক্ষণ আমরা ইংরাজিতেই কথা বলছিলাম। আমার অদ্ভুত লাগল, উনি কি করে ধরতে পারলেন, আমি কন্নড়ের লোক। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি কন্নড়ভাষী, আপনি কি করে বুঝলেন ?"

"রেঁস্তোরার ছেলেগুলো না আসাতে আপনি বলছিলেন— 'অব্বাজন গকে', তাই।"

"আপনি কন্নড় জানেন ?"

"কন্নড় ভাষা অনেক দিন ব্যবহার করিনি। তবে মাতৃভাষা কি কখনো ভুলতে পারা যায়?"

"আপনার গ্রাম?"

"উত্তর কন্নড়ের (কারবার) একটি গ্রাম।...এখন বোম্বেতে থাকি।"

"চাকরী করেন?"

"হাঁ, নিজেরই চাকরী করি।"

"মানে, নিজের বিজনেস?"

"বিজনেসে মন বসেনি তাই ছেড়ে দিয়েছি। এখন স্বাধীন।"

"অবসর নিয়েছেন?"

"জীবন থেকে এখনও অবসর নেওয়া হয়নি।" বলে হাসতে লাগলেন। তারপর উনি আমার বিষয় খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। ওঁর মত সংক্ষেপে আমি উত্তর দিতে পারিনি...কথার পিঠে কথা বলে গেছি নিশ্চয়। নইলে অনায়াসেই নিজের নাম এবং আমার উদ্দেশ্য এক কথায় বলে দিতে পারতাম। আমার কথা শেষ হতে না হতেই দাদর এসে গেল। গাড়ী থামল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বোকার মত ওঁকে কিছু না বলেই নামতে যাচ্ছিলাম। তখনই মনে পড়লো. এখানে গাড়ী দশ মিনিট দাঁড়াবে। ওঁকে নমস্কার করে কৃতজ্ঞতা জানালাম: "আবার কবে দেখা হবে? আপনার নাম তো জানলাম না?" তবে আমি খুব সহজ হতে পারছিলাম না। উনি পকেট থেকে একটা ছোট কার্ড বের করে আমায় দিয়ে বললেন, "এই আমার নাম ও ঠিকানা। সময় পেলে আমার বাড়ি আসবেন। ধীরেসুস্থে কথা হবে।"

ওঁর থেকে বিদায় নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখি আমার দুজন বন্ধু অপেক্ষা করছিল। 'হ্যালো' বলে ওরা কাঁধে হাত রাখল। কিন্তু তখনও সে ভদ্রলোককে আমি ভুলতে পারিনি। ওঁর নাম যে যশবন্ত রাও সেটা তাঁর দেওয়া কার্ড পড়েই জানা গেল।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। অন্ধকারে কোনও বালকের

সামনে জোনাকী দু-একবার জ্বলেই নিভে গেলে তার মনের অবস্থা যেমন হয়, আমার অবস্থাও প্রায় সেই রকম দাঁড়িয়েছিল। বন্ধুরা যা জিজ্ঞাসা করছিল সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরও দিয়ে চলেছিলাম। ওরা ট্যাক্সী ডেকে জোর করে আমাকে ওদের বাড়ী নিয়ে গেল। আমার শুধু শরীরটাই ওদের সঙ্গে ছিল, মন যশবন্তবাবুর ব্যক্তিত্বে হারিয়ে গেল।

সেবার বোম্বেতে তিন চারদিন ছিলাম। একদিন সময় করে বিকেল চারটা নাগাদ ওঁর মালাবার হিলের বাড়িতে গেলাম। সমুদ্রের ধারে টালির একটা বাড়ি, কুঁড়েঘরই বলা চলে। ওরই দোতলার একটা ফ্ল্যাটে উনি থাকতেন। বাড়িটার একদিকে মালাবার পাহাড় আর অন্যদিকে সমুদ্রের মনমাতান দৃশ্য। বাড়ির উপর থেকে সমুদ্র দেখতে খুব ভালো লাগছিল। ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

তখন আমার বন্ধুর উপস্থিতির কথা বেমালুম ভুলে গেছি। এর মধ্যে ওঁর চাকর উপরে এসে রূঢ় ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি চান? এখানে দাঁড়িয়ে কেন?" সে-ই হলো এ গল্পের 'দাদা'। ওর উপরে ওঠার ভঙ্গী, কথা বলার ধরন সবেতেই এমনভাব যেন উনিই বাড়ির কর্তা। এ আমার অসহ্য লাগল। আমি ওর দিকে কটমট করে চেয়ে রইলাম। ও মুখ ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। আশ মিটিয়ে সমুদ্র দেখে, ফিরে এসে কড়া নেড়ে ডাকলাম, "যশবন্তবাবু।"

আমার গলা উনি চিনতে পারলেন। "আসুন, আসুন," বলে তক্ষুনি দরজা খুলে দিলেন। বেরিয়ে এসে আমার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। তারপর থেকে প্রায়ই আমি ওঁর বাড়ী যেতাম। বার কয়েক দাদাকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি যশবন্তবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু জানার পর থেকেই ওর ব্যবহার একেবারে বদলে গিয়েছিল। ও আমার খুব সম্মান করতে লাগল। যশবন্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কতক্ষণ এসেছেন?"

"মিনিট পনেরো হবে।"

"এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?"

"বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছিলাম। ভারী সুন্দর দৃশ্য। আপনি খুব ভাগ্যবান। এমন জায়গায় বাড়ি আপনার।"

উনি তখন দাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "উনি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন তুমি দেখনি ?"

দাদা আমতা আমতা করতে লাগল। তখন বললেন, "আমায় বলোনি কেন ?"

ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, "না, না, তা নয়, ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। আমিই ওর ভাবখানা দেখে জবাব দিই নি।"

উনি হেসে বললেন, "ওই এ বাড়ির কর্তা, এই মনে হলো তো ?"

আমি ভাবলাম যেহেতু দাদা অনেককাল ধরে ওঁর কাছে আছে তাই উনি নিশ্চয় ওকে বেশ ভালোভাবেই চেনেন। তারপর উনি বোধহয় ওর মান বাঁচাবার জন্য বললেন, "দাদা, আমার ও রায়বাবুর জন্য চা করো।" তা শুনে মনে হ'ল দাদা যেন কিছু প্রকৃতিস্থ হলো। দৌড়ে গিয়ে ফল, বিস্কুট, চা সব আনল, আর আমার দিকে আরেকবার তাকিয়ে চলে গেল। আমার আগ্রহ চেপে থাকতে পারলাম না, জিজ্ঞাসা করলাম, "এ বাড়িতে আপনি একলাই থাকেন, না ?"

"দাদা আর আমি।"

"ও আপনার আত্মীয় হয় ?"

"আমার আবার আত্মীয়। আমি ওর কাছে ঋণী", বলে হাসলেন। "এ প্রশ্ন অবান্তর। পূর্বজীবনের স্মৃতিটুকুও আমি রাখতে চাই না।...আমার নিজের বলার অনেক লোক আছে কিন্তু তাদের আমি চাই না। আমি শুধু নিজেকে নিয়েই থাকবো এই ভেবে এখানে এসেছি। এখানে দশ বছর কেটে গেল। এখন

আর কি? স্বাস্থ্য ভালো থাকলে কারুর সেবার প্রয়োজন হয় না। উদাসীন হয়েও দূর থেকে সংসারটাকে দেখা মন্দ কি?"

"কিছু কাজ না থাকলে সময় কি করে কাটে?"

"কাজ ছাড়া কি থাকা যায়? ঐ দেখুন, আমি শিল্পী বটে, তবে পাকা শিল্পী নই। বিলক্ষণ জানি আমার ছবি আঁকার কোনো জ্ঞান নেই, কিন্তু তবুও এ যেন এক পাগলের নেশা। তাছাড়া কিনে কিংবা লাইব্রেরী থেকে আনিয়ে বই পড়ি। দু বেলা বেড়াতে যাই। তারপরও যদি সময় না কাটে তো বাচ্চারা রয়েছে...তারা আমার বড় প্রিয়। যদি এতেও না হয়ে ওঠে তো পুণা, মহাবলেশ্বর, খাণ্ডালা ঘুরে আসি।"

"ওখানে কি করেন?"

"ছবি আঁকি। পৃথিবীকে দেখি। সাহিত্যিক হয়ে যদি আপনিই এরকম প্রশ্ন করেন...?"

আমি হেসে আমার ভুল স্বীকার করলাম।

"চিন্তা করাও একটা কাজ, সে সবাই জানে। কিন্তু সে চিন্তা সার্থক কি না, সেটা কে স্থির করবে? কেউ বলবে যারা চিন্তা করে তারা কুঁড়ে। যারা কুঁড়ে তারাও বলতে পারে আমরা চিন্তা করে দিন কাটাই।"

"আমি এ প্রশ্ন তুলে অনধিকারচর্চা করলাম না তো?"

"না, না, বলে যান। উত্তর দেওয়া না দেওয়া তো আমার হাতে। আমি নিজের মনোমত উত্তরই তো দেবো। যদি এই বলে দি কোন কাজই করি না, তো কে আমার থেকে কৈফিয়ৎ চাইবে? কিন্তু কাজ ছাড়া যে আমি থাকতেই পারি না। সময় কাটানো দুষ্কর হয়ে উঠলে আমি ও বাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশি, ছেলেমানুষ হয়ে যাই। নিজেকে ভুলে থাকি।"

এর মধ্যেই বছর দুয়েকের একটি পার্সী মেয়ে, "দাদা" বলে ডাকলো। বাড়ির দাদা উত্তর দিল না। যশবন্তবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, "ওর দাদা আমি," আর বাইরে গিয়ে মেয়েটিকে

তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে এলেন। বললেন, "স্নেহ ভালবাসা দিয়ে শিশুদের নিজের করে নেওয়াতেই সুখ।"

"তারা যত দিন ছোট থাকে তত দিনই একথা খাটে।"

"তা ঠিক। ওরা বড় হলে আমাদের কাছ থেকে সরে যায়, তাদের স্থান অন্য শিশুরা গ্রহণ করে।"

"তারা বড় হয়ে গেলেও কি তাদের সঙ্গে আমাদের সেরকম সৌহার্দই থাকতে পারে?"

"বড় হয়ে গেলে কি তাদের আর ছেলেমানুষ বলা চলে? তখন ওদের জগত একেবারে আলাদা। ওরা স্বাধীন। আমাদের স্নেহের তখন তাদের কোন প্রয়োজন থাকে না। অসহায় কিশোররাই আমাদের ভালবাসা, সহানুভূতির পাত্র।"

উনি ছোট মেয়েটিকে কোলে বসাতেই ও ঘোড়ার আবদার ধরলো। যশবন্তবাবু কাগজে ঘোড়ার ছবি এঁকে ওকে দিলেন। মেয়েটি এবার ঘোড়াটার গল্প শুনতে চাইল।

উনি গল্প আরম্ভ করলেন, "এক গ্রামে একটা ঘোড়া ছিল।"

মেয়েটি বলল, "শুধু একটাই?"

"না, না অনেকগুলো। এবার এক এক করে ওরা আসবে। তুমি দেখ না," বলে ওকে সান্ত্বনা দিলেন। গল্প চলতে লাগল, আমিও শিশুসুলভ কৌতূহল নিয়ে শুনতে লাগলাম। সেদিন ওঁর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তার সুযোগ হলো না। যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। জানতে চাইলেন, "আবার কবে আসছেন?"

"আসছে বছর।"

"নিশ্চয় আসবেন।"

যশবন্তবাবুর সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

তিন

নিজের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দাদার মত একটি চাকরকে এতকাল ধরে আত্মীয়ের মতই নিজের কাছে রেখেছেন—এটা সত্যিই বড় আশ্চর্যের কথা। সেবাশুশ্রূষা ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না তার। বলতে গেলে সেই বাড়ির কর্তা। এটা আমি মোটেই বাড়িয়ে বলছি না। হিসাবের খাতা দেখে জানতে পারলাম শুধু এই কাজের জন্য উনি প্রতি মাসে দাদাকে অন্ততঃপক্ষে তিরিশ টাকা দিতেন। বরং পাঁচ বছর পুরো হতে না হতেই মাইনেটা চল্লিশে গিয়ে দাঁড়াল। তাছাড়া খাওয়াপরা তো আছেই। আমি নিজেই কতবার দেখেছি কোনও ভালো ছবি এলে উনি দাদাকে পয়সা দিয়ে বলতেন, "যাও, ম্যাটিনী শোতে দেখে এসো।" আমার ধারণা, দাদা ভালবাসার ভান করে যশবন্তবাবুকে প্রতারণা করতো। তিনি অনায়াসেই যোগ্যতর বিশ্বাসী উত্তর ভারতীয় লোক পেতে পারতেন। দু-একবার উদ্ধত ভাবেও সে কথা বলেছে। ওর অনুপস্থিতিতে আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনি এটা সহ্য করেন কি করে?" উনি হেসে বললেন, "এও একপ্রকার ঋণ শোধ।"

"আপনিও কি পূর্বজন্ম মানেন?"

"পূর্ব, অপূর্ব কিছুই মানি না।"

"তাহলে?"

"রাস্তার উপর পড়ে থাকতো ছেলেটা। নীচের দোকানের চাতালে পড়ে পড়ে কাতরাতো। একদিন দোকানদার ওকে ধমকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। তখন ওর বয়স প্রায় চব্বিশ। শুকিয়ে কঙ্কালসার। দেহে প্রাণটিই শুধু ছিল। মলত্যাগ করতে ঘষটে ঘিষটে সমুদ্রের ধারে যেত। আমি রোজ দেখতাম। বোম্বে করপোরেশন ভিখারীদের জন্য কোনও পায়খানার ব্যবস্থা করেন নি। অনেকবার পায়খানা করতে যেত আর ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরত।

খুবই অসুস্থ ছিল। দোকানদারও তার দোকানের সামনে এসব নোংরা ব্যাপার কি করে সহ্য করে? প্রথমে ভাল কথায় বলল, পরে ধমক দিল, তারপর গালাগালিও দিল। শেষ পর্যন্ত মারবার জন্য একটা লম্বা বেত বের করল। দোতলায় বসে বসেই আমি সব শুনতে পাচ্ছিলাম। বেত মারার শব্দও কানে এলো। দোকানদার আমার পরিচিত ছিল। আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'আহমদ'। আমি রেগে গেছি বুঝতে পেরে ও উপরে উঠে এলো। তার দুঃখের কাহিনী আমায় শোনাল, 'দেখুন না, কোনো হাসপাতালেও তো যেতে পারতো ও। আমার দোকানের সামনে এরকম ভাবে পড়ে থাকলে আমার যা দু-চার জন খদ্দের আছে তারাও যে হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'শুধু এই জন্য ওকে মারছো? ওর তো হাঁটবার ক্ষমতাও নেই।'

'ওকে খুব ভালো করে বুঝিয়েছিলাম। তবুও গেল না। পুলিশ ডাকার পরও পড়ে রইল। বলুন, এরপর আমি কি করতে পারি?'

'আমরাও যে একদিন এ অবস্থায় পড়ব না তা কে বলতে পারে?'

শুনেই আহমদ রেগে গেল, "তাহলে আপনিই ওকে সামলান।" বলে তাড়াতাড়ি নেমে গেল। ও বোধহয় আমার কথায় অপমানিত বোধ করল। নীচে গিয়ে রাগ সামলাতে না পেরে ছেলেটাকে বলল, 'যাও, উপরে যাও, ওখানে তোমার দাদা আছেন, উনি তোমায় খাট পালঙে শুইয়ে তোমার সেবা করবেন।" ওর বিদ্রূপ আমি শুনতে পেলাম। তাই নীচে নেমে গেলাম। দোকানের সামনে সে আধমরা অবস্থায় পড়েছিল। ভাবলাম, দৃষ্টান্ত উপদেশের থেকে শ্রেয়। কোনও দ্বিধা না করে ওকে পাঁজাকোলা করে উপরে উঠলাম, নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলাম। ছেলেটা বোধহয় খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমিও কিছু ভেবে এটা করি নি। তারপর আহমদ উপরে এসে আমার কাছে ক্ষমা চাইল, ও বলল—"শেঠবাবু, চলুন আমরা দুজনে মিলে একটা ট্যাক্সী ভাড়া করে একে কোনো হাসপাতালে ভর্তি করে আসি।

আপনি কি নিজে ওর দেখাশুনা করতে পারবেন ? আমি আপনাকে অপমান করেছি; দয়া করে ক্ষমা করুন।" আমি কিছু না বলে সোজা নীচে নেমে গেলাম। কাছেই ডাক্তার দারুওয়ালার হাসপাতাল ছিল। ওঁকে ডেকে আনলাম। ছেলেটাকে এ অবস্থায় দেখে উনিও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ছেলেটা রাস্তায় পড়ে থাকতো জানতে পেরে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'একে হাসপাতালে কেন ভর্তি করেন নি ?' আমি বললাম, 'আমি নিজেই ওর দেখাশুনা করব। মরে গেলে ল্যাঠা চুকে যাবে, ভালো হয়ে গেলে ও যেখানে ইচ্ছা চলে যাবে।'

"দু-মাস পরে ও সেরে গেল। ওর আমাশয় হয়েছিল। নোঙরা কাপড়গুলো ফেলে দিয়ে নূতন কাপড় দেওয়া হ'ল। পরিষ্কার বিছানায় শোওয়ানো হলো। ভালোভাবে শুশ্রূষা করা হ'ল। ওকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে দু মাস সময় লাগল। সবই ডাঃ দারুওয়ালার দয়াতে হতে পারল। ওর ভাগ্যে ছিল তাই বেঁচে গেল। আমি নিজেই ওর গু-মুত পরিষ্কার করতাম। প্রথম পনেরো দিন তো আমাশয় ছাড়া আরও অনেক রোগে ভুগল। আমার কষ্ট দেখে দারুওয়ালা দিনে দু বার করে নিজের নার্স কে পাঠিয়ে দিতেন। দাদা ওর নিজের নাম নয়। আহমদের ব্যবহারে দুঃখিত হয়েই আমি ওকে 'দাদা' বলে ডাকতে আরম্ভ করলাম। ও মারাঠি, নাম গণপত। ও সেরে উঠলে ওকে হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হলো না, তাই আমার নিজের কাছে রেখে নিলাম। শুনলাম সাতারায় ওর একটি বোন থাকে। বছরে একবার সাতারা ঘুরে আসতো।"

শুনে তাজ্জব হয়ে গেলাম, "তার মানে আপনাকেই ভুগতে হ'ল। আপনার প্রতি ওর তো কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

উনি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, এ এক রকম দণ্ড বইকি। কিন্তু কারুর প্রাণরক্ষা করাকে কি দণ্ড বলে ?"

"কিন্তু যার জন্য অত করলেন তার সে সব গ্রহণ করার যোগ্যতাও তো থাকা চাই ? ও কি বোঝে না, আপনিই ওকে বাঁচিয়েছেন ?"

"মানে, সর্বক্ষণ হরিভক্তদের মতন আমার গুণগান করতে হবে—তুমিই আমার সহায়, তুমিই আমার প্রভু ?"

"অন্ততঃ ব্যবহারে তো কিছু দেখাবে।"

"আমার মনে হয় ওকে ঠিক ভাবে লালনপালন করা হয়নি। তাই ওর মধ্যে ভালো সংস্কার জন্মাতে পারেনি। মায়ের ওই একমাত্র ছেলে, আর দুটি মেয়ে সন্তান। মায়ের অতিরিক্ত আদরে ও বাঁদর হয়ে গেছে। শুধু নিতেই শিখেছে, দিতে নয়। আমার প্রতিও প্রথম থেকেই ওর ভাবখানা ঠিক মা-ছেলের মতন ছিল।"

"তাহলে ?"

"ধরুন, এর জায়গায় যদি আরেকটা ছেলে রাখি, দাদার চাকরীর অভাব হবে না। কিন্তু ও ছেলেটা যদি দাদার চেয়েও এক কাঠি ওপরে হয় ? তাহলে দুজনের মধ্যে কি তফাৎ ?"

"আপনি বলতে চান কোনও তফাৎ থাকবে না ?"

"আমার তো নিজের ছেলেও আমাকে আমার প্রাপ্য দিতে পারে নি।"

"আপনার কটি ছেলেমেয়ে ?"

"ওদের সবাইকে ভুলে আবার নূতন করে জীবন আরম্ভ করতে চাই। সে অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। এখন দাদাই আমার ছেলে, ভালো হোক্ বা মন্দ হোক্।" এ প্রসঙ্গ যেন উনি এড়াতে চাইছিলেন।

দ্বিতীয়বার যখন ওঁর সঙ্গে দেখা করি তখন এ প্রসঙ্গ আবার ওঠে। ওঁর চালচলন, ব্যবহার আমার তেমন বোধগম্য হতো না। ওঁকে ভালোমানুষ পেয়ে দাদা ওঁকে দুহাতে লুটছে। কৃতজ্ঞতা বলে কিছু ছিল না ওর। দাদার প্রকৃতি উনি বোধহয় সঠিক ধরতে পারেন নি। ওকে চিনলে উনি নিরাশই হতেন। তখন আমার এই সব ধারণা হয়েছিল, কিন্তু এতোদিন পরে যশবন্তবাবুর ডায়েরী পড়ার পর, আর ওঁর আঁকা ছবিগুলো দেখার পর, আমি দেখতে পাচ্ছি আমি ওঁকে চিনতে ভুল করেছি

"বর্ষার ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটা টিয়াপাখির ছানা কাঁপছিল। সেটাকে এনে আমি পুষলাম। টিয়াপাখিটা সুন্দর বলেই বোধহয় এনেছিলাম। ওটা মরে যেতে পারে ভাবলেই আমার কষ্ট হত। কিন্তু ভাগ্যের জোরে ওটা বেঁচে গেল। কথা বলতেও শিখল। আমি যা বলতাম তারই নকল করতো। টিয়া কি মানুষের ভাষা বলতে পারে? মানে না জেনেও, শুধু নকল করে। অনুকরণ করাই ওর স্বভাব। ওকি আমায় ভালবাসে না? খাঁচায় পুরলে চেঁচাতে থাকে। বাইরে আনলে নখ দিয়ে আঁচড়ায়। হাতের উপর, কাঁধের উপর লাফিয়ে বসে। মনের আনন্দে পাখা ঝটপট করে। ধরতে গেলে ঠুকরে দেয়। রাগ করে যদি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি ও ঠিক বুঝতে পারে। তখন উড়ে এসে আমার কাঁধে বসে, আমার গালে ঠোঁট ঘসতে থাকে। আমি আবার ওকে খাঁচায় পুরে দি। ভালো, মন্দ দুইই রয়েছে পাখিটার মধ্যে। সেও তো একটা প্রাণী বটে। যতদিন বাঁচবে আমার কাছে থাকবে।"

এ সব কি উনি দাদাকে লক্ষ্য করেই তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন? এ সব কথার এ ছাড়া আর কোন অর্থ হতে পারে না। দোষেগুণে মানুষ। যতক্ষণ সে পরিবারভুক্ত ততক্ষণ সম্পর্ক। নিজের স্বার্থের জন্যই তার অপরকে প্রয়োজন। কারণ মানুষ সামাজিক প্রাণী। অন্যের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে কে-ই-বা নিরালা, নিরাশ্রয় হতে চায়?

যশবন্তবাবুর এরকম অভিব্যক্তি ওঁর একটা ছবিতেও দেখেছি। মনে হয়, দাদার চরিত্র বিশ্লেষণ উনি আমার থেকেও ভালো করেছেন। উনি মানুষেরও কয়েকটা ছবি এঁকেছেন। অবশ্য আকারে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, মানুষের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই। নিজের খেয়ালখুশী মত রং চড়িয়েছেন। একটা রঙের সঙ্গে আরেকটা খাপ খাচ্ছে না। ফিকে ও গাঢ় রঙের কোন সামঞ্জস্য নেই। উনি যাদের ছবি এঁকেছেন তাদের দু-ভাগে ভাগ করেছেন, বাঁদিকে একরকম রং, ডানদিকে অন্যরকম। একদিকে কালো তো অন্যদিকে সাদা। একদিকে

লাল, অন্যদিকে বেগুনি। উনি বোধহয় এটাও জানেন না, সবুজ লালের পরিপূরক। কালো সাদায় বরঞ্চ মিল হতেও পারে। একটি যুবকের ছবি উনি কালো আর সাদা রং দিয়ে এঁকেছেন। পায়জামা পরা। আদুল গা, মাথায় টুপি নেই। হাতে কাপ প্লেট। বাঁহাতে কেতলী থেকে চা ঢালছে। ছবির থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে একদিকের কালো ও অন্যদিকের সাদা রঙের আলাদা আলাদা আকৃতিকে পাশাপাশি দাঁড় করানো হয়েছে। মুখের অর্ধেক একরকম বাকী অর্ধেক আরেক রকম। মাথাও সেইরকম দুভাগ। পায়জামা পরার দরুণ পায়ের দোষ ঢেকে গেছে। মানুষের ডান ও বাঁদিকের মধ্যে পার্থক্য তো থাকেই। অন্ততঃ মানুষের চেহারার বেলায় একথা খাটে। একটা ফটো নিয়ে মাঝখান থেকে যদি চিরে দেন তো দুদিকে কিছু না কিছু পার্থক্য দেখা যাবে। একটা ছবিকেই দু ভাগ করে আবার জোড়া দিলে ছবিটা অন্যরকম দেখাবে। কিন্তু যশবন্তবাবুর ছবিগুলোতে এ তফাতটা খুব বেশী স্পষ্ট মনে হয়। একই চেহারার মধ্যে স্বাভাবিক কিছু তফাত হওয়া সত্ত্বেও চেহারায় একটা সাম্য তো থাকে। একটা ঠোঁটের অর্ধেক ছোট ও পাতলা হতে পারে। বাকীটা লম্বা ও মোটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ভুরু, চোখ, নাকের দুটো গর্তে ও গালে সামান্য বৈষম্য থাকা কি আর এমন ব্যাপার? যশবন্তবাবু এটা কি বিদ্রূপ হিসাবে এত বেশী বাড়িয়ে দেখিয়েছেন? কিন্তু তাও তো নয়। চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল দুটো ভাগ দুটো আলাদা মানুষের। কাপ প্লেট ধরা ডান হাতটা এতো শীর্ণ যে মনে হচ্ছে এক্ষুনি বাসনগুলো পড়ে ভেঙ্গে যাবে। বাঁ হাতটা কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট দেখাচ্ছে যেন কোদাল চালাবার হাত। পেট ও বুকটা দেখবার মত। বুকের ডানদিকটা ক্ষয়রোগীর মত জীর্ণশীর্ণ কিন্তু বাঁ দিকটা সে রকম নয়। সেটা বরঞ্চ পালোয়ানের বুক। ধড়টা বিকৃত দেখাচ্ছে। গায়ের তুলনায় মাথাটা বেঢপ। ডান দিকের ঠোঁটটা ঝুলে আছে। ডান দিকের চোয়ালের হাড় উঁচু। ভুরু নীচে নেমে গেছে। তাতে চুল প্রায় নেই বললেই চলে। জ্র

ও চোখ যেন নিষ্প্রাণ। মড়ার চোখের মত। কিন্তু মুখের ডানদিকটা আবার অন্যরকম। ঠোঁটে দুষ্টুমির আভাস। ঠোঁটের কোণগুলো উপরের দিকে ওঠা। বাঁ দিকের নাকের গর্ত ফোলা ফোলা। কালো রঙে আঁকা ওদিকের চোখটা খোলা। চোখের মণিটা এক-পেশে। দেখে মনে হচ্ছিল ধূর্তের একশেষ। তার উপর খুব ঘন ভুরু। বাঁ চোখ ছোট, ডান চোখ বড়। ভাবলাম, এটা নিশ্চয় একটা ব্যঙ্গাত্মক ছবি। ওটাকে আর বিশ্লেষণের চেষ্টা না করে রেখে দিলাম। যশবন্তবাবু স্বীকার করেছিলেন, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপাতের জ্ঞান ওঁর নেই। ওঁর আঁকা ছবিতে এটা ঠিক ধরতে পারা যায়। ছবিটা কার—এ নিয়ে মনে প্রশ্ন রয়ে গেল। ওঁর ডায়েরীতে টিয়াপাখির ছানার যে উপমা দেওয়া হয়েছিল তা থেকে দাদার কথা মনে পড়ে গেল। আমার মনে হলো কেতলী হাতে ছেলেটা কি দাদা? দাদাকে আঁকার চেষ্টা ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এই ছবিটি দাদাকে দেখিয়ে যদি কেউ বলে যে 'এটা তোমার ছবি', নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে সে তার মুখেই গরম চা ঢেলে দেবে। তবে কারুর ছবি এঁকে তাকে দেখাবার উদ্দেশ্য ওঁর ছিল না। কাউকে যদি বলা যায় তোমার চেহারা এরকম বিকৃত, সে কি তা সহ্য করবে? তাই এ চেষ্টা উনি নিশ্চয়ই করেন নি। নিঃসন্দেহে এ ছবিটা ওঁর চাকরের। কাপ: প্লেট জানাচ্ছে যে এটা ওঁর পাচক বা চাকরের ছবি। এর পরই আমার মনে পড়ে গেল, কেমন ভাবে উনি দাদাকে রেখেছিলেন। আর হাসিও পেল। ডান দিকটা দাদার গুণের পরিচয় দিচ্ছে যখন ও অনাথ হয়ে ওঁর বাড়িতে এসেছিল। তাই ওদিকটায় সাদা রং দিয়েছেন। অন্য দিকটা দাদার মন্দ স্বভাবের প্রতীক। চোখ, ঠোঁট, নাক সবেতেই যেন দাদার স্বভাব প্রতিফলিত। ছবিতে বাঁ দিকের কালো বুকে শুধু নাম রক্ষার জন্যই হৃদয়ের অস্তিত্ব বোঝাবার সামান্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবে তাও মাংসপেশীর তলায় চাপা পড়ে গেছে। এ প্রশ্ন মনে জাগতেই ছবিটা বাক্স থেকে বের করে মনোযোগসহকারে দেখতে লাগলাম। যশবন্তবাবু মানুষের

স্বভাবের সঙ্গে অপরিচিত বলা যায় না, তায় আবার দাদার স্বভাব জানবেন না, অসম্ভব কথা। জেনেশুনেই উনি ওকে রেখেছিলেন। কি জন্য? উনি বলেছিলেন, 'মানুষ, মানুষের মন্দ চায়।' ডান, বাঁ, কালো, সাদা, পবিত্র, অপবিত্র কোনটাই জীবন থেকে বাদ দেওয়া যায় না। মানুষের স্বভাব ভালোমন্দের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। এর ভিতর একটা কিছুর অভাব ঘটলে, মানুষ বলে কিছু থাকে না। ভালো, মন্দ দুদিকেই যার নজর আছে তার দৃষ্টিভঙ্গী বোধহয় এরকমই হয়। যে মানুষ 'অহং' ভাব ছেড়ে জগতকে চিনতে বেরোয় সে বোধহয় সংসারকে কালো সাদা রং দিয়েই বুঝতে পারবে।

উনি একটা গরু এঁকেছেন। মাঠে চরে বেড়াচ্ছে। ওর পিঠে একটা বুনো ময়না পাখি বসে। সেটা ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে গরুটার পিঠে ঘা করে দিয়েছে। এ ছবিটার বিষয় আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এ তো বুনো ময়না, না? গরুর গায়ের ঘায়ের পোকা খায়, না?"

"হ্যাঁ, তাই বটে।"

"এ দৃশ্য আপনি কোথায় দেখলেন?"

"খাণ্ডালায় তো নিত্যই দেখি। এখানে যখন মন বসে না, তখন মাসখানেকের জন্য খাণ্ডালা ঘুরে আসি।"

"গরুর আকৃতি তো ঠিক হয়নি।"

"আমি কি বলেছি যে আমি চিত্রকর?"

"তা নয়, কিন্তু ছবি আঁকতে তো আপনি ভালবাসেন?"

"সে তো বটেই। ছবি আঁকাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে তাতে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকে না। সময় কাটানো আর কি। নানান দুর্ভাবনা থেকেও উদ্ধার পাওয়া যায়।"

"ও গরুটা আপনার অত পছন্দ হলো কি করে? আমার তো তেমন ভালো লাগছে না।"

"ওকথা ছাড়ুন। আমার যেটা ভালো লেগেছে সেটা আপনার

ভালো নাও লাগতে পারে। যখন ভালোই লাগছে না তো ওর বিষয় জেনে কি লাভ ?"

"না, না, একটু কিছু তো বলুন। তা না জানলে ছবির মানে যে বোঝা যায় না।"

"তার মানে, আপনি বলতে চান আমার ছবির কিছু উদ্দেশ্য আছে ?"

"নিশ্চয়ই আছে, নইলে ছবি আঁকবেনই বা কেন ?"

"তা ঠিক। কিন্তু এ জীবনে কিসের মানে হয় ? কাজ করার পর কেন করলাম, তা না জেনেও কি আমরা থাকতে পারি না ? কত কাজের মানে তো আমরা জানতেই পারি না।"

"বিলক্ষণ। কিন্তু এ ছবিটার মানে কি তা বলতেই হবে।"

কিছুক্ষণ উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু হাসলেন, তারপর বললেন, "আমার জীবনের কোন অভিজ্ঞতার এ একটা উপমা মাত্র। এর বিষয় বলবার সময় এখনও আসেনি।" বলেই ছবিটা কেড়ে নিয়ে বাক্সো রেখে দিলেন। এটা অনেক আগের কথা। সে ছবিটা আবার আমার বাড়িতে আনার পরই দেখতে পেয়েছিলাম। যেদিন ঐ ছবিটা উনি আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন সেদিন আমার মনে হয়েছিল উনি যেন আমার প্রতি একটু অসন্তুষ্ট হয়েছেন। —আমার প্রশ্নে বা নিজের জীবনের কোনো ঘটনা মনে করে, তা বলতে পারি না। কিন্তু সেদিন উনি এরপর অনেকক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ রেখেছিলেন। ভয় হ'ল, আমার কথায় বোধহয় উনি রেগে গেছেন। আমি কথাটা উড়িয়ে দেবার জন্য চালাকি করে বলেছিলাম, "চলুন না, মালাবার হিল কিংবা চৌপাটীতে একটু বেড়িয়ে আসি।"

"দাদাকে সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছি। আমি এখানেই থাকবো, আপনি বেড়িয়ে আসুন।"

"তাহলে আমি...এবারের মত বিদায় নিই। আসছে বছর আবার আসবো।" উনি বললেন. "বেশ তাই আসবেন।" আমার সঙ্গে

বাইরেও এলেন না। আমি ভাবলাম, আগের কোনো স্মৃতি নিশ্চয় ওঁকে চঞ্চল করে তুলেছে। আমি নীচে নামলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখলাম, শ্বেতবস্ত্রা এক মহিলা উপরে উঠছেন। বয়স প্রায় চল্লিশ। একটু জায়গা দিয়ে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "মিষ্টার যশবন্ত দেয়াব ?" বললাম, "ইদ্দারে (আছেন)।" উনি আমার কন্নড় ভাষা বুঝলেন কিনা জানি না। আমি মাথা হেঁট করে নেমে গেলাম আর ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে চৌপাটী পৌঁছুলাম। ওখানে বালির ঢিবির উপর একা বসে রইলাম। তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা। রাস্তায় গাড়ী মোটরের চলাচল ও লোকের আনা-গোনা বেড়েই চললো। তাদের ভিড়ে সমুদ্রসৈকত এমন ভাবে ছেয়ে গেল যে বালি দেখবার আর উপায় রইল না। তখন ভাঁটার সময়। 'বেক-বে' যেন পুকুরের সামিল হ'ল। ছোট ছোট ঢেউ ধীরে ধীরে হেলে দুলে সামনে এগুচ্ছিল। এ সমুদ্র আমাদের গ্রামের সমুদ্রের মত পরিষ্কার ঝকঝকে নয়। সমুদ্র হলে কি হবে, জল দেখে তো মনে হয় এঁদো পুকুর। পরিষ্কার থাকলে চৌপাটীর এই বালির ঢিবিগুলো কি সুন্দর লাগত। সকলে এর উপরেই থুথু ফেলে। আবর্জ্জনা, ছেঁড়া কাগজ, এঁটো পাত সব ফেলবার এটাই যেন জায়গা। তবে জোয়ার এলে দিনে দু বার অন্ততঃ এসব আবর্জ্জনা জলের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু স্বচ্ছতার মানে কি ? একেবারে নির্মল লোক পৃথিবীতে বিরল। মানুষ ঘসে মেজে নিজেকে পরিষ্কার করে রাখে।

আমি ওখানে একা বসেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে 'জলসমুদ্র' 'জনসমুদ্রে' পরিণত হ'ল। ছোটদের হাসি-কান্না, ভ্রমণকারীদের হাঁকডাক, নারকলওয়ালা ও নৌকাওয়ালাদের চীৎকারের কাছে সমুদ্রের গর্জ্জনও চাপা পড়ে গেল। আমার বন্ধু বোম্বে শহরকে যে জনারণ্য বলেছেন সেটা অতিশয়োক্তি নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়টা হচ্ছে উনি বানপ্রস্থ জীবন কাটাবার জন্য এই জনারণ্যকে পছন্দ করলেন কি করে ? দেখতে গেলে বোম্বেকে অরণ্যই বলা চলে

এখানে ভিড়ের মধ্যেও বেশ একা থাকতে পারা যায়। যেখানেই যাবেন লোকের অভাব নেই। তবে সাধারণতঃ কেউ কাউকে, 'আপনি কে? কোথায় থাকেন?' ইত্যাদি প্রশ্ন করে না। প্রতিবেশীর সঙ্গে পরিচয় করার আগ্রহ কারুর নেই। সবাই নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তবে এদের কারুর মধ্যেই যে সৌহার্দ্য নেই তা বলা যায় না। কারণ পরস্পরের বাড়িতে আনাগোনা, খাওয়াদাওয়া একেবারে বিরল নয়।

সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি ঐ ভিড়ের মধ্যে নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে উঠে গ্রাণ্ট রোড ষ্টেশনের দিকে এগোতে লাগলাম। আমি নিজের চিন্তায় বিভোর ছিলাম। রাস্তার একপাশ দিয়ে ভিড় বাঁচিয়ে বেরিয়ে এলাম। গ্রামদেবী আর লাবরনাম ছেড়ে গিয়ে যখন গ্রাণ্ট রোডে পড়লাম তখন ভিড়ের দরুণ আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। রেলওয়ে ষ্টেশন পৌঁছুবার জন্য আমায় তিনটে রাস্তা পার হতে হতো, আর সব রাস্তাগুলোতেই গাড়ীর ভিড়। ভিড় কখন কমবে আর আমি এগুতে পারব তারই সুযোগ খুঁজছিলাম, হঠাৎ কাছাকাছি একটা রাস্তায় যশবন্তবাবুকে দেখতে পেলাম। ওঁর সঙ্গে সকালের দেখা সেই মহিলাটি রয়েছেন। ওঁর সাজপোষাকে কোনও পরিবর্তন হয়নি। উনি বোধহয় আমায় দেখতে পাননি, কিন্তু যে ভাবে ওঁরা দুজনে পাশাপাশি যাচ্ছিলেন তা দেখে বেশ আশ্চর্য হলাম। যশবন্তবাবুকে দু-তিনবার 'বানপ্রস্থ' শব্দটা ব্যবহার করতে শুনেছিলাম। ঐ দৃশ্যের সঙ্গে শব্দটি খাপছাড়া লাগছিল। সন্দেহ হ'ল, তাহলে কি উনি নিজের পরিবারের প্রতি বিরক্ত হয়ে এখানে নূতন সংসার পেতেছেন। আমার এ সন্দেহ, স্বাভাবিক। ও দৃশ্যটা ভুলে যাবার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। অবশ্য এরপর আর কখনো আমি মহিলাটিকে ওঁর সঙ্গে দেখিনি। তবে এটাও ভাবলাম, ওঁদের দুজনের মধ্যে যদি গভীর স্নেহ সম্বন্ধ থাকে তো এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মানুষের এটা একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা বলে মনকে সান্ত্বনা দিলাম। কিন্তু ওঁদের মধ্যে

সে রকম সম্বন্ধ থাকলে কি ওঁর মৃত্যুর সময় মহিলাটি আসতেন না? কে. ই. এম. হাসপাতালে যখন উনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন বোধহয় তখন মহিলাটি এসেও থাকবেন। আসেন নি এই বা কেমন করে বলতে পারি? কি জানি কেন, বার বার এ কথা মনে হচ্ছে যে দাদার মত উনিও ওঁর জীবনের একটি রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বহুবার আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে সে বাড়িতে গেছি। দুচার ঘণ্টা ওখানে থেকেছিও। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় শ্বেতবস্ত্রা মহিলাটিকে দেখতে পাবো এমন আশাও পোষণ করছি মনে। কিন্তু ওঁকে সেই একবারই দেখতে পেয়েছিলাম। ওঁর ডায়েরী পড়বার সময় হঠাৎ আমার মনে হলো, দেখি তো, ওই মহিলাটির সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে না কি?

ডায়েরীতে উনি কারুর নাম প্রকাশ করতেন না। বারকয়েক x, y, z দিয়েই চালাতেন, নয়তো কোনো ছদ্মনাম দিয়ে। ওঁর ডায়েরীতে একটি লোকের সম্বন্ধে উনি যা লিখেছিলেন, তা পড়ে মনে হ'ল, এ দাদা না হয়ে যায় না। মৃত্যুর পর মানুষের নাম শুধু একটা শব্দ মাত্র। শুধু নাম থেকেই কারুর চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে না। এই ভেবে উনি তিক্ত স্মৃতিজড়িত লোকের নাম এড়িয়ে গেছেন। যে পড়বে তাকে অমুক লোক খারাপ ছিল ভাববার সুযোগ কেন দি? ডায়েরীতে শুধু কোন সাময়িক প্রসঙ্গ থাকে, ওটা গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়। একে এক ধরনের ইতিহাস বা চরিত্রও বলা চলে। ওতে ভীম ভীমই থাকে, রাম রামই। আসলে তারা কে, বোঝবার উপায় নেই। গণপতি লেখা থাকলে সে গণপতিই থাকবে। 'দাদা' লেখা থাকলে শুধু আমি কিংবা জামশের দম্পতি চিনে নিতে পারতাম। কারণ আমরা 'দাদা'কে জানতাম। কিন্তু অন্য যারা এ ডায়েরী পড়বে তাদের কাছে ও কেবল x, y, z.

একদিন বেশ আয়েসে বসে ওঁর ডায়েরীর পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। হঠাৎ x, y, z-এর বদলে রীমা নামটা বার কয়েক চোখে পড়ল। এটাও নিশ্চয় কারুর ছদ্মনাম হবে। রীমা কে? 'খাণ্ডালায় যখন

ছিলাম' এই লিখেছেন না? ভাবলাম, ওখানকারই কেউ হবে। এক জায়গায় রাঁমের মা'রও উল্লেখ দেখলাম। হাসি পেল। রাঁমা নাম হলে, 'রাঁমার মা'ও থাকবে। 'রাঁমে' কি করে হবে? তাহলে কি শব্দপ্রয়োগের ব্যাপারে ওঁর কি কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না? যেমন ওঁর ছবিগুলি আজগুবী তেমনি কি নামগুলোও। অনেক মাথা ঘামালাম। দাদার সম্বন্ধে যশবন্তবাবুর সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল সে সব মনে পড়লো। কথাটা আমিই পেড়েছিলাম। দাদার অনাথ অবস্থায় ওঁর বাড়ি আসা, ডাঃ দারুওয়ালাকে ডাকা, ওঁর সেবাশুশ্রূষা করা, ওঁকে সাহায্য করার জন্য নার্সের আসা—নার্সটির নামও মনে এলো। উনি মেরা বলেই ডেকেছিলেন। মেরা খৃষ্টান নাম। সেদিন দোতলা থেকে নামবার সময় সাদা শাড়ী পরা যে মেয়েটিকে দেখেছিলাম সে নিশ্চয়ই ঐ নার্স ছিল। ওর কপালে কুমকুমের টিপ দেখিনি, হাতে চুড়িও ছিল না। নিশ্চয় ঐ মেরা। তাহলে কি ওঁর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল? আরও মনে হ'ল, নিশ্চয় রাঁমা মেরারই উল্টো করে লেখা নাম। আবার ডায়েরী নিয়ে বসলাম। রাঁমার জায়গায় মেরাকে বসিয়ে দেখা যাক। মেরার মাও নিশ্চয় ছিলেন, যিনি বোধহয় খাণ্ডালায় থাকতেন। এটা ধরে নিয়েই আবার লেখা পড়তে লাগলাম—

"রাঁমার এখানে আসার কথা বাঁমার মা জানলো কি করে? তাও আবার আমার বাড়িতেই। দাদার উপর রাগ করেই আমি বোম্বে ছেড়ে এখানে এসেছি যাতে ও বুঝতে পারে ওকে ছেড়েও আমার চলে। আমার এরকম ভাবে চলে আসাটা নতুন কিছু নয়। বছরে একবার তো খাণ্ডালায় আসিই। আমার খোঁজে রাঁমার এখানে আসা উচিত ছিল না। কিন্তু ও এলো, আর তারপর ঘন ঘন আসতে লাগল। সে আমার উদারতার বা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করছিল। দাদার সেবার জন্য ওর আসা আমি পছন্দ করতাম না। কিন্তু দেখলাম সে আমার মতই তার সেবা করেছিল। আমার প্রশংসা করে বলেছিল,

'আমি তো শুধু টাকার জন্য এ কাজ করছি কিন্তু আপনি শুধু ভালবেসে ওর সেবা করছেন। আপনি তো খুব উদার।' যতই উদার হোক্ না কেন, যার নিজের প্রশংসা শুনতে ভালো লাগে সে নিশ্চয়ই ফাঁদে পা দেবে। রীমা আমার জন্য ফাঁদই পেতেছিল। এ ছাড়া কি আর কিছু হতে পারে? ওর প্রশংসা শুনে কেন মুগ্ধ হলাম? এর উত্তর আমার কাছে নেই। ছোটবেলায় প্রশংসা শুনে আমি বেশ কয়েকবার বোকা বনে গিয়েছিলাম। পরে জানতে পেরেছিলাম যারা তোষামোদ করে তারা চোর। এ সময় বোধহয় আবার ছোটবেলাকার সেই বোকামি ঘাড়ে চেপেছে। এ নিয়ে নিজের বিশ্লেষণ আমি করতে পারলাম না।

"রীমা জানে আমি আমার ঘরসংসার ছেড়ে এসেছি। এ বিষয় আমি আগে কাউকে কিছু বলিনি কিন্তু কেন জানি ওকে সব বলে দিয়েছি। বিরক্তি আসার দরুণ কি? কিংবা ও আমায় সাহায্য করেছিল তাই? নাঃ, এর কোনটাই কারণ নয়। আমার একঘেয়ে জীবনে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল, তাই আমি এখানে এসেছিলাম। কিন্তু নারীর আক্রমণ থেকে এখনও নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি। রীমার কাছে আমার এ দুর্বলতা নিশ্চয় ধরা পড়ে গেছে। ও তো শুধু অবিবাহিতা নার্স। অবিবাহিতা বলেই কি তাকে একা থাকতে হবে?—পুরুষের সঙ্গ সে চাইবে না? আমাকে দেখে নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছে আমি সহজেই ওর কাছে ধরা দেবো। ও আমার থেকে কি চায় তা তো আমি জানি না, কিন্তু ওকে দিয়ে আমার কামনার পূর্তি হয়ে যায়।

"খাণ্ডালায় আমার বাড়ির সামনে সবুজ মাঠে গরুছাগল চরে বেড়ায়। তাদের চারিপাশে বুনো ময়না ওদের ঘায়ের পোকা খাবার জন্য হেঁদোয়। কখনো আবার বকও আসে। ওদের মধ্যে কি অদ্ভুত বন্ধুত্ব—পাখিগুলির আহার পোকা, পশুগুলির ঘাস। গোরুদের ঘায়ের যত কষ্টই হোক্ না কেন ময়নারা সর্বদাই

তাদের কষ্টের লাঘব করার জন্য প্রস্তুত। অনাদিকাল থেকে ওদের মধ্যে এ বন্ধুত্ব চলে আসছে।

"একদিন দেখলাম একটা ময়না একটা গরুর পিঠে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে ঘা করে দিয়েছে। বোধহয় ক্ষিধের চোটে, নয়তো পোকা না পাওয়াতে—বলা যায় না। ঘা থেকে রক্ত ঝরছিল। সেই ছবিটা আমি এঁকেছি। বলতে পারি না ও ছবিটায় আমি আমার ভাব প্রকাশ করতে পেরেছি কি না। রীমাও একটি বুনো পাখি বা ময়না, এ বলা অন্যায় হবে। ও যা কিছু করছে জ্ঞাতসারেই করছে। একজনের জন্যই সে আরেকজনকে উপেক্ষা করছে। কিন্তু একজনকে যে সম্মান দেওয়া হলো সেটাই তো আরেকজনের ঘা হয়ে দাঁড়াল।"

ওঁর ডায়েরীতে লেখা এ ছবিটার গল্প মনুষ্যজীবনের একটা মস্ত সমস্যা হয়ে উঠল আমার কাছে। যদি স্ত্রী-পুরুষের প্রেম একটা বুদবুদেরই মতন হয়, যাকে একবার ছুঁলেই ভেঙ্গে যায় তাহলে অবশিষ্ট কিই বা থাকল? যশবন্তবাবু এখানে এটাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে সত্যের দাম কিছুই নেই। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ শেষে গিয়ে পশুদের মতই তো দাঁড়াল। যতক্ষণ পোকা আছে ততক্ষণ ভাব। সে না থাকলে শুধু 'ঘা'ই থেকে যায়। আমরা ভালবাসি কেন? পরোপকারের জন্য? নাকি উদারতার দরুণ? না। শুধু নিজের স্বার্থের জন্যই ভালবাসা। এ ছবিতে উনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন। অবশ্য উনি আর কারুর কথা না বলে এটা দিয়ে শুধু নিজের রূপটা দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

"আমি খাণ্ডালায় আছি। রীমা তা জানতে পেরেছে। আমার একাকী নীরস জীবনে সরসতা আনতে ও এসেছে। তা তো হ'ল। কিন্তু ও নিজের মা 'সালু'র বিষয় যা কিছু বলেছে সব মিথ্যে। এসব জানবার পর আমার ওর উপর বিতৃষ্ণা এসে গেল। ওর মার পক্ষাঘাত হয়েছে, চিকিৎসার জন্য বোম্বে নিয়ে যেতে হবে বলে আমার থেকে টাকা নিয়েছিল। তখন কিন্তু আমার

একটুও সন্দেহ হয়নি। তখন আমার কাছে টাকা ছিল তাই দিয়ে দিলাম। সালুর বয়স হয়েছে, বাঁচে কি না বাঁচে, তবে যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন মেয়ের পক্ষে মা'র সেবা করাই তো উচিত। রীমার গুণ কি আমার অজানা? ও নিজে উপার্জ্জন করে। ওর কষ্টের সময় ওকে আমি মুক্তহস্তে টাকা দিয়েছি। শুধু সাহায্য করার জন্য কি? না, ওর স্নেহের মূল্য হিসাবেই দিয়েছিলাম।

"ওর চলে যাবার পরের দিনই তো জলজ্যান্ত ওর মা সালু আমার এখানে এসে হাজির হয়েছিল। ওদের বাড়ি খাণ্ডালা থেকে শুধু চার মাইল দূরে এই লোনাবকায়। ষাট বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও বেশ শক্তসমর্থ দেখলাম। আমার বাড়ি থেকে এক ফার্লং দূরে যে পার্সী পরিবার থাকে তাদের বাড়ি রোজ কাজে আসে। সকালে আসে আর বিকেলে ফিরে যায়। লোকে বলে মা ও মেয়ের মধ্যে প্রায় কোন সম্পর্ক নেই। জানি না, কেমন করে সালু জেনেছে কোথায় আমার আস্তানা। সোজা আমার বাড়িতে এসে আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমার মেয়ে কোথায়?'

"রীমা কি আপনার মেয়ে? ও তো বলেছিল আপনি অসুস্থ?"

তখন ওর মা যে মেয়ের উপর কত রেগে আছে বুঝতে পারলাম; রোগের কারণও সে সবিস্তারে বলল, সালু একলা থাকে। কত কষ্টে মেয়েকে মানুষ করেছিল। ধারকর্জ করে, কত কান্না গেয়ে। ভিক্ষে করে ওকে নার্সিং পড়িয়েছিল। কিন্তু এখন মেয়ে মাকে একেবারেই ভুলে গেছে। ছেলেই যখন মাকে এমন করতে পারে, মেয়ের আর কথা কি? যার থেকে জন্ম নিল তাকেই ভুলে গেল। আজ পর্যন্ত মাকে কানাকড়ি সাহায্য করে নি। লোনাবকায় এসে কখনো খবর পর্যন্ত নেয়নি যে, মা বেঁচে আছে না মরে গেছে। একেই বলে যৌবনের নেশা। তখন নিজে ছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কেউ নেই। যে গাছ ফলে ফুলে ভরা সে কি তার গোড়া দেখতে পায়? সালু আমায় সাবধান করতে

এসেছিল। "আমার মেয়ে হয়ে যে আমায়ই দেখে না সে কি কখনো আপনাকে বা আর কাউকে ভালবাসতে পারে?"

মেয়ের নামে সীলুর নালিশ শোনার পর আমি জানতে চাইলাম, ও কি কাজ করে, ওর কেমন করে চলে। সে বলল, "যতদিন হাত পা আছে খেটে খাবো।" সত্যিই বুড়ী হলে কি হবে, খুবই শক্ত-সমর্থ ছিল। এই বয়সেও কত কাজ করছিল। তবে ওর এত কাজ করার শক্তি আছে কিনা বলতে পারছি না। ওর চেহারা দেখলে খুব জেদী মনে হয়। জেদের বশেই ও এমন করে কাজ করে চালাচ্ছে। মেয়ে যখন কোন সাহায্য করে না তখন আর কি উপায় আছে ওর? ওর দুরবস্থা দেখে যখন আমি পাঁচটা টাকা দিতে গেলাম তখন ও বলল, "আমি এ জন্য আসিনি, আমি শুধু বলতে এসেছি, আপনি রীমাকে বিশ্বাস করবেন না।" বলেই সে চলে গেল।

"বাৎসল্যে আঘাত লাগলে সেটা বিষে পরিণত হয়ে যেতে পারে। রীমা নিজের স্বার্থে আমার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছিল। সে যে আমাকে সুখ দেয়নি, তা নয়। কিন্তু তার নিজের সুখের দিকেই নজর বেশী ছিল। যেমন বুনো ময়নাটা গরুর ঘায়ের পোকা খেতে খেতে কিছু ভালো রক্তও হজম করে নেয়। রীমা যেন ময়না, আমি গরু।

"খাণ্ডালা থেকে বোম্বে যাবার আগে ওর নামে একটা চিঠিও দিয়েছিলাম—'তোমার মা আমার এখানে এসেছিলেন, তোমার যাবার পরের দিনই। বেশ সুস্থ সবল দেখলাম তাঁকে। তোমার বিষয় এই বলে গেলেন, যে নিজের মাকেই ভুলে গেছে, সে কি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে?' এ চিঠিটা পাবার পরই রীমা আমার জীবন থেকে সরে গিয়েছিল। আমার এরকম লেখা উচিত হয়েছিল কিনা আমি বলতে পারি না। তবে চিঠি লেখার উদ্দেশ্য এই ছিল না যে ওকে জানাই, 'আমি ওকে কত ভালবাসতাম আর সে আমায় প্রতারণা করেছে।' চিঠির উত্তরে সে লিখেছিল, 'আপনার মত প্রতারক আমি কোথাও দেখিনি।' রীমা আমাকে একেবারে ভুল বুঝেছে, কেননা ওর কাছে ভালবাসার কোনও মূল্য

নেই। তবে আমার মধ্যেও দোষ থাকতে পারে। ওকে কি আমি ঠকিয়েছি? যদি ঠকিয়ে থাকি তো কবে? নিজের দোষ কি নিজে দেখা যায়?"

চার

যশবন্তবাবুর আঁকা একটা ছবিতে রীমার সাদৃশ্য ছিল অতএব রীমার কাহিনী এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। খাণ্ডালায় থাকাকালীন কাহিনীর শেষও হয়নি সেখানে। এটা আমি ওঁর ডায়েরীর পরের পৃষ্ঠা পড়ে বুঝতে পারলাম। এতে উনি বেশ সুন্দর একটা উপমা দিয়েছিলেন যেটা রীমার স্বভাবকে বেশ স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করে। "রীমা একটি অর্কিড গাছ। যে গাছগুলো পরাশ্রিত হয়ে বেড়ে ওঠে অর্কিড সেই জাতের গাছ। অর্কিডের ফুল বড় বিচিত্র আকারের। অরণ্য-বিশেষজ্ঞরা বলেন, এমন ফুল সচরাচর দেখা যায় না। দেখতে খুব সুন্দর অথচ শীঘ্র ঝরে পড়ে না। তাই না সকলের কাছে ওর এত কদর? ও যে গাছে আশ্রয় নেয় সে গাছে একটাও ফুল ফোটে না। তাই আশ্রয়দাতা গাছের বোঝার উপায় নেই যে অর্কিড ওর প্রেয়সী। আমাদের কবিরাও তো আমগাছের সঙ্গে মল্লিকালতার মিলনের বর্ণনা দিয়েছেন। মল্লিকা ও আম দুটোই আলাদা গাছ, দুটোরই গোড়া আলাদা। মানুষের দাম্পত্য-জীবনও কি মল্লিকা ও আমগাছের মত নয়? আমগাছের সঙ্গে একাকার হয়ে মল্লিকা যেন এই দেখাতে চায় যে তুমিই আমার সব, কিন্তু শুধু নিজেই পুষ্পিত পল্লবিত হতে থাকে। বাইরে থেকে ওদের মিলন কত সুন্দর দেখায়। তার তুলনা হয় না। জলদাও কি আমাকে এভাবে আশ্রয় করেনি? অনেকদিন পর্যন্ত আমি তার বোঝা বয়েছি। আমার বিশ্বাস ছিল তার জীবন শুধু আমার জন্যই। কিন্তু ও তো শুধু নিজের স্বার্থেই আমাকে আঁকড়ে আছে। নিজের

সুখের জন্য বেঁচে আছে। দাম্পত্যজীবনও তো স্বার্থেরই সম্বন্ধ। কিন্তু এ জানবার পরও কি আমগাছ মল্লিকা লতাকে হারাতে চাইবে? সকলের মতে দাম্পত্যজীবন একটা অনন্য সম্বন্ধ। কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি যে আমার জীবনে এটা কেন সার্থক হয় নি?

"রীমা ষোল আনা অর্কিডেরই বীজ। একটা গাছের শাখা অবলম্বন করে বিকশিত হবার জন্যই আমার কাছে এসেছিল। মাঝে মধ্যে ওর সৌন্দর্যে আর হাবভাবে আমি লুব্ধ হয়েছি বৈকি, ক্ষণেকের জন্য। ও আমায় প্রতারণাও করতে পারে, তাই ওর থেকে মুক্তি পাবার জন্য ওকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। ওর আমার উপর দোষারোপ করায় মনে হলো বোধহয় তার ধারণাই ঠিক। কিন্তু সত্য যা তা কখনো অসত্য হয় না। অর্কিড অর্কিডই থাকবে। পরাশ্রিতা পরাশ্রিতাই থাকবে। গাছটা চাইলেও অর্কিডের বন্ধন ছাড়াতে পারবে না, এই ভেবেই সে আমাকে আঁকড়ে ছিল। সে মনে করেছিল আমি তার বন্ধন ছিঁড়তে পারবো না। এটা ওর ভুল। দাদার মত তারও চেষ্টা ব্যর্থ হলো। সত্যি বলতে, আমি বাঁধা পড়িনি। সেটা আমার উপরের মুখোস ছিল।"

যাকে আমি মেরী বলে ধরে নিয়েছি তার সঙ্গে নিজের দাম্পত্য জীবনের যে উপমা আমার বন্ধু দিয়েছেন সে সব পড়ে, মেরীর যে ছবিটা উনি এঁকেছেন, সেটাকে বার কয়েক দেখলাম। ওটা ছিল একটা পেস্টল ছবি। একটা বড় কাগজে একটি নারীর ছবি। চেহারা বেশ ভরা ভরা। সুসজ্জিতা। পিকাসোর 'দি উওম্যান' নামের ছবির মত তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্জীব নয়। তবে আমি যে মেরীকে দেখেছি তার অমন দশাসই চেহারা ছিল না। সে লোভী ও কামুক ছিল, বলেই বোধহয় যশবন্তবাবু অমন ছবি এঁকে থাকবেন। শরীরের উপর মুখটা ষোড়শীর মত দেখাচ্ছিল। ছবিটার ডান দিকে হলদে রং আর বাঁ দিকে সবুজ। দুটো ভাগের রংএতে বা শরীরে কোনো মিল ছিল না। অনুমানে কিছু পরিবর্তন করেই আমি

এটাকে মেবীর ছবি বলে ধরে নিয়েছি। ছবিটার পেছনদিকে 'অর্কিড' লেখা ছিল আর ছবির গায়ে যশবন্ত। মারা যাবার এক বছর আগে উনি এ ছবিটা এঁকেছিলেন। কাকে মানসী করে এটা এঁকেছিলেন কে জানে। চোখে দুষ্টুমির হাসি। বাঁ চোখে মণি পর্যন্ত নেই। কানা মেয়ে। ওর মধ্যে দয়ার ভাব ছিল না সেই মনে করেই বোধহয় দুটো চোখ আঁকেন নি।

মারা যাবার শুধু এক বছর আগেই এ ছবি আঁকার প্রেরণা উনি কোথায় পেলেন? এ ঘটনা ওঁকে খুব বিচলিত করেছিল বলেই বোধহয়। কিন্তু ডায়েরীতে এ ধরনের কোনও সংকেত পাই নি। এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই, কারণ এ থেকে যশবন্তবাবুর জীবনধারার কোন হদিস পাব না। কিন্তু দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে উনি যে উপমা দিয়েছেন আর যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম। তাতে শুধু মল্লিকা ও আমগাছেরই কথা নয়, সেখানে উনি তাঁর স্ত্রীর নাম উল্লেখ করেছেন জলদা বলে।

নামা যে মেবী তাতে আমার সন্দেহ নেই, আর 'সালু' ঠিক ওর মা 'লুসী'। গণপতি ওঁর চাকর 'দাদা'। জলদা নামটাকে উল্টো করলেও তা থেকে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। নিজের স্ত্রীর নাম এমনভাবে প্রচার করবেন তা তো মনে হয় না। যাদের সঙ্গে তাঁর জীবন জড়িত ছিল তাদের সকলের জন্যই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন, জলদা যদি ওঁর স্ত্রীরই নাম হয় তাহলে ওটাও নিশ্চয় একটা ছদ্মনাম। তবে কি আসল নাম কমল, পঙ্কজ বা বনজা? এইভাবে আরও আট-দশটা নাম বের করলাম।

তবে হ্যাঁ, ওঁর ডায়েরীতে উনি যে গোটা চার-পাঁচ ঠিকানা লিখে রেখেছিলেন, তাঁদের খোঁজ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার কৌতূহল এখনও রইল:

বোম্বে থেকে ফিরে আসার পর দু-মাস কেটে গেছে। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকাতে, আর কুঁড়েমির জন্যও বটে, বন্ধু আমায় যা কিছু করতে বলেছিলেন তা প্রায় ভুলেই বসেছিলাম। উনি যে চারজনকে

প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা করে পাঠাতে বলেছিলেন তাও ভুলে বসে আছি। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঐ চারজনের ঠিকানা খুঁজে প্রত্যেককে পঁচিশ টাকার মানি অর্ডার করে দিলাম। স্বাদীর কাছাকাছি কোন একটা গাঁয়ে ওঁর জন্ম হয়েছিল, এখন শুধু সেখানে যাওয়াটাই বাকী থাকল। কুমটায় উনি বড় হয়েই গিয়েছিলেন, সেখানের আত্মীয়দের ঠিকানা যোগাড় করে ওঁর মৃত্যুসংবাদ দেওয়াও এখনো হয় নি। কুমটায় ওঁর স্ত্রী ও ছেলেরা আছে। যদি ওঁর স্ত্রী বেঁচে থাকেন তাহলে তো আরও বিপদ। স্ত্রীকে তার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ নিজে গিয়ে দেওয়া কি সহজ কথা? তাই ওঁর স্ত্রী, জলদাই হন বা জল্লাদ, আগেই মারা গিয়েছেন, এ কামনা করতে লাগলাম। অবশ্য এও মনে হ'ল যে ওঁদের সম্পর্ক প্রায় ছিন্নই হয়ে গিয়েছিল। তবুও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিধবা হয়ে যাবার আঘাত কিছু কম ব্যাপার নয়। স্ত্রীরা নিজের স্বামীকে রেখে যেতে যেন পারেন, সেই কামনাই করে থাকেন।

পনেরো দিন কেটে গেল। তার মধ্যেও আমি কিছু করে উঠতে পারলাম না। যে মানি অর্ডারগুলো করেছিলাম তার সব রসিদও এসে গেল। একটা রসিদ সাতারা জেলার মহাবলেশ্বর থেকে এসেছিল। যাকে মানি অর্ডার করেছিলাম তার নাম ছিল বিষ্ণুপন্থ ঘাটে। বাকী তিনজনকে যশবন্তবাবুর কোন আত্মীয়স্বজন নয়তো বন্ধুবান্ধব মনে হল। ওঁর যে পুঁটলিতে কিছু কাগজপত্র বাঁধা ছিল সেটা খুলে গোটাকতক রসিদ পেলাম। বার কয়েক ঐ চারজনকেই টাকা পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে তিনজন নিজের নাম সই করতে পারতেন। দুজনের সই কন্নড় ছিল। বিষ্ণুপন্থ ঘাটে মারাঠিতে সই করেছিলেন। স্বাদীর কাছে বেনকনহল্লী গাঁয়ের চোচ্চুলমনে পার্বতাম্মার রসিদে বুড়ো আঙুলের ছাপ ছিল। ওর সাক্ষীরও সই ছিল। ইনি নিশ্চয় অশিক্ষিতা। ও জায়গাটা স্বাদীতে যশবন্তবাবুর জন্মস্থানের খুব কাছেই ছিল। বৃদ্ধাটি বোধহয় ওঁর কোনরকম আত্মীয়া হবেন, যাঁকে দয়াপরবশ হয়ে উনি টাকা

পাঠাতেন। আমি ঠিক করলাম যশবন্তবাবুর বিষয় যদি কিছু জানতে চাই তো সবচেয়ে আগে এই বৃদ্ধার সঙ্গেই দেখা করা উচিত হবে।

আগের গোটা তিন চার রসিদ বার করে টিপ সইগুলো দেখলাম। প্রত্যেক রসিদে সাক্ষীর জায়গায় শম্ভু ভট্টের সই পেলাম। টিপ সইয়ের জন্য সাক্ষীর দরকার হয়। এবারের রসিদেও শম্ভু ভট্টই সাক্ষী ছিলেন। ভাবলাম ইনি বোধহয় পার্বতাম্মার কোনও আত্মীয়। এ রসিদের টিপ সইটা যেন আগেরটার সঙ্গে মিলছিল না। কিন্তু সাক্ষীর লেখা ঠিকই ছিল—'এই টিপসই পার্বতাম্মার'। কিন্তু এ টিপ সইটা দেখে মনে হচ্ছিল এটা পার্বতাম্মার নয়, অন্য কারুর। আগের ছাপে হাতের রেখাগুলো চক্রাকার ছিল কিন্তু এ ছাপটায় শঙ্খাকার। বাঁ হাতের বদলে ডান হাতের ছাপ দেয় নি তো? না, সেরকম লাগছে না। কেমন গোলমেলে ব্যাপার যেন।

পরের বারের প্রতীক্ষায় একমাস কাটিয়ে দিলাম। আবার টাকা পাঠালাম। রসিদ ঠিক সময় ফিরে এলো। এতেও শম্ভু ভট্টই সাক্ষী। কিন্তু এ ছাপটার রেখাগুলোও শঙ্খাকার। এর মানে এই দাঁড়ালো যশবন্তবাবুর থেকে যিনি টাকা পেয়েছিলেন তিনি অন্য লোক। এ ছাড়া আর কি হতে পারে? শম্ভু ভট্টের উপর সন্দেহ হ'ল। আমি যে টাকাটা পাঠিয়েছিলাম সেটা নিশ্চয় এই লোকটা নিয়েছে। আমি তো নতুন লোক, যশবন্তবাবু অনেক দূরে আছেন বলে ও সে ওঁকেও ঠকায় নি তারই বা কি বিশ্বাস? ঠিক করলাম, টাকা ঠিক লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে কি না, সঠিক না জেনে আর টাকা পাঠাবো না। তাই পরের মাসে অন্য তিনজনকে টাকা পাঠালাম কিন্তু ওখানে পাঠালাম না। তারপর নিজেই স্বাদাঁ যাওয়া ঠিক করলাম। তবে তখন বর্ষাকাল। বর্ষায় পাহাড়ে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কোনো কোনো জায়গায় তো বাসও যায় না। 'পায়ে চলা সরু রাস্তা' দিয়ে যেতে হয়। তার জন্য অন্ততঃ সাত আট দিন সময় হাতে চাই...তাই আর গা করলাম না। এইভাবে দু মাস

কেটে গেল। ইতিমধ্যে ওখান থেকে একটা চিঠি এলো, যাতে লেখক অসন্তুষ্ট হয়েছে স্পষ্ট বোঝা গেল। চিঠিটা এরকম ঃ

"মান্যবর,

যশবন্তবাবুর হয়ে যে পঁচিশ টাকা পাঠানো হয়েছিল, তা পাওয়া গেছে। আশা করি যশবন্তবাবুর স্বাস্থ্য ঠিক আছে। উনি নিশ্চয় আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের টাকা আপনাকে পাঠাতে বলে থাকবেন। আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন।" তাই জন্য চিঠি লিখলাম। আপনি কিছু মনে করবেন না। এ মাসের ও আগের দু মাসের মোট পঁচাত্তর টাকা পাঠালে বাধিত হব। নয় তো যশবন্তবাবুর ঠিকানা জানাবেন, ওঁকেই চিঠি দেব। দেখা হ'লে তাঁকে বলবেন, "ওঁর ঠাকুরমা পার্বতাম্মা মরবার আগে অন্ততঃ একবার ওঁকে দেখতে চান।" চিঠিটার নীচে লেখা ছিল, "এই বুড়ো আঙুলের ছাপটা পার্বতাম্মার, আর চিঠিটা ওঁর হয়েই লেখা গেল।"

পার্বতাম্মা যশবন্তবাবুর ঠাকুরমা জেনে আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। উনি ওঁর বাবার মা তো হতে পারেন না। বোধহয় দিদিমা কিংবা আর কোন রকম আত্মীয় হবেন। মারা যাবার সময় যশবন্তবাবুর বয়স পঁয়ষট্টির কাছাকাছি ছিল। সেই হিসাবে এই মহিলাটির বয়স অন্ততঃ আরও কুড়ি বছর বেশী হবে। ওঁর সঙ্গে খুব শীগ্গির দেখা করা দরকার, নয়তো ক'দিন উনি বাঁচবেন কিনা কে জানে। এ কাজটা আমায় তাড়াতাড়ি করতে হবে।

তখন অক্টোবর শেষ হতে চলেছে। বর্ষা কমে এসেছিল। প্রায়ই রোদ উঠত। আকাশে সাদা মেঘের খেলা। নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনেই সিরসির থেকে বেরিয়ে পড়া চাই। ওখান থেকে ধারো গিয়ে ওই গ্রামে চোচ্চলের বাড়িটা খুঁজে বের করতে হবে। বৃদ্ধাটিকে দেখতেও পাবো আর যশবন্তবাবুর ছেলেবেলার কথাও কিছু জানতে পারবো। এই সব ভাবতে লাগলাম। আপাততঃ চিঠিটার জবাব দেওয়া দরকার। টাকাও তো পাঠাতে হবে, না? কিন্তু টাকার কথায় মনে সন্দেহ হ'তে লাগল, পার্বতাম্মা নিশ্চয় মারা গেছেন।

শম্ভু ভট্ট টাকার লোভে আর কাউকে দিয়ে টিপ সই দিয়েছে। সে অবস্থায় টাকা পাঠানো উচিত হবে না। উনি কি সত্যিই মারা যাবার আগে যশবন্তবাবুকে দেখতে চেয়েছেন? তিনি তো অনেকদিন হ'ল গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছেন। এতোদিনে কি একবারও ওঁকে দেখেন নি? উনি 'বেঁচে আছেন' এটা মিছিমিছি টাকার লোভেই লিখে থাকবে। কেননা, আমি ওদের অজানা লোক, যশবন্তবাবু তো এখন টাকা পাঠাচ্ছেন না। তাই শম্ভু ভট্টের সাহস বেড়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে অন্য কারুর টিপ সই দিয়ে ঠকানো হচ্ছে।

নবরাত্রির অপেক্ষায় রইলাম। সিরসি থেকে একজন বন্ধু আমায় ব্যাখ্যান দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল, আমি তক্ষুণি রাজী হয়ে গেলাম। স্বাদী ওখান থেকে মাত্র দশ বারো মাইলের পথ তা আমি জানতাম। স্বাদী প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। বেনকনহল্লী গ্রামও নিশ্চয় ওখান থেকে কাছেই হবে। আমার এ প্রোগ্রামটা ঠিক হ'লে ওখানে পাহাড়ে, বনে বেড়াবার সুবিধা হবে। এরকম করে বেড়াতে আমার খুব ভালো লাগে।

নবরাত্রি শেষ হতেই সিরসি গেলাম। অন্য বছরের মত এ বছরও আমার বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দু দিন এক বন্ধুর বাড়ি থেকে আমি দুটো বক্তৃতা দিয়েছিলাম। তারপর কি করবো সে বিষয় ভাবতে লাগলাম। সৌভাগ্যবশতঃ বর্ষা বেশ কমে গিয়েছিল। সারাদিনে মাত্র একবার বৃষ্টি হয়েই থেমে যেত। ওখানে পাহাড়গুলো সবুজে সবুজ হয়ে গিয়েছিল। দেখতে ভারী সুন্দর লাগছিল। যেদিকেই তাকাও বন আর বন, আর সব জায়গায় সবুজের বাহার। কতো নদী, নালা বয়ে চলেছে, কোথাও আবার জল জমে ঝিল হয়ে গেছে। দেখতে কতো ভাল লাগছে। ঝর্ণা থেকে ঝরঝরিয়ে জল পড়ছে। যেদিকেই যাও জল বয়ে যাওয়ার সুর কানে লেগে থাকবে। এরকম দৃশ্য আমি দেখতে খুব ভালবাসি। এখানে ধীরেসুস্থে, মনের আনন্দে, চারিদিকে সব কিছু দেখতে

দেখতে যাওয়া আমার পছন্দ। এই পার্বত্য প্রদেশটা দেখছি আমার থেকেও বেশী মন্থর। এখানে সবাই যেন অলস হয়ে উঠেছে। যেমন লোকজন তেমনি গরু-মোষ। মোষ তো আরও কুঁড়ে। বর্ষায় চারিদিক ঘাসে ভরে গেছে। গরীব চাষাদের হাড়গিলে মোষগুলো ঘাস খেয়ে খেয়ে, মোটা তাজা হয়ে জলের মধ্যে পড়ে আছে। আমারই মত এরাও গতর নাড়াতে চায় না। কিন্তু ওদের মনও কি সেইরকম জড়? বোধহয় না। ওরাও নিশ্চয় সুখশান্তি ভোগ করতে চায়। জল ওরা কত ভালবাসে। জলে নেমে শুধু মাথা জাগিয়ে ভেসে থাকে। একটু রোদ উঠলে তো ওদের আনন্দ দেখে কে? খাওয়া-দাওয়া সব ভুলে শুধু জলে গড়াগড়ি খায়। সুখের ঘোরে চোখ বুঁজে আসে। যে নির্বিকল্প সমাধিকে আমরা সবচেয়ে বড় বলে মানি তার শুধু কল্পনাই করতে পারি, তার চেয়ে বেশী আনন্দ ওরা উপভোগ করে।

সিরসি পৌঁছুবার পর আমার অবস্থাও ঠিক ওদের মতই হয়েছিল। খেয়ে, শুয়ে, ঘুমিয়েই দিন কাটতে লাগল। শম্ভু ভট যে সাক্ষ্য দিচ্ছে সেটা সত্যি না মিথ্যে, পার্বতাম্মা সত্যিই মারা গেছেন না বেঁচে আছেন, এসব ভাববার আর আগ্রহ রইল না। যশবন্তবাবু এঁদের যে কারণেই টাকা পাঠিয়ে থাকেন না কেন, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা কেন? কিন্তু যে বৃদ্ধাটিকে উনি ভালবাসতেন তাঁকে দেখার অদম্য কৌতূহল ছিল। কেন উনি টাকা পাঠাতেন? কি সম্বন্ধ ছিল ওঁর সঙ্গে? এ সব খোলসা করে জানবার আগ্রহ না থাকলে, আমি বোধহয় ঐ মোষগুলোর মত সিরসিতেই আরও দুচার দিন পড়ে থাকতাম। একবার এও ভাবলাম, স্বাদী থেকে কেউ সিরসি এসে থাকলে তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে এখান থেকেই ফিরে যাই। কিন্তু মন তাতে সায় দিল না। তাই বেরিয়ে পড়লাম।

স্বাদী পর্যন্ত গরুর গাড়ীতে গেলাম। সারারাত গরুর গাড়ী চড়ে গায়ে গতরে ব্যথা হয়ে গেল। এর চেয়ে তো হেঁটে যাওয়াই ভালো। ওখানে পৌঁছুবার পরও তো আবো হাঁটতে হ'ল। বেনকনহল্লী

গ্রাম ওখান থেকে দু-ক্রোশ দূরে। ওখান পর্যন্ত যাবার রাস্তার অবস্থা যে কি রকম ছিল তা বলাই বাহুল্য। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা। বর্ষায় সমস্ত রাস্তা কাদায় ভরা; পচা গাছপালার দুর্গন্ধ। এক ক্রোশের ভিতর মানুষের মুখ পর্যন্ত দেখা গেল না। যখন একজনকে দেখতে পেলাম সে বললে, "বেনকনহল্লী গাঁ, এই তো কাছেই।" হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ফোস্কা পড়ে গেল। তবুও বেনকন-হল্লী গ্রামের দেখা নেই। এরকম পাহাড়ী জায়গায় গ্রাম বলতে কি কিছু আছে? একটা বাড়ি যদি পাহাড়ের মাথায়, তো অন্যটা ওর তলায়। বাড়িগুলো বেশ দূরে দূরে। কোথাও কোথাও তো দূরত্ব আধ মাইলটাক। রাস্তায় একজন বুড়োমানুষকে গরু চরাতে দেখলাম। সে বললে, 'এটাই বেনকনহল্লী গ্রাম।' তখন দুপুর। সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে সে পান চিবোচ্ছিল। সে তো বলে দিল এটাই বেনকনহল্লী গ্রাম; কিন্তু একটা বাড়িও কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। অদ্ভুত লাগল। যখন গরু আছে, লোকজন আছে তখন গ্রাম তো নিশ্চয় আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "সত্যিই কি এটা বেনকনহল্লী? ব্রাহ্মণরা থাকেন এখানে?" তখন একটু দূরে একটা গ্রামের দিকে দেখিয়ে সে বলল, "ঐ যে বাঁশঝাড়ের ভেতর মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে ওটা বেনকন মন্দির। চতুর্থীর দিনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খুশী হয়ে বলে, 'বেনক, বেনক, বজ্রদন্ত পাণিপীঠ।' তাই এ গাঁয়ের নাম বেনকনহল্লী (গজানন গ্রাম) হয়েছে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "শম্ভু ভট্টর বাড়ি কোথায় জানো?"

ও একটু ভেবেচিন্তে বলল, "চোচ্চকদের বাড়ি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই বটে।"

"চোচ্চকদের দুটো বাড়ি। একটা উপরে, একটা নীচে। শম্ভু হেগ্‌গড়ে আর রাম হেগ্‌গেড়ে। আপনি কাকে চান?"

"হেগ্‌গড়ে নয়, শম্ভু ভট্ট।"

"হ্যাঁ, উনি উপরের বাড়িতে থাকেন। এই পাহাড়টার নীচেই

ওঁর বাড়ি। নীচে যে চোচ্চক'দের বাড়ি আছে সেটা আরেকটু দূরে। কিন্তু আপনি তো বলছেন হেগ্ গড়ে নয়—ভট্ট।"

"আরে বাবা, আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গেছি। হেগ্ গড়েই হোক বা ভট্ট, যে ব্রাহ্মণের বাড়িটা সবচেয়ে কাছে আছে সেটাই দেখিয়ে দাও, তাহলেই হবে।"

"বাবুমশাই, আপনার কাছে তামাক আছে?"

"আমি তামাক খাই না।"

"আমাকেই কি আপনার সঙ্গে যেতে হবে? গরুগুলো একেবারে বোকা, যদি কোথাও পালিয়ে যায়?"

পকেট থেকে একটা দো আনি বের করে বললাম, "আরে ভাই, আমার শুধু একটা উপকার করে দাও, কাছেই যে ব্রাহ্মণের বাড়ি আছে সেটাই দেখিয়ে দাও। তারপর আমি নিজেই খুঁজে পেতে যেখানে যাবার চলে যাবো।"

বুড়োটা বলল, "সত্যি, আপনি আমায় পয়সা দিচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। আগে তুমি এটা নাও তো। মানুষের বদলে বাঘের বাড়ি যেন দেখিও না।"

"মনে হচ্ছে আপনি শহরের লোক, বাঘকে খুব ভয় করেন। বাঘ মানুষের কি করবে?" তারপর হাতে লাঠিটা নিয়ে, "আসুন তাহলে," বলে আমার আগে আগে চলল। চওড়া রাস্তা ছেড়ে বাঁশের ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে খুব সরু রাস্তা। ও পথ দিয়ে যেতে সত্যিই আমার বাঘের ভয় করছিল। রাস্তায় যেতে যেতে একটা ভাঙ্গাচোরা মন্দির পড়ল। ওর চূড়োটা ভেঙ্গে পড়েছিল। মানে, ও ভেতর প্রতিষ্ঠিত গণেশ ঠাকুরের রোজই বর্ষার জলের অভিষেক হয়। বুড়ো মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে গণেশকে প্রণাম করে সেই পাহাড়ের রাস্তার নীচের দিকে নামতে লাগল। ওর হাতের লাঠির সাহায্যে ও কাদার উপর দিয়ে আমায় 'আসুন, আসুন' বলে নেমে চলল। কিন্তু আমার পা কাদায় ভরে গেল। চারিদিকে শুধু কাদা প্যাচপ্যাচ করছে। পা রাখতে না রাখতেই পিছলে

যাচ্ছে। পাহাড়টা ভীষণ খাড়া। দু-একবার পিছলে আছাড়ও খেলাম। সর্বাঙ্গে কাদা মেখে গেল। মনে মনে শম্ভু ভট্ট ও পার্বতাম্মার পিণ্ডির শ্রাদ্ধ করলাম। একটু পরেই সমতলভূমি পেলাম। কাদায় ভরা একটা উঠোনে পৌঁছুলাম। বুড়োটা আমায় বাড়ির পেছনে গোয়ালঘরের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, "আজ্ঞে, ভিন গাঁয়ের লোক এসেছেন।"

আওয়াজ শুনে একজন মধ্যবয়স্ক লোক বেরিয়ে এলেন। উনি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। রোগা, একহারা চেহারা, চাপদাড়ি শুধু একটা নেঙটা পরা। সে মূর্তি দেখতেই ওঁদের বাড়ি যাবার ইচ্ছা অন্তর্হিত হল।

একের পর এক প্রশ্ন করেই চললেন, "আপনি কে? কাকে চান? কোথায় থাকেন?"

"এটাই কি চোচ্চকদের বাড়ি? এই গ্রামে পার্বতাম্মা বলে একজন বৃদ্ধা মহিলা থাকেন কি? ওঁর সঙ্গেই দেখা করতে চাই, কাজ আছে।"

"উপরের চোচ্চকদের বাড়ি তো এটাই বটে। তবে পারোতী নামের এখানে কেউ নেই। কেন এসেছেন? অনেক দূরে থাকেন? ওঁর আত্মীয়?" আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসব নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমার কাদামাখা চেহারা দেখে বোধহয় ভেতরে নিয়ে যেতে চাইছিলেন না।

"তাহলে আসি," বলে পা বাড়াতেই কারুর কথা কানে এল। "বাছা, তোমার কি কোন আক্কেল নেই? ভিন গাঁয়ের লোক তোমার বাড়িতে এসেছেন। তাঁকে তুমি গোয়ালঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করেই চলেছো?" কথাটা বললেন ধুতিপরা একজন বৃদ্ধ। তিনি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। বোধহয় ও বাড়িরই লোক। ছেলেকে বকাবকি করার পর উনি আমায় বললেন, "আসুন, আসুন, বাড়ির ভেতরে চলুন। নিম্মটা আপনাকে গোরু-চলার রাস্তা দিয়েই এনেছে দেখছি। কাদায় পা পিছলে পড়ে গেছেন

নিশ্চয়। গরু চরিয়ে নিম্মর বুদ্ধিটাও গরুর মতনই।" আমাকে সহানুভূতি দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ঘরের চাতালটা বেশ পরিষ্কার ছিল। বৃদ্ধটির নাম শঙ্কর হেগ্‌গড়ে। নেঙটীপরা লোকটি ওঁর ছেলে শম্ভু হেগ্‌গড়ে। বাপের কাছে বকুনী খাবার পর ছেলেটি আমার জন্য একটা মাদুর আনল আর এক ঘটি জল। আমাকে খাতির করে বলল, "আসুন, মুখ হাত ধুয়ে নিন।"

আমি উঠোনে দাঁড়িয়েই বললাম, "উপরে ওঠার আগে এই কাদাগুলো ধুয়ে নি। তারপর স্নান করে কাপড়ও বদলাতে হবে। থলিতেও বেশ কাদা লেগে গেছে।" কি করব বুঝতে না পেরে আমি এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। বৃদ্ধটি ইতিমধ্যে হাতে দুটো ধুতি নিয়ে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ, না?" বললাম, "হ্যাঁ"। "তাহলে একেবারে স্নান করেই আসুন, শরীর স্নিগ্ধ হবে।" তাঁর ছেলেকে ধুতিগুলো স্নানের ঘরে রেখে আসতে বললেন।

উঠোন থেকে স্নানের ঘর যাওয়া মানে পুরো গঙ্গা পার হওয়া। সারা উঠোন জলে জলময়। জায়গায় জায়গায় যে পাথর ও তক্তা রাখা হয়েছিল তার উপরও জল। কোনরকমে তো স্নানের ঘরে গেলাম। একটা পাথরের কুণ্ডে ঠাণ্ডা জল ছিল। একটা বড় হাঁড়িতে জল ফুটছিল। ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাহাড়ে গরম জলে স্নান করে খুব আরাম লাগে, আগেই শুনেছিলাম। আগে কাপড়গুলো কাচলাম। তারপর থলি খুলে দেখলাম, ভেতরের কাপড়গুলোতেও কাদা লেগে গেছে। সেগুলোও কেচে ফেললাম। ও বাড়ির কর্তা যে কাপড় দিয়েছিলেন তা পরার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরতে হ'ল। লাল পাড় ধুতি। আগেকারকালে বিয়ে বা পৈতের সময় পুরোহিতরা এরকম ধুতি পরতেন। সিরসি, ইয়াল্লাপুরের লোকেরা আজও তাই পরছে। একটা ধুতি পরে, আরেকটা গায়ে জড়িয়ে স্নানঘর থেকে বেরুলাম। আমাকেও নিশ্চয় পুরোহিতের মত লাগছে মনে করে হাসি পাচ্ছিল।

ও বাড়ির কর্তা আমার বেশভূষা দেখে পুলকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি উড়ুপির দিকের লোক না ? দেখুন তো ধুতি পরে কি সুন্দর লাগছে। প্যান্ট সার্ট পরে আপনাকে ভালো দেখাচ্ছিল না। কিছু মনে করবেন না কিন্তু, আপনাকে আগে দেখে মনে হয়েছিল কি জানি কোন জাতের লোক। এই বেশে একেবারে খাঁটি ব্রাহ্মণ—পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।" বৃদ্ধটির কথায় আমি হেসে ফেললাম। সেদিন তিনিই বেশী কথা বললেন। ওঁর ছেলের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ওদের দুজনের স্বভাবে আকাশ-পাতাল তফাত। বৃদ্ধের বয়স প্রায় সত্তর। ভরাট চেহারা। মাথার চুলগুলো সব সাদা, স্বল্প দাড়ি, ছোট ছোট পাকধরা গোঁফ। চেহারায় আভিজাত্যের চিহ্ন। বিনীত ব্যবহার, মিষ্টি করে কথা বলেন। অতিথির প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। প্রথমে ওঁরা আমায় খেতে দিলেন। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বললেন, "আমরা গরীব, অল্প একটু তরকারী আছে, কিন্তু ক্ষিধের সময় নুন দিয়েও ভাত খাওয়া যায়। আপনি ক্ষুধার্ত নিশ্চয়, তাই সবরত না দিয়ে ভাতই খেতে দিলাম।"

বেশ ভালো রান্না হয়েছিল। হতে পারে, আমার ক্ষিধের মুখে অতো ভাল লেগেছিল। অন্ততঃ বৃদ্ধটির সেই মত। শুকনো কাঁঠালের চচ্চড়ী, নোন্তাজলে তৈরী আমের কড়ি, পাঁপড়, বড়ি ও ঝোল। খাওয়া সেরে বাইরে এলে পান-সুপুরীও দিলেন। পানটা মুখে পুরলাম।

উনি বললেন, "আপনি নীচের বাড়ির পার্বতীর সঙ্গে দেখা করবেন, না ? এখন তো অনেক সময় রয়েছে, আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন, ক্লান্তি দূর হবে। কোন কাজে এসেছেন, না এমনি ?" তারপর উনি আবার আমায় ঘুমোতে অনুরোধ করলেন। একে তো ক্লান্ত ছিলাম তার উপর পেট ভরে খেয়েছি তাই শুতে না শুতেই ঘুম এসে গেল। গত রাতে গাড়ীতেও ঘুম হয়নি। ঘুম ভাঙ্গলে দেখলাম সূর্য্য অস্ত যায় যায়। উঃ কতক্ষণ ঘুমিয়েছি ? ইতিমধ্যে গরম

জলের ঘটি নিয়ে বৃদ্ধটি এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "হাতমুখ ধুয়ে নিন।" মুখ ধুয়ে বসে পড়লাম। জলখাবার এলো। একটা প্লেটে ছোট ছোট ক'টা কলা ও তার সঙ্গে কাঁঠালের কোয়া ভাজা আর ঘটিতে কষায় (ধনে জিরের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী চা)। ওঁর জন্যও তাই ছিল। আমি বললাম, "আমার কাজ যে বাকী রয়েছে।" উনি হেসে বললেন, "মারাঠিতে একটা প্রবাদ আছে, 'আদি পরোয়া, নন্তর বিঠোয়া'। মানে আগে পেটপূজা তারপর বিঠোয়ার। আগে জলখাবার খেয়ে নিন।"

খাবার পর আমি বললাম, "এবার আমায় পার্বতাম্মার বাড়ির রাস্তাটা দেখিয়ে দেবেন? আপনার যাবার দরকার নেই, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন। আপনার ছেলেটিকে কিংবা কোন চাকরকে আমার সঙ্গে দিলেই চলবে।" এখন পর্যন্ত উনি ওঁর ছেলের মত আমার আসার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেন নি, শুধু আমি কোন গাঁয়ের লোক তাই জানতে চেয়েছিলেন। মনে হল আমার ক্ষুধা ও ক্লান্তি নিবৃত্তির পরই এখন উনি এসব প্রশ্ন তুলবেন। তাই সেসব এড়াবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি শুকনো কাপড় তুলতে চলে গেলাম। কাপড় বদলে নিজের কাপড় পরে যখন যাবার জন্য তৈরী হলাম তখন উনি আমায় প্রায় চেপে ধরলেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না। অনেক দূরে থাকেন, না? উডুপির কাছে? এ গাঁ আর ও গাঁয়ের ভিতর কোন সম্বন্ধ তো নেই। আপনার কোন পূর্বপুরুষ এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ে চলে গিয়েছিলেন কি? সেরকম কিছু না হলে আপনি পার্বতাম্মাকে জানবেনই বা কি করে?"

"আমি নিজের কাজে আসিনি। আমার বন্ধু যশবন্ত রাওয়ের একটা কাজে এসেছি। উনি এদিকেরই লোক। এই বৃদ্ধাটির সঙ্গে বোধহয় ওঁর কোন সম্বন্ধ আছে। উনি আমায় বলেছিলেন, ওঁর শরীর কেমন আছে জেনে ওঁকে খবর দিতে। নিজের কাজে সিরসি এসেছিলাম, তাই ভাবলাম এ দিকটাও ঘুরে যাই।" একটু মিথ্যের আশ্রয় নিতে হল, কেননা সত্যি বললে বুড়ো আঙুলের ছাপের রহস্য

বার করতে পারতাম না। একটু চিন্তার পর বৃদ্ধটি প্রশ্ন করলেন, "যশবন্ত রাও ?" আবার কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর বললেন, "এখানে রাও টাও বলার রেওয়াজ নেই। ব্রাহ্মণদের ভট্ট, শাস্ত্রী কিংবা হেগ্‌ড়ে বলা হয়।"

"রাও তো আমি নিজেই জুড়ে দিয়েছি।"

"ওঃ, তাই বলুন। মানে ওঁর নাম হল যশবন্ত, কোথায় থাকেন ?"

আমি বিপদে পড়ে গেলাম। কি বলবো...উনি বোম্বেতে থাকেন না থাকতেন ? এর মধ্যে উনিই আবার বলে উঠলেন, "আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে একটি ছেলের নাম যশবন্ত ছিল। আমার ছেলেবেলার কথা। আত্মীয় কেন, আমাদের নিজের লোকই বটে। অবশ্য একই নামের দুজন লোক থাকতে পারে না এমন কথা নেই, কিন্তু সে যশবন্ত কি আর বেঁচে আছে ? ও ছিল আমার খুড়তুতো ভাই। অনেক আগেই আমাদের বিষয়-সম্পত্তির ভাগ হয়ে গিয়েছিল। ঐ দেখুন, আমাদের বাড়ির ওদিকটায় যে বাঁশের ঝাড় রয়েছে, ওখানেই ওদের বাড়ি ছিল। সে বাড়িটা আর নেই, তার জায়গায় বাঁশের ঝাড় গজিয়েছে। তাহলে বুঝতেই পারছেন সে কতদিনের কথা।"

"এই গাঁয়ে ঐ নামের আর কেউ আছে নাকি ?"

"চোচ্চকদের এখানে তো আর কেউ নেই। চোচ্চক বাড়ি আমাদের বাড়ির নাম। আরও একটা চোচ্চক বাড়ি নীচে আছে। ওটা আমাদের পূর্বপুরুষের ভিটে ছিল। আমাদের যশবন্ত ওখান থেকেই কোথাও চলে গিয়েছিল।"

"উনি যখন চলে গিয়েছিলেন তখন ওঁর বয়স কত ছিল ?"

বৃদ্ধটি তখন মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন। ছেলেবেলার কথা মনে করে বললেন, "ও আমার থেকে চার পাঁচ বছরের ছোট ছিল। এখানে থাকতেই বিয়ে হয়। তখন ও কুড়ি বছরের। আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন ছিল, খুব বড় পরিবার। বড় শুধু সংখ্যায় নয়, বিষয়-সম্পত্তিতেও। আমরা বেশ অবস্থাপন্ন ছিলাম।

দেখুন না, এখন তো আমাদের ভূ-সম্পত্তির অর্ধেক জঙ্গল। যশবন্ত অনেক ধার করেছিল আর ধার শোধ দেবার জন্যই সম্পত্তি বাঁধা দিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিল তার স্ত্রীর গাঁয়ে, কুমটায়।"

"ওঁর স্ত্রীর নাম কি?"

"এখন আর কার মনে আছে? বিয়ের পরে দ্বিরাগমন হবার পর যখন এলো, তখন মাত্র তিন চার দিন আমাদের বাড়ি ছিল বোধহয়, তাও এখন ঠিক মনে নেই। যশবন্তর বাবা আর আমার বাবার মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই ছিল। বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে এমনই হয়। আপনি বলছেন যশবন্ত এখনও বেঁচে আছে। না, না, তা হতেই পারে না। একবার শুনেছিলাম কুমটায় গিয়ে ও সুপুরীর মস্ত ব্যবসা ফেঁদেছিল। সেও অনেক দিনের কথা। আমি এ জীবনে শুধু একবারই কুমটায় গেছি। ওখানে আমার কাজই বা কি? ওদিকে আমাদের কোন আত্মীয়ও নেই। কিছু কেনাবেচার কাজ থাকলে আমরা সিরসি কিংবা ইয়াল্লাপুর যাই। এ দুটো জায়গা আমাদের কাছাকাছি। সে কুমটায় সংসার পেতেছিল শুনেছি। ওখানে ব্যবসা করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছিল। তারপর সংসারে বিরাগ হওয়াতে হরিদ্বার না কাশী কোথাও গিয়ে মারা যায়। এই তো জানি। তাহলে আপনি যে যশবন্তের কথা বলছেন সে আর কে হতে পারে? আর তো কোনও যশবন্ত আমাদের গুষ্টিতে নেই। আপনার যশবন্তের বয়স কত হবে?"

"আপনার চেয়ে প্রায় বছর দশেক ছোট।"

"আপনার সঙ্গে ওঁর বেশ ভাব, না?"

"তা একটু আছে বৈকি। বোম্বেতে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আপনার যশবন্তের পার্বতী কে হন?"

"দূর সম্পর্কের দিদিমা। ওঁর খবর নিতে সে আপনাকে বলেছে? তাই আপনি এখানে এসেছেন? তবে তো কথাই নেই! সে যখন বলেছে আর আপনিও রাজী হয়েছেন, তাহলে তো আপনার ওখানে যাওয়া উচিতই। তবে এখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। পার্বতীর বাড়ি

বলতে তো একটা কুঁড়ে ঘর। ও চোখে ভাল দেখতেও পায় না। অন্ধকারে ওখানে যাওয়ার কোন মানে হয় না। আপনি বরং রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে যাবেন, হবে না তাতে ?”

এর আর আমি কি উত্তর দেবো। নিজের চোখেই দেখছি বন্ধুর জন্মভূমি বলে আর কিছু নেই। আমার বন্ধু যশবন্ত যে ইনিই, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। কুমটায় ওঁর বিয়ে হয়েছিল জানি। ওখানে সংসারও পেতেছিলেন। কিন্তু বিবাগী হয়ে কাশী বা হরিদ্বার চলে গিয়েছিলেন সেটা ঠিক নয়। উনি অন্যভাবে মারা যান। যাঁদের সঙ্গে ওঁর বনিবনা ছিল না, তারাই নিজের সুবিধের জন্য ওঁর মারা যাবার খবর উনি বেঁচে থাকতেই প্রচার করেছে। নিজের ঘরসংসার ছেড়ে যশবন্তবাবু কবে চলে গেছেন। তাঁর মারা যাবার বিষয় যদি কেউ রটিয়ে থাকে তো শঙ্কর হেগ্গড়ে বিশ্বাস করতেই পারেন, সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। চল্লিশ বছর আগেকার কথা। পার্বতাম্মা যদি ওঁর জ্ঞাতি, তাহলে এ বৃদ্ধটিরও তো কিছু হবেন নিশ্চয়। কিন্তু এঁদেব হাবভাব দেখে তো সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না। তাই যে পার্বতাম্মার সন্ধানে এসেছি তিনি নিশ্চয় শঙ্কর হেগ্গড়ের এই পার্বতী—যিনি আমার বন্ধুর মাতৃস্থানীয়া।

সন্ধ্যে নামল, অন্ধকার ঘনিয়ে এল, এখন আধ মাইল জঙ্গলের রাস্তা পার হয়ে ও বাড়ি যাওয়া আমার পক্ষে সহজ নয়। তবে যাঁকে খুঁজতে এসেছি, তিনি বেঁচে আছেন, তাঁব বদলে অন্য কারুর টিপ সই দেওয়া হয়নি, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু সাক্ষী শম্ভু ভট্টকে আবিষ্কার করা এখনও বাকি। সে নিশ্চয় পুরোপুরি ঠকিয়েছে তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না। আমি ওঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজের চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। উনি বললেন, “এখন ওখানে গিয়ে কি করবেন ? সকালে যাওয়াই ভালো, না ?” আমিও তাতে সায় দিলাম।

শঙ্কর হেগ্গড়ে বললেন, “সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমি আহ্নিক সেরে একটু পরে আসছি। আপনি ততক্ষণ বসুন।” উনি চলে যেতেই

শম্ভু হেম্বড়ে এসে দাঁড়াল। পানসুপুরীর প্লেটের দিকে হাত বাড়াল। আমি বসতে বললেও বসল না। দাঁড়িয়ে থেকেই পান নিল। আমি ঠাট্টা করে বললাম, "আপনি আহ্নিক করবেন না ?"

"বাবা আছেন তো।"

"ও, তার মানে আহ্নিকের দায় শুধু আপনার বাবার, তাই না ?"

"আর আপনি ?"

আমি হেসে বললাম, "প্রায় চল্লিশ বছর আগেই আমার সন্ধ্যা-আহ্নিক, জপ-তপের পাট চুকে গেছে।"

শম্ভুর বাবার আহ্নিক করতে প্রায় দু ঘণ্টা লাগল। ততক্ষণ সে দাঁড়িয়েই কাটাল। কতবার বসতে বললাম তবুও বসল না। আমার মনে হল, ও যেন কিছু বলতে চাইছে। দুপুরে বেশী কথা বলে বাপের কাছে ধমক খেয়েছিল, তাই বোধহয় এখন কিছু না বলে শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এমন সময় একজন বিধবা বৃদ্ধা আরতির প্রদীপের থালা নিয়ে বাইরে এলেন। আমাব কাছের থামটার পাশে থালাটা রাখলেন। শম্ভু বলল, "ইনি আমার পিসিমা, ছেলেবেলা থেকেই এখানে আছেন। আমাদের বাড়িতে ইনি সবচেয়ে বড়। বলতে গেলে ইনিই বাড়ির কর্ত্রী। আমার বাবা এঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজে হাত দেন না। এঁকে খুব শ্রদ্ধা করেন।"

উনি আমার থেকে একটু দূরে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলেন। তারপর বললেন, "শুনেছি অনেক দূর থেকে আপনি আমাদের পারোতীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।" শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বুঝে গেলাম, শম্ভু হেম্বড়ে নিশ্চয় আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনে এই বৃদ্ধাটিকে বলে দিয়েছে। তা না হলে, উনি আমায় এরকম কথা বলবেন কেন ? ওঁর মুখে 'আমাদের পারোতী' শুনে আরও আশ্চর্য হলাম। শঙ্কর হেম্বড়ের কথায় পার্বতী যে তাঁর আত্মীয়, তার আভাসমাত্র পাওয়া যায়নি। তাই বৃদ্ধার মুখের 'পারোত্তি' কৌতূহল আরও বাড়ালো।

"হ্যাঁ মা, ওঁকে দেখতেই এসেছি। দুপুরে বেশী ঘুমিয়েছি, উঠতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। তাই আপনার ছোট ভাই কাল সকালে যেতে বলেছেন।"

উনি আমায় নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। প্রায় আশী, পঁচাশীর কাছাকাছি হবেন। চোখে খুব কম দেখেন। সেই ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন. আব তখনই দু ফোঁটা জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। আমি বিচলিত হয়ে উঠলাম। আগেকার কোন ঘটনা মনে পড়ে গেছে কি? দুঃখেব ঘটনা নিশ্চয়, কিংবা ভাই যশবন্তেব কথা শুনে কষ্ট পেয়েছেন। নয়তো 'আমাদের পারোতী'ই ওঁর দুঃখের কারণ? কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, কারণ ওঁর সঙ্গে তো তেমন পরিচয় হয়নি, প্রশ্ন করলে যদি কিছু মনে করেন? এরি মধ্যে উনি নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি যশবন্তকে চেনেন? ওর মারা যাবার কথা কি মিথ্যে?" মনে হ'ল, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল। যশবন্তের মরবার আগেকার খবরটা মিথ্যে ছিল বটে; কিন্তু এখন তো উনি সত্যিই নেই। ভাবলাম, যশবন্তবাবুর মৃত্যু সংবাদ গোপন করে ওঁর আনন্দ স্থায়ী করবো, না আসল খবর দিয়ে মন ভেঙ্গে দেবো? এর আগে আমি যশবন্তবাবু আছেন কি নেই—সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলিনি। কিন্তু এ বৃদ্ধাকে আবার কি বলি? কিন্তু তখনই দেখলাম উনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। তা সহ্য করতে না পেরে বললাম, "মা, অতীতের কোন স্মৃতি মনে পড়াতে কি আপনি কষ্ট পাচ্ছেন?"

"বাবা, তুমি বিজ্ঞ ব্যক্তি, কিন্তু বয়সে তো আমিই বড়, না? নিজের সন্তানের সুখ পাইনি, তা বলে কি পরের সন্তানকে নিজের মনে করতে পারি না?"

এর মধ্যে শম্ভু বলে উঠল, "আমার পিসিমা বিয়ের আট দিন পরেই বিধবা হয়েছিলেন। উনি বলেন, তখন উনি আট বছরের ছিলেন। আগেকার দিনে, অষ্ট বর্ষ ভবেত কন্যা—মানে ঐ বয়সেই বিয়ে হয়ে যেত, না?"

এই বেদনাদায়ক প্রসঙ্গ এড়াবার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, "জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছেন, সে সব মনে করেই আপনার দুঃখ হচ্ছে বোধহয়। তখন আপনি আট বছরের ছিলেন আর আজ পঁচাশী বছরের।"

"তা নয় বাবা। আমার ভাগ্যেই ছিল যে আমার সিঁথের সিঁদুর মুছে যাবে। পূর্ব জন্মের কোন পাপের শাস্তি ঈশ্বর আমায় দিয়েছেন জানি না। কিন্তু এখন আমার দুঃখের কারণ এটা নয়।"

"তাহলে কি?"

"জ্ঞাতিদ্বেষের বিষ, সাপের বিষেরও বাড়া। এ কথাটা আমি যশবন্তের জন্যই বললাম। আমাদের পারোতীকেও এই বিষেই খেয়েছে।"

"মানে?"

"পারোতী ও আমি সমবয়সী। ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলেছি। আমার মত তারও কপাল পুড়েছিল। সে আমাদের আত্মীয় ছিল না। সে ছিল আশ্রয়হীন একটি বালিকা। আমার কাকা তাকে মানুষ করেছিলেন। কিন্তু ভাই ভাই-এর ঝগড়ায় আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। এটা বলা অবশ্য আমার ঠিক হচ্ছে না, কারণ এটা পিতৃনিন্দা। আমার বাবা ও যশবন্তর বাবা সহোদর ভাই ছিলেন। কিন্তু ওঁদের মধ্যে কৌরব, পাণ্ডবেরও বাড়া বিদ্বেষ ছিল। একদিন আমার বাবা রেগে গিয়ে খুব কটু কথা শুনিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ির পিছন দিকে আমার বাবার নিজের হাতে পোঁতা ঢেঁড়স গাছের দু-তিনটে ওদের মোষ খেয়ে ফেলেছিল। তাই রেগে গিয়ে ছিলেন। সেটা স্বাভাবিকই বলতে হবে। তবুও আমার বাবা অত্যন্ত খারাপ কথা উচ্চারণ করলেন। উনি তাঁকে শাপ দিলেন, 'যদি ঈশ্বর থাকেন, তো তোমাদের বাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, তার উপর বাঁশের ঝাড় গজাবে।' আর সে শাপও ফলল ঠিক। ওদিকে যে বাঁশের ঝাড়টা রয়েছে না, ওখানেই ওদের বাড়ি ছিল। ভাইয়ের ছেলে যশবন্ত সত্যিই আশ্রয়হীন হয়ে গেল। গাঁ ছেড়ে চলে যেতে

হলো ওখানে বাঁশের ঝাড় ডালপালা বিস্তার করে প্রায় বাঁশবন হয়ে গেল, বাড়ির চিহ্নও রইল না।

"কি নীচু মন ছিল ওঁর। বাড়ি আগেই ভাগ হয়ে গিয়েছিল। দুজনেই নিজের নিজের বাড়িতে শান্তিতে থাকতে পারতেন। বাড়ির মাঝখানে দেয়াল তুলেই ওঁরা থাকতে পারতেন। কিন্তু জ্ঞাতিদ্বেষ কি সাংঘাতিক! মানুষের জিভের বিষ সাপের বিষেরও বাড়া। নিজের নিজের ভাগ্য আব কি! আমার বাবা যেদিন এসব বলে ছিলেন সেদিন থেকেই দু-বাড়ির মধ্যে ঝগড়া বেড়েই চলল। ও বাড়িতে যে যেত সে এ বাড়িতে আসতে পাবত না। আমিও যশবন্তদের বাড়ি আর যাই নি। গুরুজনের অভিশাপেব ভয় ছিল যে। আমার কাকা যখন মারা গেলেন তখন যশবন্ত সবে যৌবনে পা দিয়েছে। ওর মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। ওর বিয়েতে এখান থেকে কেউ যায় নি। ওদের বাড়িঘর সব ধূলিসাৎ হয়ে গেলেও আমার বাবার রাগ ঐ বাপ মরা ছেলেটার উপর কিছুমাত্র কম হলো না। মা-মরা ছেলেটাকে আমার পাবোতীই মানুষ কবে ছিল। ওকে মানুষ করার জন্য পারোতী কি না করেছে। ওর দুধ কম পড়ে গেলে আমার থেকে চেয়ে পাঠাত। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দিতাম। আমাদের বাড়িতে কিছু খাবার হলে তা যশবন্তের জন্য আমি লুকিয়ে পারোতীব কাছে পাঠাতাম। জানি না আমাব বাবা এসব কথা কেমন করে একদিন জেনে ফেলেন। উনি আমায় বললেন, 'এরপর যদি তুমি পাবোতীর বাড়ি যাও তো আমার দিব্যি রইল।' কেন এত রাগ? কিসের জন্য? শেষে তো ওঁরও মৃত্যুই হ'ল। তারপর যশবন্তের বিয়ে হল। সুন্দব বউ এলো। ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করলাম, 'ওরা সুখী হোক'। কিন্তু গুরুজনের অভিশাপ তো। শেকড় গেড়ে বসেছে যা তা থেকে মুক্তি পাবে কোথায়? বিয়েব পর যশবন্ত সব বিলিয়ে দিয়ে রিক্ত হস্ত হল। অযোধ্যা ছেড়ে রামচন্দ্র যেমন বনবাসে গিয়েছিলেন তেমনি সেও যেন কোথাও চলে যায়, আর সেখানেই মারা যায়। তবে মৃত্যুর

কোলেই সবচেয়ে বড় শান্তি। আমার বাবাও মারা গেছেন। কিন্তু উনি শপথ দিয়ে আমাদের বেঁধে রেখেছেন। তবুও যশবন্ত আমাদের বংশেরই তো ছেলে? যেমন শঙ্কর তেমন সেও আমার ছোট ভাই। এখন আমার আর কে আছে? আর দু দিন বাদে তো মরবোই। তারপর আমার ছোট ভাই যা করতে চায় করবে। যশবন্ত আমার বড় গুণী ছেলে ছিল, তেমন ছেলে এ পরিবারে আর দ্বিতীয় নেই।"

ওঁর কথা শুনতে শুনতে ভুলেই গিয়েছিলাম আমি কোথায়, কোন যুগে আছি। জ্ঞাতিদ্বেষের এসব জঘন্য কথা শুনতে শুনতে আমার রক্তও গরম হয়ে উঠেছিল। আমার বন্ধু আজ আর এসব কথা শোনবার জন্য নেই, কিন্তু এসব কি উনি জীবনে ভুলতে পেরেছিলেন? কৈশোর থেকে যৌবনে আর যৌবন থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এ বিষ বহন করে উনি কি করে জীবনযাপন করেছিলেন? আশ্চর্য, এ সত্ত্বেও উনি দাদাকে কি করে এতো আপন করলেন? বৃদ্ধাটি ঠিক বলেছেন, যশবন্তবাবুর তুলনা হয় না। তখন মনে হ'ল এসময় পার্বতীর কথা না তোলাই শ্রেয়। তাঁকে ভুলে থাকা এখন তার পক্ষে ভালোই। বিদ্বেষ ভুলিয়ে দেওয়াই উচিত। নয়তো বিদ্বেষের কাঁটা বরাবর খচখচ করবে, কখনো শান্তিতে থাকতে দেবে না। বৃদ্ধাটির জীবনে না আছে শান্তি, না আছে স্থিরতা। তাঁর বাবার ক্রোধাগ্নিতে যশবন্তর মন ছারখার হয়েছে; তারই স্মৃতি ওঁকে অহরহ ব্যথিত করে তুলেছে। সেই অভিশাপ থেকে পার্বতীম্মাও রেহাই পাননি। যেখানে উনি থাকেন সেখানে এই বৃদ্ধার প্রবেশ নিষেধ। যশবন্তের বাড়ি ঝড়বৃষ্টিতে ধ্বসে মাটিতে মিশে গেছে, তার উপর বাঁশ ঝাড় গজিয়েছে। ঐ ঝাড়টাই তো এক ঘণ্টা আগে শঙ্কর হেগ্‌গড়ে দেখিয়েছিলেন। শাপের ইতিহাস উনি জানেন না মনে হ'ল। যশবন্তবাবুর বিষয় এমনভাবে উল্লেখ করছিলেন যেন উনি ওঁর কেউ নয়। কিন্তু এ বৃদ্ধার কথাবার্তার ধরন একেবারে বিপরীত। ইনি নিঃসন্তান, কিন্তু মায়ের জাত তো। তাই বংশের একটা ছেলেকে নিজের সন্তানের মতনই ভালবেসেছিলেন। বোধহয়

এই সূত্রে পার্বতী আর ওঁর মধ্যে যোগাযোগ ছিল। যশবন্ত না থাকলে কি হবে? পার্বতীর উপর যে শাপ লেগেছে।

পাঁচ

রাত্রি শেষে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। মুখ ধুতে না ধুতেই খবর এল জলখাবার তৈরী। শঙ্কর হেগ্‌ড়ে শম্ভুকে বললেন—"একে জলখাবারের জন্য ভেতরে নিয়ে যাও।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আর আপনি?"

"আমার স্নান হয়নি। স্নানাহ্নিক সেরে কিছু মুখে দেব। আপনি খেয়ে নিন আগে। তারপর স্নান টান করে যেখানে যাবার যাবেন। দুপুরের মধ্যে এখানে ফিরে আসবেন কিন্তু। পার্বতীর সঙ্গেই তো দেখা করবেন, আর তো কোন কাজ নেই? অনেক বয়স হয়েছে তাঁর। আমার বড় বোনের মতই তিনিও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছেন। বেঁচেও যেন মরে আছেন।"

"ওখান থেকে ফিরেই স্নান করবো। কেমন করে জানব, রাস্তায় যাবার সময় কাদায় আবার স্নান করতে হবে না। আপনি তো আমার সঙ্গে আসতে পারবেন না। তার জন্য ভাববেন না, একজন চাকরকে সঙ্গে দিলেই হবে।"

এর মধ্যে ওঁর ছেলে শম্ভু বলে উঠলো, "বাবা, আমি ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি।"

উনি ধমকে দিলেন, "তুমি চুপ করো। তুমিও যাবে না, আমিও যাব না। যাবে সুরব।" তারপর আমায় বললেন, "অনেক দিন আমাদের মধ্যে যাওয়া-আসা নেই। আমাদের পূর্বপুরুষদের দিব্যি আছে তাই। এমনিতে ওদের সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই।"

"হ্যাঁ, আপনার দিদি সব বলেছেন।"

উনি আশ্চর্য হলেন, "তাই নাকি? ইতিমধ্যে দিদির আপনাকে সব বলা হয়ে গেছে? আমার দিদির পার্বতীঅন্ত প্রাণ। নিজে ওখানে না গেলে কি হবে, ওর কথা না ভেবে একদিনও উনি থাকতে পারেন না।"

এর মধ্যেই ওঁর মালি সুব্ব এসে গেল। শঙ্কর হেগ্‌গড়ে তাকে আমার সঙ্গে যেতে বললেন। তা দেখে শম্ভুর মুখ শুকিয়ে গেল। ওর আমার সঙ্গে আসবার বড ইচ্ছা ছিল।

জল খেতে ওঁর ছেলের সঙ্গে অন্দরমহলে গেলাম। ফিরে এসে দেখলাম সুব্ব আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ওঁর সঙ্গে পার্বতাম্মার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। শঙ্কর হেগ্‌গেড়ে সুব্বকে বললেন, "এঁকে বড় রাস্তা দিয়ে পারোর্তী ঠাকুরমার ওখানে নিয়ে যাও। বাগান দিয়ে যাবার সময় তোমার বাড়িতে গিয়ে যেন গল্প জুড়ো না। উনি ঠাকুবমার সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি ওখানেই থাকবে।" তারপর আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম।

বাগান পার হয়ে আমরা মেঠো পথ ধরলাম। রাস্তায় সুব্বর সঙ্গে কোনো কথা বলি নি। প্রায় আধ মাইল এবড়োখেবড়ো রাস্তার পর সামনে একটা সুপুরী বাগান। ওখানে শম্ভু হেগ্‌গড়ে আমাদেব পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। ও নিশ্চয় আমাদের ধরবার জন্য ছোট রাস্তা দিয়ে দৌড়ে এসে থাকবে। আমরা কাছে যেতে বলল, "সুব্ব, পূজার জন্য চাব-পাঁচটা কেওড়াফুল চাই, নিয়ে এসো। আমি এঁকে ঠাকুরমার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এখানেই ফিরে আসছি, তুমি আমার জন্য এখানেই অপেক্ষা করো।" শুনে কেমন ধাঁধা লাগল কিন্তু বাধাও দিতে পারলাম না। আমরা দুজনে সুপুরী বাগানে ঢুকে পড়লে শম্ভু আমাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করে দিল, "আপনি উডুপির দিকে থাকেন, বললেন না? কিন্তু আপনার নাম তো জানি না। আপনি যখন যশবন্ত কাকার বন্ধু, আপনার নাম জানা তো দরকার।"

আমার নাম শুনতেই শম্ভু বিবর্ণ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ শুধু

বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইল। ওর চেহারা দেখেই আমি সব বুঝে ফেললাম। ভেবেচিন্তেই ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা হেগ্‌গড়ে বাবু, এই গ্রামে শম্ভু ভট্ট বলে কি কেউ থাকে?"

"আপনি কি তাই যাচাই করতে এসেছেন?"

"যাচাই কিরকম? বুঝলাম না তো?"

শম্ভু হকচকিয়ে গেল। পর মুহূর্তেই আমার দু-হাত চেপে ধরে বলল, "দয়া করুন, আমার মান সম্মান আপনার হাতে। আমায় মারুন, কাটুন, যা খুশি করুন—কিন্তু ঠাকুরমা ও বাবার কাছে আমায় নীচু করবেন না।"

আমি বললাম, "আমার তো কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। এ-সব কি বলছেন? কি ব্যাপার?" আমার সন্দেহ দেখি সত্যে পরিণত হল। নিঃসন্দেহ, এই পার্বতাম্মার রসিদের সাক্ষী শম্ভু ভট্ট। পার্বতাম্মার নামে পাঠানো টাকাগুলি ইনিই মারছেন। সেই বুড়ো গোয়ালাটা আমায় আগেই বলেছিল এখানে শম্ভু ভট্ট নামের কেউ নেই। টাকার লোভে বাপের চোখ বাঁচিয়ে বুড়ীর বাড়িতে আসে যায় নিশ্চয়। যশবন্তবাবু মারা যাবার পর থেকে আমিই তো টাকা পাঠাচ্ছিলাম। এ ভেবেছিল আমি কিছুই বুঝতে পারব না, তাই সব টাকা নিজে নিচ্ছিল। যখন আমি ভাবছিলাম পিয়নের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ওরা দুজনে বুড়ীকে ঠকাচ্ছে, তখন দেখি শম্ভু একেবারে ঘাবড়ে গিয়ে কেঁদে ফেলেছে। আমার পায়ে মাথা খুঁড়ে বলছে, "বাঁচান, বাঁচান।" তারপর সব-কিছু ও নিজেই প্রকাশ করে ফেলল। ওরা বুড়ীকে এই বলে ভুলিয়েছিল যে তার নামে শুধু পাঁচ টাকা আসে, আর বাকীটা দুজনে আধাআধি বখরা করে নিত। কিন্তু যখন থেকে টাকা আমি পাঠাতে আরম্ভ করেছি, তখন থেকে পুরোটাই এনার পেটে যাচ্ছে। এ-সব জেনে আমার খুব কষ্ট হল। হায় রে, গরিবের অর্থলোভ। শঙ্কর হেগ্‌গড়ে খুব সম্ভব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছেলেকে কিছুই দিতে পারেন নি। দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েছে, ছেলেপিলের বাপ হয়েছে, টাকার

লোভে ভুল পথে পা দিয়েছে। আমিও এ-বাড়ির নুন খেয়েছি। সব স্বীকার করে ও এখন আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। কি করব বুঝতে না পেরে বললাম, "যান, আপনি বাড়ি যান। আপনার বাবা আসতে বারণ করেছিলেন না ?"

মিনতি করে সে বলল, "আপনি আমার কথা রাখবেন তো ?"

"হ্যাঁ।"

"ঠাকুরমাকেও বলবেন না কিন্তু।"

আমি রূঢ়স্বরে বললাম, "বলব না, যান আপনি।"

"আপনি রেগে গেছেন ?"

"আপনার উপর নয়।"

তখনই কেওড়াফুল নিয়ে সুব্বকে আসতে দেখলাম। আমি বললাম, "ফুল নিয়ে আপনি বাড়ি যান। আপনার কোনো ভাবনা নেই। দুপুরে খেতে আসব।"

"ওখানেই থেকে যাবেন না যেন।"

"ওখানে গেলে কি হবে তা কি করে বলব ?"

বেচারা বুড়ী—চাল নেই, চুলো নেই—তবু সবাই তাঁকে ঠকাচ্ছে। তাঁর কাছে কত সময় লাগবে আগে থেকে কি করে বলব, এই-সব ভাবতে ভাবতে সুব্বর সঙ্গে বাগানটা পার হয়ে গেলাম। সামনে একটা বেশ বড় বাড়ি। বাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সুব্ব বলল, "এটাই নীচের চোচ্চল বাড়ি। এঁরা বড়লোক। ঠাকুরমার বাড়িটা আর-একটু দূরে।"

বাড়ির কর্তা বৈঠকখানায় বসেছিলেন। "আরে সুব্ব যে ? কোথায় যাচ্ছিস ? ইনি কে ?" জিজ্ঞাসা করলেন উনি। আমি কিন্তু এগোতেই থাকলাম। সুব্ব দৌড়ে গিয়ে ওঁকে কিছু বলে ফিরে এলো। আর একটু এগুতেই একটা কুঁড়েঘর দেখা গেল। উঠোনে তুলসী গাছ। ভিজে শাড়ী পরে একটি বৃদ্ধা তুলসীগাছ পরিক্রমা করছিলেন। আমি বেশ খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ইনিই ?" "আজ্ঞে-হ্যাঁ" বলে সুব্ব ওখান থেকেই চেঁচিয়ে

উঠল, "ঠাকুরমা, উপরের বাড়ির কর্তা এঁকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।" বৃদ্ধাটি তখন জপ করতে করতে তুলসীতলায় মাথা নত করলেন। কপালে মাটি ছোঁয়ালেন, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কেউ দাঁড়িয়ে না?" সুব্ব আগের কথার পুনরাবৃত্তি করল। কিন্তু এত আস্তে বলল যে আমার মনে হল বৃদ্ধাটি কিছুই শুনতে পেলেন না। তাই আমি বললাম, "মা, আমি বাইরে থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনার একজন প্রিয়পাত্র আমায় আপনার খবরাখবর নিতে পাঠিয়েছেন।" আমি হাতজোড় করেই দাঁড়িয়েছিলাম, তা দেখে উনি বললেন, "বাবা, আমায় নমস্কার করছ কেন? ভগবানকে প্রণাম করো," বলে তুলসীতলার দিকে ইশারা করলেন।

"আপনি আমার থেকে বয়সে বড় যে।"

বৃদ্ধাটি মাথা নেড়ে বললেন, "না, না, সে কি কথা? ঈশ্বরকেই প্রণাম করো।"

"ঈশ্বরকেও প্রণাম করব, কিন্তু বড়দের করতে তো কোনো দোষ নেই, মা!"

উনি আমার কাছে এসে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর 'এই নাও' বলে চরণামৃত দিলেন। আমিও তখুনি নিয়ে নিলাম। আবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, "বাবা, আমি সত্তর না আশী পার করে গেছি, চোখে ভালো দেখতে পাই না। তুমি কে বাবা?" বলে আবার আমাকে দেখতে লাগলেন। "ঠিক চিনতে পারছি না, আগে কি তোমাকে কখনো দেখেছি? আমাদের যশবন্ত নও তো? কিন্তু সে আর কোত্থেকে আসবে? কুমটা ছাড়বার পর থেকে আর আসেই নি। কিন্তু সে আমায় কখনো ভোলে নি। প্রত্যেক মাসে পাঁচ টাকা করে পাঠায়। প্রায় তিনমাস হ'ল টাকা আসছে না। যাক্‌গে, আবার পাঠাবে নিশ্চয়।" ওঁর এ কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম।

"আমাকে তুমিই বলুন। আপনি আমার ঠাকুরমার মতো। আপনার মুখে তুমি শুনতে আমার খুব ভালো লাগছে।"

"কোন গ্রাম থেকে এসেছ, বাবা? যশবন্ত তোমার কে হয়?"

"উনি আমার বড় ভাই-এর মতো। এমনিতে আমার আত্মীয় নন, শুধু স্নেহের সম্বন্ধ।"

"একটু বসবে তো?"

"তাই তো এসেছি, আপনার সঙ্গে কথাটথা বলব বলে।"

পার্বতাম্মা আমাকে ওখানেই বসিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। আমি বাইরে এসে আমার ফিরতে একটু দেরি হবে বলে সুব্বকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। ও চলে গেল। ভেতরে এসে আবার স্বস্থানে বসলাম। ঘরের ভেতর থেকে খট খট আওয়াজ শুনে মনে হ'ল উনি কিছু খাওয়ার আয়োজন করছেন। ওখানে বসে উচ্চস্বরে বললাম, "ঠাকুরমা, আমার জন্য কিছু করবেন না।" ওঁর আর নিজের বলতে কে আছে যে সাহায্য করবে? হয়তো পাড়ার লোকের উপরই নির্ভর। যশবন্তবাবুর পাঠানো পঁচিশ টাকা থেকে মাত্র পাঁচ টাকাই উনি পেতেন। তাতেই উনি তাঁর সব খরচ চালাতেন। তিনমাস

হ'ল তাও পান নি। এ-সব ভেবে খুব কষ্ট হ'ল আমার, আর ভয়ও হতে লাগল। বুড়ীর কাছে যশবন্ত বেঁচে আছেন এ মিথ্যে বলাটা কি উচিত হবে? কিন্তু তা ছাড়া উপায় কি? নিজেই তো বলছিলেন, "ওই ওঁর স্বর্গ।" যাকে লালনপালন করে মানুষ করেছেন তাঁর স্মৃতিই ওঁর কাছে অমৃত তুল্য। এ জানবার পরও কি আমার বলা উচিত হবে, ওঁর 'প্রিয়জন' তিনমাস আগেই চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে।

একটু পরেই পার্বতাম্মা আমার জলখাবার নিয়ে এলেন। আমি তো দেখে অবাক। একটা থালাতে চার-পাঁচটা সেঁকা পাঁপড় আর কাঁসার ঘটিতে কিছু পানীয়। আমার সামনে রাখতে রাখতে বললেন, "অনেক দূর থেকে ক্লান্ত হয়ে এসেছ। কাঁচা মুগ ফেঁটিয়ে ঘোল করেছি, নাও লজ্জা করো না। কাঁচা মুগ শরীর ঠাণ্ডা করে।"

আমি বলে ফেললাম, "ইস্, পাঁপড় সেঁকে দিয়েছেন?"

"নামেই শুধু পাঁপড়। কলাই বা কাঁঠাল কিছুরই নয়। কেসওয়ের শিকড়ের তৈরি। বয়েস হলে কি হবে? জিভের স্বাদ তো যায় নি! নুন লঙ্কা এখনো কী ভালোই লাগে। কতবার আমায় মুঙ্গকাওয়া লুকিয়ে লুকিয়ে পাঁপড় পাঠিয়েছে। এ পাঁপড়গুলো ওর তৈরি না আমার, ঠিক বুঝতে পারছি না।"

আমি পাঁপড় খেতে লাগলাম। এর আগে কখনো কেসওয়ের পাঁপড় খাই নি। বেশ শক্ত, কিন্তু নুন লঙ্কার জন্য খেতে বেশ ভালো লাগছিল। তারপর মুগের সরবত খেয়ে বললাম, "ঠাকুরমা, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এইরকম মুগের সরবত গুড় দিয়ে খেতাম। পেটও ভালো থাকত আর শরীরও ঠাণ্ডা হত। আচ্ছা ঠাকুরমা, আপনি যে এক্ষুনি মুঙ্গকাওয়া বললেন, তিনি কে?"

"আমার বড় জা হন, বয়স আমারই মতন। আমরা দুজনে হরিহরাত্মা। তুমি শঙ্কর হেগ্‌গড়ের ওখান থেকে আসছ না? ওঁর বোনকে দেখ নি? সে আমার সই।" বলতে বলতে ওঁর চোখ সজল হয়ে উঠল। "দেখ বাবা, কোনো কোনো সম্পর্ক যেন পূর্ব-

জন্মের। যশবন্ত ও আমার মধ্যে মা-ছেলের সম্বন্ধ। সই ও আমার মধ্যে বোনের সম্বন্ধ। প্রায় পনেবো কুড়ি বছর যশবন্তকে দেখি নি। কে যে কাকে ভুলল। সইটি এত কাছে থাকলে কি হবে? আমবা যেন এক নদীব দুই পারে আছি।"

"নদী?"

"নদী কেন? দুস্তর সমুদ্র। দেখো বাছা, আমার যশবন্তব বাবাব সঙ্গে সইএর বাবার ঝগড়া ছিল। সইএব বাবা সইকে দিব্যি দিয়ে বারণ কবেছিলেন যেন কেউ কারুর বাড়িতে যাতায়াত না করে। তাই সন্তানদেবও তো অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরে সে প্রতিজ্ঞা রাখতে হবে?"

"তা জানি। উনিই আমায় সব কথা বলেছেন। আপনি যশবন্তবাবুকে মানুষ করেছিলেন, দুধ চুরি করে আপনাকে দেওয়া, ওঁর বাবাব টের পাওয়া— সব শুনেছি। সামনের বাঁশঝাড় দেখিয়ে উনি খুব কেঁদেও ছিলেন। কিন্তু যা এখন নেই তা নিয়ে আর কি করা যায় মা?"

"তা হলে তুমিও সব জেনে গেছ? এরপর বছবে দু-একবার বেনকাইয়ার মন্দিরে পূজা দিতে যাবার সময় আমাদেব দুজনের দেখা হত। তখনই আমরা নিজের দুঃখ পরস্পরকে শোনাতাম ও কাঁদতাম। আমার মতো সেও অনেক কষ্ট পেয়েছে। এখন কি আর আমি আগের মতো খাটতে পারি? যতদিন পেরেছি উপরের বাড়িতে কাজ করেছি। এখন আর পেরে উঠি না। ওদের বাড়ি কিন্তু নতুন খাবারটাবার হলেই সই আমায় শম্ভুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেয়, আমায় খুব ভালোবাসে বলে। শম্ভুও ওর বাবার চোখ এড়িয়ে আমায় দিয়ে যায়। ওর বাবা জানলে কি আর রক্ষে ছিল? মিছিমিছি ঝগড়া বাধিয়ে কি লাভ? তাই বাড়িতে কিছু না বলে এখানে আসত। যশবন্ত যে টাকা পাঠাত তার রসিদে আমার বুড়ো আঙুলের ছাপ লাগিয়ে শম্ভুই নিয়ে যেত। কি জানি, তিনমাস হয়ে গেল টাকাও আসছে না।"

"আচ্ছা ঠাকুরমা, পাঁচ টাকায় আপনার সারামাসের খরচ চলে যেত ?

"ছেলের পাঠানো পাঁচ টাকা আমার কাছে পাঁচশো টাকা।"

"পাঁচ টাকায় সব হয়ে যেত ?"

"দিনে একবার তো খাওয়া, তার জন্য আর কত লাগবে ? বছরে দুটো থান। তবে এবার সেগুলো ছিঁড়েছে। এখন ভিজে কাপড়েই কাজ চালাচ্ছি। এবার টাকা এলে রাম হেগ্‌ড়ে বা শম্ভুকে দিয়ে একটা থান আনিয়ে নেব।"

"ঠাকুরমা, যশবন্ত আপনাকে খুব ভালবাসত, না ?"

"হ্যাঁ, ও তো আমার বুকের ধন।"

"আপনিই ওঁকে মানুষ করেছিলেন ?"

"আমি আর কোথায় মানুষ করলাম, বাবা ? ভগবানই করেছেন, আমি তো উপলক্ষ্য মাত্র। যখন বিধবা হলাম তখন আমায় আশ্রয় দেবার কেউ ছিল না। বড ভাই আর মা ম্যালেরিয়ায় মারা যান। তখন খাব কি ? তাই ভগবন্ত হেগ্‌ড়ের বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নিলাম। উনিই যশবন্তের বাবা। খুব ভালো লোক ছিলেন, কিন্তু খুব স্পষ্টবক্তা। তাঁর সেরকমই স্বভাব ছিল। যশবন্তের মা সাবিত্রী নিত্যরুগী। তিন-চারটি সন্তান হবার পর মারা গেল। যশবন্ত তার চতুর্থ ছেলে। যখন জন্মেছিল ওর মার বুকে দুধ ছিল না, তাই খুব দুর্বল ছিল। শরীর হাড়সার। সারাদিন কাঁদত। আমি ছাড়া ওকে দেখবার কেউ ছিল না। ও যে দু-বছরও পার করবে তার আশা ছিল না। বেনকাইয়ার দয়ায় ও বেঁচে গেল। তারপর ওর মাও মারা গেল। আমার কাছেই মায়ের আদর পেয়েছে। যশবন্তের বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন। তবে তার কোনো সন্তান হয় নি। হলে পরে যশবন্তের দুঃখের কি সীমা থাকত ?

"আমি যদি বলি যশবন্তকে আমিই মানুষ করেছি তো সেটা ছোটমুখে বড় কথা হবে। ঈশ্বরই ওকে মানুষ করেছেন। এর মধ্যে শঙ্কর হেগ্‌ড়ের বাবা ও ওঁর ছোট ভাই ভগবন্তৈয়ার মধ্যে

ঝগড়া হ'ল। শাপান্ত করা হ'ল। সম্পত্তি ভাগ হ'ল। তবুও শত্রুতা ঘুচল না। সই যে আমায় লুকিয়ে দুধ পাঠাত সেটা তখনকার কথা। যাক্ গে, এখন ও-সব ছাড়ো।

"এরপর যশবন্ত বড় হ'ল। ভগবন্তেয়ার ইচ্ছা ছিল ওর ছেলে লেখাপড়া শিখে ভালোভাবে মানুষ হোক্। তাই বাড়িতে মাস্টার রেখে ওকে পড়ালেন। শেষকালে ইংরাজি পড়াবার জন্য কুমটায় পাঠালেন। ঘটা করে বিয়েও দিলেন। সুন্দর বৌ এলো। ওদের গৃহপ্রবেশ বোধহয় শুভমুহূর্তে হয় নি, এরপরই ওর বাবা মারা গেলেন। আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল। রয়ে গেল শুধু যশবন্ত আর তার বউ।"

"ওঁর স্ত্রীর নাম কি ছিল?"

"কি জানি, কি নাম ছিল, ঠিক মনে নেই। বোধহয় কমলা! হ্যাঁ ঠিক, কমলাই বটে। দেখতে তো বাবা খুবই সুন্দর ছিল কিন্তু আমার ছেলের যোগ্য হয় নি। ঈর্ষাপরায়ণ, কারুর এ স্বভাব জন্মগত। এখানে এসে ঈর্ষা আরও বেড়ে গেল। ওদের একটি আশ্রিতাও ছিল। কে জানো? এই পারোতী, ক্ষুধার তাড়নায় যে আশ্রয় নিয়েছিল। কমলা আমাকে দেখতে পারত না। আমরা আদায়-কাঁচকলায় ছিলাম। আমি ওখান থেকে চলে যেতে চাইলে যশবন্ত বলত, 'আমি তা হলে আত্মঘাতী হব।' বাড়ির ভেতর এই অবস্থা আর বাইরে শঙ্করের বাবার অভিশাপ। উভয়সঙ্কট। সমুদ্র-মন্থনের পরে আগে বিষ বেরিয়েছিল না?

"তুমি জানো না, যশবন্ত কত ভালো ছিল। ছোটবেলা থেকেই ওর অনেক গুণ। যা খেতে দাও খাবে, যা পরতে দাও পরবে, কিছুতেই আপত্তি নেই। যদি কেউ ওকে বলত, 'মানিক আমার একটু আমায়ও খেতে দাও,' তো তক্ষুনি দিয়ে দিত। গাঁয়ের সবাই এ-সব জানত। তাই ওর প্রশংসা করে, খোশামোদ করে, ফুসলিয়ে, নিজের দুঃখের কথা শুনিয়ে, লোকে ওর থেকে কিছু-না-কিছু আদায় করে নিত। সেও দিতে কসুর করত না। সবাইকে দিয়ে দিয়ে

সে ফতুর হয়ে গেল। ওর বৌও যা পেত তা বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিত। সেইজন্য ওর অনেক ধার হয়ে গিয়েছিল। আয় যথেষ্ট ছিল কিন্তু ধার শোধ দিতেই সব শেষ হয়ে গেল। তারপরও যে ধার রয়ে গেল তা উশুল করবার জন্য পাওনাদারবা ওকে ছেঁকে ধরল। সব সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে ওকে গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হল। আমিই ওকে এ বাড়িব নীচের অংশটি বিক্রি করতে বারণ করেছিলাম, তাই এটা বিক্রি করে নি। বাদবাকী সব আমাদের প্রতিবেশী রাম হেগ্‌ড়ে কিনে নিয়েছিল। কিনেছিল না ধার শোধের হিসেবে নিয়েছিল ঠিক মনে পড়ছে না। তবে বাড়ি বিক্রির সময় যশবন্ত শর্ত করিয়ে নিয়েছিল, যতদিন পার্বতী বাঁচবে বাড়ির নীচের অংশ তার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। আমায় ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছে ওর মোটেই ছিল না।

"লাখ কথার এক কথা— ওর সঙ্গে থাকা আমার ভাগ্যে ছিল না। ও কুমটায় চলে গেল। টাকাকড়ি তো এখানেই সব শেষ। ওখানে ব্যবসা করে কিছু উপার্জন করেছিল। ওখানেই সংসার পেতেছিল। প্রত্যেক বছর এসে আমায় সম্বৎসরের সিধে ও কাপড় দিয়ে যেত। বলত, 'মা, তুমিই আমার দেবতা, তুমিই আমার সব। আমার স্ত্রীকে তো জানো !. সে আমার পূর্বজন্মের শত্রু। প্রতিশোধ নেবার জন্য এ জন্মে আমার স্ত্রী হয়েছে।' যাই হোক্ ওদের চারটি সন্তানও হয়েছিল। আমি ভাবলাম এবার সুখের মুখ দেখবে, কিন্তু তা ওর ভাগ্যেই ছিল না। মা ছেলে দুজনেই দুষ্ট প্রকৃতির। এখানে পঁচিশ বছর ছিল সে, ওখানেও প্রায় তাই। তারপর হঠাৎ একদিন ঘরবাড়ি ছেড়ে পাণ্ডবদের মতো বনবাসে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে এখানে একবার এসেছিল। তার মনের সব কথা আমায় বলেছিল। কি কথা জানো? সেই-সব পুরনো কথা, নতুন কিছু নয়। 'আর আমার ঘর-সংসার চাই না! অনেক সুখভোগ করেছি। আর কোথাও গিয়ে নির্ভাবনায় জীবন কাটাব।' বলে চুপ হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, 'বাবা, তুমি আমার সঙ্গে তো থাকতে পারো?' 'মা, আমি

তোমায় নিজেই নিয়ে যেতাম, তোমার দেখাশুনা করতাম, সেটাই আমার কর্তব্য। কিন্তু নিজের স্বার্থে তোমাকে আমি বাঁধতে চাই না। না, না, আমি দূরে আলাদাই থাকব। আমার বাঁচা-মরা তো ভিন্ন কথা, তবে তোমার দৌলতেই আমি বড় হতে পেরেছি।' এই বলে ও চলে গেল, বাবা। তারপর আর ফেরে নি।"

এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "বাবা, ও যেখানেই থাকুক, আমায় ভুলতে পারে না। আমিও কি ওকে ভুলতে পারব? মারা যাবার পরও আমরা কেউ কাউকে ভুলব না। আজ পর্যন্ত ওকে কি আমি ভুলতে পেরেছি, ও যে আমার মনে অনুক্ষণ রয়েছে।"

একটু পরে উনি যশবন্তবাবুর ছেলেবেলার কথা শোনাতে লাগলেন। সব শুনতে শুনতে কেবলই আমার মনে হচ্ছিল, কেমন করে এঁকে আমি বলব যে তিন মাস আগেই সে ছেলে মারা গেছে। তাই শুধু এই প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যই আমি বললাম, "আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মাত্র বছর চার-পাঁচেকের পরিচয়। বছরে দুবার বোম্বে যেতে হত। ওঁর সঙ্গে প্রত্যেকবারই দেখা করতাম। শেষবার যখন যাই তখন আমাকে একান্তে ডেকে বলেছিলেন যে আমাকে উনি কিছু টাকা দেবেন যাতে প্রত্যেক মাসে আপনাকে পঁচিশ টাকা করে পাঠাতে পারি।"

"এত বেশি?"

"বেশি কম জানি না, যা পাঠিয়েছেন তা তো আপনাকে নিতেই হবে।"

"আমি যা বললাম, ওকে আমার হয়ে লিখে দাও।"

"উনি আর নেই, মা।"

"মানে?"

"সকলের পরমায়ু কি আর একশো বছর হয়?"

"হায় রে আমার ধন!"

"তিন মাস হল উনি মারা গেছেন।"

এরপর আমরা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম। দুজনেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল! না জানি উনি এ সংবাদ কি ভাবে নিলেন ভেবে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। বন্ধুর কথা মনে করে আমার চক্ষু সজল হয়ে উঠল। উনি আমাকে যেন কিছু বলতে চাইলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, তোমার বয়স কত?"

"পঞ্চাশ।"

"তা হলে আমি তোমার থেকে ত্রিশ বছরের বড়। তুমিই বলেছিলে না, আমি বড়? হ্যাঁ, বয়সে তো আমি তোমার থেকে বড়ই বটে।"

"শুধু বয়সে কেন, সব বিষয়েই মা আপনি বড়।"

"তা হলে শোনো, বুদ্বুদের মতোই ক্ষণভঙ্গুর এ জীবন। সে কি কখনো স্থির থাকতে পারে? তুমি কেন দুঃখ করছ? তোমার বন্ধু আর এ জগতে নেই বলে? মরণ কার নেই? পাণ্ডবরা আজ নেই, কৌরবরাও নেই। মরণকে কি কেউ এড়াতে পেরেছে? এ শরীর তো শুধু একটা ছেঁড়া পোশাকের মতো। তাতে কি প্রাণ থাকে? যশবন্তের পোশাক ছিঁড়ে গেছে। কাল আমারও দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। তোমারও তাই হবে।"

"তা অবশ্য।"

"তা তো বলছ, কিন্তু লোকে মানলে তো? যদিও মানাই উচিত। যে মানে না, সে মানুষ নয়। যশবন্ত অমর। কখনো মরবে না। ও এখনো আমার চোখের সামনে রয়েছে। মরে গেছে শুধু ওর দেহ। ঈশ্বর আমার বাছাকে তাঁর কোলে টেনে নিয়েছেন। তাঁর দরকার ছিল যে! আমি বুড়ী যদি বলি, 'আমিও আসব', তা হলে ভগবান আমায় বলবেন, 'থামো, থামো। যখন আমি ডাকব তখন এসো।' আগে উনি আমাকে ডাকুন। যতক্ষণ না ডাক আসছে, আমাকে এ দুঃখ ভোগ করতেই হবে। উনি ডাকলে কান্নার কি আছে বাবা?"

"হ্যাঁ মা, সকলে কি তা বোঝে? এমন করে গ্রহণ করা বড় শক্ত।"

"কিন্তু এমনটি হওয়া দরকার। তা হলে, আমার বাছা চলে গেছে?"

"হ্যাঁ, বোম্বেতে তিন মাস আগে মারা গেছেন। সে সময় আমি তার পেয়ে ওখানে গিয়েছিলাম। বন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে শুধু ওঁর মৃতদেহটি দেখলাম, তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাই নি।"

"সে দেখার ভাগ্য চাই বাবা।"

"হ্যাঁ, মা, সব জিনিষের জন্যই ভাগ্য চাই। আপনার জন্য কিছু টাকা এনেছি। আপনাকে দেবার জন্য উনি যা দিয়ে গেছেন তা তো আমায় দিতেই হবে, না?"

"অত টাকা নিয়ে আমি কি করব বাবা? পাঁচ-দশ টাকা যদি দাও তা নিতে পারি।"

"কিন্তু আমি ও টাকা রেখে কি করব? আমি তো উপার্জনশীল। তা ছাড়া, এ টাকাটা আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন। আমার সঙ্গে ওঁর তো রক্তের সম্বন্ধ নেই। মরবার সময় কয়েক হাজার টাকা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে উনি লিখেছিলেন, এ টাকা তুমি যেমন ভালো বোঝ, খরচ কোরো। উনি যদি এ টাকা খরচের স্পষ্ট নির্দেশ দিতেন তবে আমার কোনো চিন্তার কারণ থাকত না।"

"সত্যি বলছ?"

"এতদূর থেকে কি মা আপনাকে মিথ্যা বলতে এসেছি?"

"তা হলে আমার একটা কথা আছে।"

"কি বলুন?"

"ও যদি তোমায় পঁচিশ টাকা প্রতি মাসে আমাকে দিতে বলে থাকে তা হলেও আমার তো পাঁচ টাকায়ই কাজ চলে যাবে। তা হলে প্রতিমাসে কুড়ি টাকা বাঁচবে, না?"

"হ্যাঁ, তা বাঁচবে।"

"তা হলে সেই টাকাতে ওর নামে একটা কাজ করা যেতে পারে।"

"কি কাজ বলুন?"

"আমাদের এখানে বেনকাইয়াকে দেখবার কেউ নেই। এ জায়গায় শুধু ঐ একটাই মন্দির। আগে তো প্রায় একশো ঘর ব্রাহ্মণ এখানে থাকত, এখন বড়জোর দশ ঘর হবে। সবাই এখান থেকে চলে গেছে। কেন জানো? ওরা বেনকাইয়ার দেখাশুনা আর করত না। ভগবানও বোধহয় পরীক্ষা নিচ্ছেন। তা না হলে কি বেনকাইয়ার মন্দিরের এ দশা হত? মন্দিরের চার পাশ আগাছায় ভরে গেছে, ছাদ ও দেয়াল পড়ে যাবার দাখিল হয়েছে, গাঁয়ের লোকেদের তার জন্য কোনো অনুশোচনা নেই। বেনকাইয়াকে ওরা ত্যাগ করেছে। আমরা শুধু নামেই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণত্ব বলে কিছু নেই। ভগবানকে যখন ছেড়ে দিয়েছি তখন ব্রাহ্মণত্ব থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি?"

"মা, আপনি যদি রাগ না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? ঈশ্বর আছেন কি? এ বিষয় আমার মনে প্রায়ই সন্দেহ জাগে।"

"তা হলে তুমিও দেখছি আমার যশবন্তের মতোই…।"

"মানে?"

"যশবন্তও আমায় কয়েকবার এই কথাই বলেছে। তার জন্যই ওকে এত কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে।"

"আপনি কি বলছেন? ঠিক ধরতে পারছি না।"

"বাবা, যার বিশ্বাস আছে তার জন্য উনি আছেন। নিজের স্বার্থের জন্য যারা ওঁকে মানতে চায় তাদের কথা আলাদা। 'আমায় এটা দাও, সেটা দাও। যদি দাও তো তুমি ভালো, না দাও তো খারাপ,' এমন কথা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা বলতে পারে না। বেনকাইয়ার মন্দিরেই ঈশ্বর আছেন, আর কোথাও নেই, সে বলাও ভুল। যাঁরা জানেন তাঁরা বলেন, ঈশ্বর সব জায়গায়ই আছেন। এইভাবে দেখলে সব জিনিষই ঈশ্বর, প্রাণীমাত্রই ঈশ্বর। আমার মতো সকলের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন, ভাবলেই জীবনের সার্থকতা। শুধু মুখে 'ঈশ্বর আছেন' আওড়াবার কোনো মানে হয় না।"

"ঠিক বলেছেন। এবার অনুমতি হলে যে টাকা আমি এনেছি সেটা আপনাকে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। খাবার সময় ফিরে আসব বলে এসেছিলাম ওখানে।"

"দুটি ভাত খেয়ে যাও বাবা। আমাব ধর্ম, অতিথিকে খাওয়ানো, আর তোমার ধর্ম তা গ্রহণ করা।"

"না মা, এ-সব এখন থাক্," বলে আমি টাকা বার করলাম।

"তোমার টাকা আমি ছোঁব না, বলছি।"

"আমার কোথায়? আপনার ছেলের···। বলুন, আপনি না নিলে আপনার ছেলের কথা কি করে রাখব?"

"তুমি তো গোঁ ধবে বসলে।"

"আমি, না আপনি?"

"আগে খেয়ে নাও, তাবপব কথা হবে।"

যত্ন করে উনি রেঁধে খাওয়ালেন। তাতে বেশ খানিকটা সময় গেল। উনি তো খুশি হলেন। তারপব উনি খেয়েছেন, কি না খেয়েছেন, না জেনেই বলে বসলাম, "এবার বলুন?"

"দেখ বাবা, তুমি আমি আব জগতে যত প্রাণী আছে কেউই চিবদিন থাকবে না। তবে মনুষ্যজন্ম এর ব্যতিক্রম। তোমার বাবা ছিলেন আবার তাঁবও বাবা ছিলেন, তোমার পর তোমার সন্তানদেবও সন্তান হবে। এইভাবে মনুষ্যজাতি বেড়েই চলেছে। একদিন আমিও থাকব না, তুমিও থাকবে না, তবে আমাদের আদর্শ কিন্তু থেকে যাবে। আমবা কেউই চিরকাল থাকব না, কিন্তু আমাদেব বিশ্বাস, নিষ্ঠা, এ-সব কখনো হারাবে না। বেনকাইয়া আমাদের কুলদেবতা। তাঁর উপর সকলের শ্রদ্ধা আছে। যশবন্তের বাপ-ঠাকুরদারও শ্রদ্ধা ছিল। ওদের ঘববাড়ি সব ধ্বংস হয়ে গেলে কি হবে, কুল তো আছে? ওদের কুলদেবতা বেনকাইয়া। ওঁকে ভুলে যাওয়া অনুচিত।"

এভাবে ঘুরিযে-ফিরিয়ে উনি আসলে কি বলতে চান তা আমি বুঝে নিলাম। আমার আর বেশি ভাববার দরকার হয় নি।

তখনই ঠিক করে নিলাম যে আমার বন্ধুর স্মৃতিরক্ষা, ও তাঁকে যিনি মানুষ করেছিলেন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করাই আমার সবচেয়ে বড় কর্তব্য। বললাম, "মা, আপনার আর-কিছু বলবার দরকার নেই। আপনার যা ইচ্ছা তা বুঝেছি। আপনার যশবন্তের টাকা আপনারই পঁচিশ টাকার কথা এখন ছেড়ে দিচ্ছি। কত টাকা লাগবে তার হিসাব এখন করছি না। আপনার ছেলের নামে বেনকাইয়ার মন্দিরটা যদি মেরামত করে দেওয়া যায় তাতে রাজী?"

এ কথা শুনে উনি চুপ করে রইলেন। মনে হ'ল যেন আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। তাই ভরসা দিয়ে বললাম, "যতদিন এ-সবের একটা ব্যবস্থা না করতে পারছি, ততদিন আমি এ গাঁ ছেড়ে যাব না। ততদিন রোজ আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনার আর কোনো ভাবনা নেই। আপনার ছেলের দৌলতে বেনকাইয়ার মন্দির আবার আগের মতো হয়ে যাবে। এবার আপনি খেতে বসুন।"

"আজ খাব কি করে, বাবা? বরং ভগবানের কাছে ছেলের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করব।" এই বলে উনি ভেতরে চলে গেলেন। আমিও শঙ্কর হেগ্‌গড়ের বাড়ির রাস্তা ধরলাম। আমার মনশ্চক্ষে দুটি জীর্ণ মন্দির ভেসে উঠল, একটি পাথরের তৈরি বেনকাইয়ার, আর অপরটি রক্তমাংসে তৈরি জীর্ণ মন্দির, যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী পার্বতাম্মা। এ-সব ভেবে মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠল। হঠাৎ যশবন্তবাবুর একটা ছবির কথা মনে পড়ে গেল। যখন প্রথমবার ও ছবিটা দেখেছিলাম তখন মনে কোনো বিশেষ ভাবের উদয় হয় নি। মনে করেছিলাম ওটা বোধহয় খাণ্ডালারই একটা দৃশ্য। ছবিটা নিতান্ত সাধারণ। একটা শীর্ণ গোরু মাঠে দাঁড়িয়ে। ওর কাছেই একটা বাছুর, সেটাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, ওটা ওর নিজের নয়। ওটা ছিল মোষের বাছুর, গোরুটার দুধ খাচ্ছিল। গোরুটা বাছুরটার গা চাটছিল। বাছুরটা কালো বলে আমি ভেবেছিলাম ওটা গোরু নয় মোষ। একটু আগেই পার্বতাম্মাকে দেখেছি,

সে কথা মনে আসতেই আমার কল্পনার মোড় ঘুরে গেল। এ ছবিটা নিশ্চয় যশবন্তবাবুর নিজের কাহিনী। পার্বতাম্মাই হচ্ছেন গোরু আর বাছুরটা যশবন্তবাবু। ভাবলাম, যশবন্তবাবু অন্যের সন্তান হলেও পার্বতাম্মা ওঁকে নিজের ছেলেরও বাড়া স্নেহ করেছেন। তারই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ এ ছবিটা। আমার ধারণা ঠিক, না ভুল জানি না, কিন্তু আমার যেন ঠিক বলেই মনে হ'ল। চিড়িয়াখানায় অনেক সময় দেখা গেছে কুকুর বাঘের ছানাকে দুধ খাইয়ে মানুষ করেছে। নারীজাতির বাৎসল্য একটা অদ্ভুত ব্যাপার, তার প্রকাশ না হ'লে নারীজীবন বৃথা। অভাগিনী, সন্তানহীনা পার্বতাম্মা। যশবন্তবাবুর মা যখন বেঁচেছিলেন উনি বেশির ভাগ অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতেন। পার্বতাম্মা তখন থেকেই ওঁর মার স্থান নিয়েছিলেন। আসল মা উনিই ছিলেন। এ কথা যশবন্তবাবু কখনো ভুলতে পারেন নি। স্বার্থান্ধ হলে ভুলেই যেতেন। কিন্তু ভোলেন নি। এখানেই ওঁর উদারতার পরিচয়।

গাঁয়ে ফিরে যশবন্তবাবুর ঐ ছবিটা বারকয়েক নিরীক্ষণ করলে বুঝতে পারব উনি কত উদার ছিলেন। তাঁর সে উদারতার ছোঁয়াচ আমার মনেও ক্ষণিকের জন্য লাগল। তাই যে স্ত্রী-পুত্ররা তাঁকে অত কষ্ট দিয়েছিল তাদের প্রতিও আমার মনোভাব উদার হয়ে উঠল। আগে আমি শুধু যশবন্তবাবুর দিকটাই দেখেছিলাম, এখন মনে হ'ল ওঁদের তরফ থেকেও তো কিছু বলবার আছে নিশ্চয়। সেটা কি করে জানা যায়? প্রথমে যা জানতে চেয়েছিলাম তার সমাধান পার্বতাম্মা করে দিয়েছেন। কুমটার আত্মীয়-স্বজনের বিষয় উনি শঙ্কর হেগ্‌ড়ের থেকে বেশি জানেন। আমি নিজেও মনে করেছিলাম যশবন্তবাবুর স্ত্রীর নাম জলজা'ই হবে নিশ্চয়। পার্বতাম্মা সব পরিষ্কার করে দিলেন। জলজা মানে কমলা। মানেই যশবন্ত-বাবুর স্ত্রী।

ছয়

পার্বত্তাম্মার সঙ্গে ঘণ্টা ছুয়েক কথা বলে আমি গাঁয়ে ফিরে যাব এই ঠিক করেছিলাম, কিন্তু সে জায়গায় আমায় তিনদিন ধরে বেনকনহল্লিতে থাকতে হ'ল। তাতে অবশ্য লাভ বই লোকসান হয় নি। মানুষের স্বভাবের পরিচয় কাছে থেকে ভালো পাওয়া গেল। এটা বেশ ভালো সুযোগ, তবে তার মানে এ নয় যে প্রত্যেকের স্বভাব ভালো। শঙ্কর হেগ্‌গড়ের বাড়ি ফেরার পথে ওঁকে দেরি হবার কি কৈফিয়ত দেব ভাবতে লাগলাম। "এতক্ষণ ধরে কী কথা হচ্ছিল ?"— ওঁর এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিয়ে ওঁকে শান্ত করতে হবে। প্রথমত তো ফিরতে দেরি হল, তা ছাড়া ভোজনও সারা। তার কি ক্ষমা আছে ? ওখানে যখন যশবন্ত-বাবুর মারা যাবার খবর দিয়ে এসেছি, এখানেও সে খবরটা প্রকাশ করতে হবে। সেইজন্য খুব সতর্ক হয়ে ওঁর প্রশ্নের জবাব দিলাম। "কিছু বিশেষ কথা তো ছিল না, তবে ঠাকুরমাকে দেখে খুব শ্রদ্ধা হ'ল, যেন উনি আমার বড়ো বোন। ওঁর সাঙ্গে অনেক কথা হ'ল। যশবন্তবাবুর ছেলেবেলার কথা জানবার খুব ইচ্ছে ছিল, ওঁকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলাম। তাই দেরি হ'ল। উনি প্রবীণা, একটা কথার উত্তরে দশটা কথা বলেন। কোনো কথাবার্তায় রুচি হলে আমিও মুখর হয়ে উঠি।"

"হুঁ ! উনি সব জানেন," শঙ্কর হেগ্‌গড়ে বললেন। "তার মানে, যশবন্তকে উনিই মানুষ করেছিলেন, তাই। সম্পর্কে আমরা ভাই, কিন্তু আমাদের বাবাদের মধ্যে ঝগড়া ছিল। কেউ কাউকে দেখতে পারতেন না।"

"আপনার দিদি এ কথা আমায় বলেছেন।"

হেগ্‌গড়ে মশাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন যশবন্ত কেমন আছে ? কোথায় থাকে ? ভালো আছে তো ? ওর স্বাস্থ্য কেমন ? বাড়ি ছেড়ে যাবার পর চাকরি করে কিছু বাঁচিয়েছে ?"

"টাকার লোভ তো ওঁর ছিল না।"

"তাই তো সব নষ্ট করে ফেলল। কিছু থাকলে কি ওকে এখান থেকে চলে যেতে হ'ত? যাক্ ও-সব কথা। ওর শরীর ভালো আছে তো?"

"এখন তিনি ভালোমন্দের বাইরে চলে গেছেন।"

"মানে?"

"উনি আর নেই।"

"কী? যশবন্ত মারা গেছে? কাল তো আপনি কিছু বলেন নি, জিজ্ঞাসা করবার পরও?"

"সেটা কি দেবার মতো কোনো সুসংবাদ?"

"তা হলে তো আমাদের অশৌচ, না? ও যখন মারা গেছে। কোথায় কী করে মারা গেল সে?" দেখে মনে হ'ল না যে পূর্বপুরুষ-দের প্রতি কোনো বিদ্বেষভাব এখন পোষণ করছেন। উনি উঠে তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে, 'অক্ক', 'অক্ক' (বড় বোন) বলে ডাকতে লাগলেন। বেশ উচ্চস্বরে বললেন, "আমাদের যশবন্ত মারা গেছে।"

আমি বসে বসে সব শুনছিলাম। অনেকক্ষণ উনি ভিতরেই রইলেন। পরে বড় বোন মুঙ্গকাবার সঙ্গে এসে আমার কাছে বসলেন। মুঙ্গকাবিকা বললেন, "খারাপ খবরটা কাল হঠাৎ দিতে পারেন নি। কাল আপনাকে যে-সব কথা শুনিয়েছি, তা শুনে আপনার খুব দুঃখ হয়েছে নিশ্চয়। আমরা হলাম আত্মীয় আর আপনি হলেন বন্ধু। আমাদের মধ্যে শুধু এই তফাত। পার্বতীকে এ খবর দিয়েছেন কি? না দিলেই ছিল ভালো। ওরই পালিত পুত্র তো?"

"না শুনিয়ে কি আর উপায় ছিল? যাঁকে শোনানো দরকার, তাঁকে তো শোনাতেই হবে।"

"বলে দিয়েছ? একি করলে? আমি জানি, ও তা হলে আর বাঁচবে না," বলতে বলতেই উঠে বেরিয়ে গেলেন। ওঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

"কোথায় যাচ্ছ?" বলে ওঁর ছোট ভাইও উঠে পড়লেন। দিদি বললেন, "তুমি এতটুকুও বোঝ না? এ সময় ওকে সান্ত্বনা দেবার আর কে আছে? আজ পর্যন্ত বাবার দিব্যি মেনে এসেছি, আর আমি আমার পাপের বোঝা বাড়াতে চাই না, ঢের হয়েছে।" বলে উনি বেরিয়ে গেলেন। আর কোনো পথ না দেখে ওঁর ছোট ভাই ওঁকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে এলেন। সে রাত্রে উনি আর ফিরলেন না। আমি ঘরে বসেই ওঁদের ওখানে কি হচ্ছে সব বুঝতে পারছিলাম।

শম্ভু ওর পিসিমা ও বাবা চলে যাবার পরও লজ্জায় বাইরে এল না দেখে আমিই ওকে ডাকলাম। ওর স্ত্রীই ঠেলেঠুলে পাঠাল বোধহয়। বললাম, "আসুন, ভালো লাগছে না আর। একটু বেনকাইয়ার মন্দির পর্যন্ত ঘুরে আসা যাক।"

"আমাদের তো অশৌচ।"

"অশৌচ আপনার হয়েছে, আমার তো নয়। আপনি দূরে দাঁড়িয়ে থাকবেন।" বলে ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যে রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম সেই রাস্তা ধরেই গেলাম। শম্ভু মাথা হেঁট করে অসহায় ভাবে আমার পেছনে আসছিল। সারাদিনের কড়া রোদে রাস্তাটা শুকিয়ে গেছে। আমরা এগুতে লাগলাম। মন্দিরের কাছে এলে ও একটু দূরে দাঁড়াল। আমি মন্দির পরিক্রমা করে ফিরলাম। উঁকি মেরে ভেতরটা দেখলাম। মন্দিরের সামনের চাতালে বেশ অনেকখানি গোবর পড়ে ছিল। বেনকাইয়ার মন্দিরের এ হেন দশা দেখে সকলেরই কষ্ট হ'ত, পার্বতাম্মার তো কথাই নেই। এ মন্দিরটাকে ভেঙেচুরে নবকলেবর দিতে গেলে দু-তিন হাজার টাকার বেশি লাগতে পারে না। এ কাজ তো করতেই হবে, আমার জন্য বা আমার বন্ধুর জন্য নয়, শুধু পার্বতাম্মার আত্মতৃপ্তির জন্য। মন্দির সংস্কার হয়ে গেছে দেখে যেতে পারলে ওঁর আত্মার তৃপ্তি হবে—যেন যশবন্তবাবু নিজে মায়ের শ্রাদ্ধ করলেন।

ওখান থেকে ফিরে শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের গাঁয়ে

তো এই একটাই মন্দির আছে, এখানে আট-দশ-ঘর ব্রাহ্মণও কি নেই? বছরে অন্তত একবারও তো আপনারা এই মন্দিরে আসেন?"

"কেন বলুন তো? বেনকাইয়া আমাদেব কুলদেবতা, তাঁর মন্দিরে না এসে আমাদের চলবে কি করে?"

"তার মানে আপনাদের কুল গোকুল?"

"মানে?"

"কত গোবর পড়ে আছে ওখানে, দেখলেন না? মন্দিবটার কি অবস্থা হয়েছে বলুন তো?"

"কি করা যায়? সবকার তো কোনো সাহায্য করেন না। আর গাঁয়ের লোকেরা নিজে থেকে কিছু করতে চায় না। আমাদের কি সাধ্য যে ওটাকে মেরামত করি?"

আমি কিছু না বলে শুধু ওব দিকে চেয়ে রইলাম। তাতে ওর অস্বস্তি বেড়েই চলল—শেষে মিনতি করে বলল, "আপনি সে সম্বন্ধে আমার বাবাকে কিছু বলেন নি তো?"

"আমি তো কথা দিয়েছি বলব না, তবে? কিন্তু আপনি পার্বতাম্মাব টাকা মেবেছেন এতে মঙ্গল হবে না! এ মন্দিরটার সংস্কার হলে ওর তৃপ্তি হবে। পিয়ন যে টাকা মেবেছে সে কথা ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু আপনি যত টাকা নিয়েছেন পুরো হিসাব করে আমায় দিয়ে দিন। নইলে আপনারও ভালো হবে না আর আপনার সন্তানদেরও মঙ্গল হবে না।"

"তাই দেব।"

"এতে আপনারই কল্যাণ। মন্দিরও তো বড় নয়। আপনার গাঁয়েব লোকেরা সাহায্য না করলেও এ কাজটা হয়ে যেতে পারে। আপনার কাকা যশবন্তবাবুর কিছু টাকা আমার কাছে আছে। তাতেও না কুলোলে বাকীটা আমি দেব। আপনি ও আপনার বাবা মিলে একবছরের মধ্যে মন্দিরের ভোল বদলে দিন। গণেশ চতুর্থীর এখনো দশমাস বাকী। তার মধ্যে মন্দির সংস্কার হয়ে যাওয়া চাই।

পূজা ও ভোজের ব্যাপারে পার্বতাম্মার মত নিতে হবে।" এ বিষয়ে অনেক কথা ওর সঙ্গে হ'ল। ওর মনটাও কিছু হাল্কা হ'ল। সেও বোধহয় ভাবল, তার পাপের প্রায়শ্চিত্তের এটাই একটা সুযোগ। তারপর বাড়ি ফিরে শঙ্কর হেগ্‌গড়ের সঙ্গেও এই আলোচনা চলতে লাগল। মনে হল তার নিজের টাকায় হাত দেবার ইচ্ছা নেই, তবে এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন, বললেন, "কাল আপনি থাকছেন তো? তা হলে গাঁয়ের লোকেদের আর নীচের বাড়ির লোকেদেরও ডেকে পাঠাব। আপনার উপস্থিতিতেই সব ঠিক করে নেওয়া যাবে।"

"লোকে আসুক্ বা না আসুক, এ কাজের সব ভার কিন্তু আপনার উপর রইল। খরচে না কুলোলে সেটা আমি দেব।"

"আচ্ছা তাই হবে", উনি তাড়াতাড়ি বললেন। আমি বিদেশী মানুষ, তাঁদের অপরিচিত। মন্দির হয়ে যাবার পর যদি কথার খেলাপ করে টাকা না দিই, এ সন্দেহ তার মনে উঠতেই পারে। তাই বললাম, "গাঁয়ে ফিরেই আপনার নামে শ-তিনেক টাকা পাঠিয়ে দেব।"

সেদিন রাতে আমাদের মধ্যে আগেকার অনেক ঘটনার অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনা হতে লাগল। তাঁর দিদির পার্বতাম্মার বাড়ি যাওয়াটা তাঁর কাছে উচিত মনে হয় নি। পূর্বপুরুষদের আদেশ অমান্য করা উচিত বা অনুচিত এ নিয়ে ওর মনে দ্বন্দ্ব ছিল। ভরসা দিয়ে বললাম, "পূর্বপুরুষদের তৈরি নিয়মকানুন আমাদের বাছবিচার করেই গ্রহণ করতে হবে। স্রেফ আদেশ পালন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ছেলেদের পাপ কাজ অনুমোদন করে ধৃতরাষ্ট্রের কি অবস্থা হয়েছিল? উনি তো তাঁদের গুরুজন ছিলেন। এরকম দিব্যি গিলতে আমি অনেক লোককেই দেখেছি। ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ করতেও কেউ কেউ ছাড়ে নি। কিন্তু অমঙ্গলকর শপথে ভগবান খুশি হন না। আর যদি তাতেই ভগবান খুশি হন তা হলে তেমন ভগবান নাই-বা থাকলেন?"

সে রাত আমার বেশ শান্তিতে কাটল। আমি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম। স্বপ্নে পার্বতী ও মুক্তাবিকার কথোপকথন শুনছিলাম।

পরদিন স্নানান্তে জল খেয়ে, শঙ্কর হেগ্‌গড়েকে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সঙ্গে নিয়ে, নীচের চোচ্চলদের বাড়ির রাম হেগ্‌গড়ের কাছে গেলাম। শঙ্কর হেগ্‌গড়ে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। কথা-বার্তায় যশবন্তবাবুর প্রসঙ্গও উঠল। পার্বতাম্মার কথা তো হ'লই। রাম হেগ্‌গড়েও আমার বন্ধুর দোষগুণের বর্ণনা দিলেন—

"ছোটবেলায় আমি যশবন্ত হেগ্‌গড়েকে দেখেছিলাম। আমরা দুজনে প্রায় সমবয়সী ছিলাম। আমার বাবাই তো ওকে ধার দিয়েছিলেন। সেই ধার শোধ হিসাবে আমি এ বাড়ি অধিকার করেছি। আমাদের আগের বাড়ি নীচে ছিল। শুনেছি উনি আমার বাবার কাছে প্রায় ধার চেয়ে বসতেন, আর আমার বাবাও তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিতেন। তখন ওঁর উঠতি যৌবন, অবাঞ্ছনীয় লোকের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। তাদের নিয়েই মেতে থাকতেন আর টাকাকড়ি সব ওদের বিলিয়ে দিতেন। আমাদের গাঁয়ের কয়েকজন ছেলে তো ওঁর টাকাযই মানুষ। আমার বাবা ওঁকে অনেক বোঝাতেন, 'এভাবে টাকা খরচ কোরো না বাবা।' বাবার পরামর্শে চললে ওঁর হাতে কিছু জমতো। তখন গাঁয়ে আমার বাবা ছাড়া আর কেউ ধনী ছিল না। এ জায়গাটা নেবার লোভ নিশ্চয় আমার বাবার মনে আগেই জেগেছিল। তাই নির্বিচারে তাঁকে টাকা ধার দিয়ে গেছেন। অর্থম্ অনর্থম্। যশবন্ত বিনা সুদে টাকা ধার নিতেন না, কিন্তু অন্যকে বিনা সুদে টাকা ধার দিতেন। 'তুমি তো ভাই দাতাকর্ণ, তুমি যে দধীচি,' এ শুনলে আর হিতাহিত জ্ঞান থাকত না। তবে আর যাই বলুন লোকটি ছিলেন ভালো, মন্দ নয়। না শঙ্করবাবু?"

"তা বটে। যাক্ এখন কাজের কথা হোক্। ইনি বলছেন, এঁর কাছে যশবন্তের কিছু টাকা আছে, তা ছাড়া আরো কিছু দিয়ে ইনি বেনকাইয়ার মন্দিরের সংস্কার করতে চাইছেন।"

শুনতেই আহ্লাদে রাম হেগ্‌গড়ের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঘাড় নেড়ে বললেন, "ঠিক বলেছেন, শুধু এ কাজটাই তো বাকী রয়ে গেছে। অনেক আগেই ওটা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তবে হ্যাঁ, এ কাজে যদি হাত লাগানো যায় তবে সুষ্ঠুভাবেই কাজটা সম্পন্ন হওয়া দরকার। তাতে পাঁচ হাজারের জায়গায় দশ হাজারই লাগুক-না কেন। কাজটা ঠিক হওয়া চাই।"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "এত ছোট মন্দিরের জন্য পাঁচ-দশ হাজার লাগবে, কী বলছেন?"

"কেন? ইদানীং সব জিনিষই কত আক্রা হয়ে গেছে। যখন কাজটা করা হচ্ছে তখন ভালোভাবেই হোক্‌-না। যথেষ্ট টাকা হলে তামার চুড়ো করা যেতে পারে, যাতে তিন মাস যেতে না যেতেই আবার মেরামত না করতে হয়।"

"আপনারা সবাই যদি মুক্ত হস্তে চাঁদা দিয়ে এ কাজটা উদ্ধার করেন তা হলে তো সকলের পক্ষেই ভালো। যশবন্তবাবুর ভাগের চাঁদাটা আমি দেব।"

আমার এ কথা শোনার পরই রাম হেগ্‌গড়ের যেন শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল! একেবারে প্রসঙ্গ পাল্টে দিয়ে শঙ্কর হেগ্‌গড়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সিরসির মুনসেফ আদালতে নিম্ম হেগ্‌গড়ের যে মোকদ্দমাটা চলছিল তার কি হল?" আমি বুঝলাম এবার আমার ওঠা উচিত। সেখান থেকে সোজা পার্বতাম্মার বাড়ি গেলাম। ওখানে দেখলাম দুই বৃদ্ধা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে কথাবার্তায় মশগুল। ওদের কাছে বেনকাইয়ার মন্দিরের কথা তোলাতে ওঁরা বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। পার্বতাম্মা বললেন, "বাবা, তুমি এ কাজ করে গেলে রোজ সকালে বেনকাইয়ার মন্দিরে পূজা দেব, আর শান্তিতে মরতে পারব।"

মুঙ্গকাওয়া বললেন, "আমরা দুজনেই।"

"বেনকাইয়াই সব করবেন। ভাববার কিছু নেই," বলে আমি ওঁদের আশ্বাস দিলাম।

"বেনকাইয়ার প্রেরণাতেই তো তুমি এখানে এলে, না? আমার ছেলের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে। তাই আমার মুঙ্গকাওয়াও সব বাঁধন ছিঁড়ে চলে এসেছে আমার কাছে। আমি খুব খুশি হয়েছি। যশবন্তকে হারিয়ে আমি একে পেলাম, না?" কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে বললেন, "ওঁর কথা মনে পড়লে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু যে চলে গেছে তার জন্য কষ্ট পাওয়া অর্থহীন। তোমাকে এ শিক্ষা দিয়ে আমি নিজেই কাঁদতে বসব, সেটা কি ঠিক? মৃত্যুশয্যায়ও যশবন্ত আমায় ভোলে নি। এখন আমিও আছি আব মুঙ্গকাওয়াও রয়েছে। কিন্তু আমাদেব দেখা-সাক্ষাৎ না হয়ে কতদিন কেটে গেছে। এর আগে তো সে কখনো আসে নি? আজ এসেছে। বাল্যকালেব টান কি কখনো যায়?" তারপর ওঁরা দুজনেই মা-হাবা যশবন্তবাবুর ছেলেবেলাব কত গল্পই না শোনালেন। ওঁর বাবা ভগবন্তের দ্বিতীয় বিয়ের কথা, এ পক্ষেব স্ত্রীর কোনো সন্তান না হওযা. সৎমার সৎছেলেব উপর আক্রোশ, দুর্ব্যবহার, গালাগালি ইত্যাদি। বালক যশবন্তকে সুখী কববার জন্য পার্বতাম্মা কত কষ্ট পেযেছেন, সব বললেন।

তাবপর একসময় বালক যশবন্তেব কোনো কথা মনে পড়তেই পার্বতাম্মা হাসতে হাসতে বললেন, "ছোটবেলার খেলাধুলা কত সুমধুব, সব ছেলে-মেয়েরই খেলা দেখতে কার না ভালো লাগে? সে নিজের হোক্ বা পরেব। তারা যে কত সবল। যশবন্তের মা সর্বদাই অসুস্থ থাকত। তাই আমাকেই ওর সব কাজ করতে হত। কোলে তুলে চুমু খেয়ে, ওর সঙ্গে খেলা কবতাম। ওকে খাওয়ানো, শোওয়ানো, গল্প শোনানো আমারই কাজ ছিল। তা ছাড়া বাড়ির সব কাজও আমিই কবতাম। তখন আমাব স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল। বাড়িতে বেশি লোকও ছিল না। আমি তো বালবিধবা—যশবন্ত যখন তিনবছবেব শিশু, আমায় জিজ্ঞাসা করত, 'পারোমা, বাবা তোমায় ভালো শাড়ী দেয় না কেন? তুমি সর্বদা সাদা শাড়ী পরে থাকো, তার না আছে পাড়, না আছে আঁচলা। গয়নাও পরো না' আমার মার তো অনেক শাড়ী গয়না আছে।'

আমি হেসে বলতাম, 'তোমার বাবা ওকে বিয়ে করে এনেছেন। মা তোমার অনেক সোনার গয়না পরে এখানে এসেছিল। তোমার জন্মের পর থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই শুয়ে থাকে…।'

'জন্ম মানে কি?' জিজ্ঞাসা করাতে আমি হাসি চাপতে পারলাম না।

'আমি জানি, পরশু আমাদের গাই-এর একটা কালো বাছুর হয়েছে, না? ঠিক ওইরকম. .।'

'হ্যাঁ বাবা।'

'তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছ, না?'

'না বাবা, তোমার মা। যখন থেকে তুমি জন্মেছ, ওর অসুখ হয়েছে, বেচারা! তুমি ওকে কষ্ট দিয়ো না। ওর কাছে গিয়ে জেদ ধরো না।'

'আচ্ছা তাই করব। কিন্তু বাবা তোমায় ভালো শাড়ী, চুড়ী, গয়না কেন দেয় না? তুমি তো কত কাজ কর।'

'আমার কাছে অনেক গয়না আছে, তাই বাবা আর দেন না।'

'কোথায় আছে বলো?'

'আছে তুমি জানো না, আমি জানি।'

'মিথ্যে কথা।'

'না যশু', বলে ওকে কোলে তুলে চুমু খেয়ে বলতাম, 'এই তো আমার সোনা।' শুনে ও যে কি খুশি হত, তা আর কি বলব।

"ও বড় হবার পর ওর মা আর বেশিদিন বাঁচে নি। ওর বাবা খুব শিগ্‌গীর আবার বিয়ে করল। প্রথম যখন এই বউ শ্বশুরবাড়ি এল তাকে দেখে মন্দ লাগল না। কিন্তু যশুকে সর্বদাই আমার কাছে থাকতে দেখে বিরক্ত হত। যশুকে ও দেখতে পারত না। একদিন কথায় কথায় বলে ফেলল, 'এই ভাতারখাকীটা এখানে এসেই আমার বাড়ী ছারখার করে দিয়েছে।' এ-সব আমি নিজের কানে শুনেছি। তখন আমাকে খেতে পরতে দেবার আর কেউ ছিল না। তবুও আমি অভিমান করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম!

বেনকাইয়ার মন্দিরে গেলাম। ছেলেটা তখন কোথায় ছিল জানি না। আমাকে দেখতে না পেয়ে চেঁচামেচি করতে লাগল। ওকে তো নিজের কাছে তার রাখা উচিত ছিল? কিন্তু সেও তো দুচক্ষের বিষ। মন্দিরের কাছে এসে 'পারুম্মা, পারুম্মা.' বলে চাৎকার করে ডাকতে লাগল ছেলেটা। ওর ডাক শুনেই আমি ছুটে ওর কাছে এলাম, ওকে কোলে করে মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়লাম। 'তোমার সৎমা বলেছে, ওর হার নাকি আমি চুরি করেছি তাই দুঃখ ভুলতে এখানে এসেছি। এখন বনে হোক্ পাহাড়ে হোক্ যেখানে দু-চক্ষু যায় সেখানেই গিয়ে মরব আমি।' এ কথা শুনে ওর অবস্থাটা কিরকম হবে ভুলে গেলাম। সে আমায় মারধর করতে লাগল, বেনকাইয়ার মন্দিরের সামনে গড়াগড়ি খেয়ে কাঁদতে লাগল। ওকে এভাবে কাঁদতে দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না। ঠিক করেছিলাম, ও-বাড়িতে আর পা দেব না কিন্তু তার জন্য শেষে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল সেদিন। ওকে খুশি করতে হবে তো।

"আমরা বোধহয় বেশ জোরে জোরে কথা বলছিলাম। মুঙ্গাবিকা তখন গোরু চরাচ্ছিল। আমাদের কথা শুনে সেও আমাদের কাছে চলে এল। ওকে আমি সব বললাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা সবাই ওখানেই ছিলাম। এমন সময় ভগবন্তের জুতার আওয়াজ শোনা গেল, সে স্বাদী থেকে ফেরবার পথে নিয়মানুযায়ী মন্দিরের সামনে প্রণাম করতে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের সে দেখতেও পায় নি। মঞ্জু 'বাবা', বলে চেঁচিয়ে উঠল। 'পারুম্মা বলছে মরে যাবে, পালিয়ে যাবে। ছোটমাকে তুমি মারবে তো?' আমি তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিলাম। মুঙ্গাবিকাকে উনি খুব বিশ্বাস করতেন। সেই সব কথা ওঁকে শোনাল। সব শুনে উনি আমায় আদর করে বললেন. 'পারু, ও আমার স্ত্রী তা ঠিক। কিন্তু বাড়ির কর্তা তো আমিই, না? চলো, বাড়ি চলো।' বলে আমাদের বাড়ি নিয়ে গেলেন। তারপর স্ত্রীকে ডেকে বকলেন, 'দেখো,

ছেলের মা মারা যাবার পর, এই ওর মার জায়গায় ওকে দেখাশুনা করেছে। তখন আর-কেউ আসে নি এ-বাড়ি সামলাতে। যা করেছ করেছ, আবার যদি এরকম কিছু শুনতে পাই তা হলে এ-বাড়ি থেকে কাকে বেরুতে হবে তা বলা বাহুল্য।'

"তারপর থেকে সে তার রাগ ঈর্ষা চেপে রাখার চেষ্টা করত। আমায় আর কিছু বলত না, তবে যাঁরা এ-বাড়ি আসতেন, তাঁদের উপর সব ঝাল ঝাড়ত। যশু বড় হয়ে যখন সব বুঝতে শিখল, তখন আর ওকে গ্রাহ্যই করত না। ওর রাগ দেখে বরং আমিই ওকে সামলাতাম। তখন ওকে বলতাম, 'আর যা হোক, উনি তোমার ছোটমা, এরকম করলে তোমার বাবা দুঃখ পাবেন।' কিন্তু ওর বাবা যশুকে সত্যিই ভালোবাসতেন। খোকাবাবুও তো আর যে-সে নয়। ওকে না ভালোবেসে উনি কি করে বাঁচবেন?"

ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িত পার্বতাম্মার নানান রূপ আমার স্মৃতিপটে এভাবে অঙ্কিত আছে যেন আমি স্বচক্ষে সেই-সব দেখেছি। সে-সব ঘটনা শুনে আমি খুব মুগ্ধ হলাম। যশবন্তবাবু তাঁর স্নেহ-ভালোবাসার ছায়ায় মানুষের মতো মানুষ হতে পেরেছিলেন, তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। মনে হল যশবন্তবাবুর বাল্যকাল অতি কষ্টে কেটেছে। জীবনে যে নিজে কষ্ট পেয়েছে, অন্যের কষ্ট সেই সহজে বুঝতে পারে। তাই প্রৌঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গে খুব উদার হয়ে উঠেছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তি পাবার পর ওঁর হাত আরো খুলে গিয়েছিল। যে মুক্তহস্তে দান করে তাকে সবাই প্রতারণা করার চেষ্টা করে। তাই বোধহয় অনেকে তাঁর দয়ার উদ্রেক করে নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধি করেছেন আর ওঁকে দু-হাতে লুটেছেন। রাম হেগড়ের বাবাও নিশ্চয় তাঁদের মধ্যে একজন হবেন। তবে এরকম লোক সব জায়গায় সব সময়েই থাকে। যে দিয়েই যাচ্ছে পাত্র-অপাত্রের বিচার না ক'রে, তাকে লুটবার লোকের অভাব নেই।

পাত্র-অপাত্রের বিষয় যশবন্তবাবুর বিচার-বিবেচনা কিরকম ছিল সে তো আগেই বলা হয়েছে। এ নিয়ে বার বার ওঁর মনে সংঘর্ষ

হয়েছে। যখন উনি কারুর অযোগ্যতার বিষয় নিঃসন্দেহ হতেন, তখনো ওঁর মনে হত, 'অযোগ্য সে, না আমি?' সূক্ষ্মদর্শী লোক নিজের দোষ খুঁজতেই ব্যস্ত, তাই তাঁদের জীবনে শান্তি নেই, মনে সর্বদাই কাঁটা খচখচ করে।

বেনকনহল্লিতে আমি তিন দিন ছিলাম। এই তিন দিনে আমি সারা গাঁ ঘুরে দেখলাম। শঙ্কর হেগ্‌গড়ের থেকে কেমন করে কাজ নেব সে-সব ঠিক করলাম। বেনকাইয়ার মন্দিরটা ভালো করে দেখলাম আর পার্বতাম্মা ও মুঙ্গাবিকার বিগত জীবনের কত কাহিনী শুনলাম। বাড়ি ফেরার আগে পার্বতাম্মার কাছে গিয়ে বললাম, "মা, আসছে মাস থেকে তো দশটাকা করে পাঠাব, কিন্তু আগের তিন মাসের এ টাকাটা রাখুন।" বলে ওঁকে টাকা দিলাম।

"এত টাকা আমি কোথায় রাখব? রামের কাছে রাখতে দাও।"

"রামের কাছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি হয়েছে তাতে? ও তো আমার প্রতিবেশী। আমার যা দরকার ওই তো এনে দেয়।"

"তা তো ঠিক। তবুও···।"

তখন আমার কথা বুঝতে পেরে বললেন, "রাম যদি টাকা মেরে দেয় তাই বলছ তো? মারলেই বা কি? সেও তো আমার ছেলের মতো। এখানে আর আমার কে আছে? তা ছাড়া টাকা তো খরচ করার জন্য, না? তা যেই খরচ করুক।"

আমি হেসে বললাম, "তা হলে মা আমিই সব নিয়ে নি? টাকা হজম করতে আমিও ওস্তাদ। হাজার টাকাও একদিনে খরচ করে ফেলতে পারি।" শুনে উনি খুব হাসলেন। তারপর বললেন, "সেই মতলব যদি হত তো এখানে আসতে কেন? তুমিও ঠিক যশবন্তের মতো। দেখ বাবা, টাকাকড়ি নিয়ে এমন কথা বলতে নেই। টাকা হচ্ছে লক্ষ্মী। দেবী লক্ষ্মীর উপর টান না থাকাতে আমার বাছাকে এত কষ্ট পেতে হয়েছে।"

আমি আবার হেসে বললাম, "ঠাকুরমা, আপনি তো একেবারে বেদান্তী হয়ে উঠেছেন। আপনিই যখন বলছেন, 'টাকা পরমাত্মা, টাকা লক্ষ্মী', তখন সাধারণ লোকেরা তা কেন বলবে না?"

"না বাবা, টাকা সত্যিই লক্ষ্মী। লক্ষ্মীদেবী। টাকাতে ভালো মন্দ দুইই হয়। ভর্তৃহরি না কোন্ একজন ঋষি বলেছেন না, 'যে ধন দানে বা ভোগে লাগে না, তা মানুষকে নষ্ট করে। লক্ষ্মী ভালো থাকলেই দেবী, নিজের সীমার ভেতরেই দেবী, তার বাইরে গেলেই রাক্ষুসী।"

ওঁর কথাগুলি বেশ মনঃপূত হ'ল। "আসছে বছর আসব" বলে আমি শঙ্কর হেগ্ গড়ের বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। তার পরদিন শম্ভু স্বাদী পর্যন্ত আমার সঙ্গে এল। সেদিনই আমি সিরসিতে আমার একজন বন্ধুর বাড়ি পৌঁছলাম। ভাবলাম একেবারে সোজা বাড়ি ফিরে যাই, না বন্ধুর গ্রাম কুমটা হয়েই ফিরি। শেষে ঠিক করলাম এক যাত্রায় সব করা ঠিক হবে না, বরঞ্চ আগে নিজের বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভালো।

গাঁয়ে ফিরলাম।

সাত

আমি না মহমুদ গজনীর মতো মূর্তি-ধ্বংসকারী, না পার্বতাম্মার মতো মূর্তিপূজারী। বেনকাইয়ার মন্দিরের সংস্কার করার কথা স্থির করে যখন থেকে গাঁয়ে ফিরেছি, তখন থেকেই মাঝে মাঝে সেই কাজের জন্য শঙ্কর হেগ্গড়েকে টাকা পাঠাতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু বার বার শঙ্কা হতে লাগল ওঁর প্রতি এত বিশ্বাস করা কি সমীচীন? টাকার জন্য উনি প্রায়ই চিঠি লিখতেন। ওঁর ছেলে শম্ভু এখন ভটুর জায়গায় হেগ্ গড়ে লিখতে শুরু করেছে। সেও মন্দিরের কাজ কতদূর এগলো তার খবর মাঝে মাঝে দিতে লাগল।

হেগ্‌গড়েকে একেবারে বিশ্বাস করাটা ঠিক হয়েছে কিনা, তা নিয়ে মনে এখন নানারকম সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। মনে এ আশঙ্কাও জাগল যে, যশবন্তবাবুর টাকা আমি যে কাজে খরচ করেছি সেটা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী হল কি না।

যে কাজটা বেনকনহল্লির লোকদের করা উচিত ছিল, সেটার ভার আমি আমার বন্ধুর হযে নিজের ঘাড়ে নিয়েছি শুধু সেই বৃদ্ধাটির তৃপ্তির জন্য, যিনি ওঁর মাতৃস্থানীয়া। বেনকাইয়ার উপর যশবন্তবাবুর কোনো আস্থা ছিল না, আর আমারও নেই। জানি না, উনি বেঁচে থাকলে এ মন্দিরের সংস্কার করতে রাজী হতেন কিনা। তবে হ্যা, স্থাপত্যশিল্পের চারুকলা হলে আমি পেছ-পা হতাম না। বেনকাইয়ার এরকম একটি অসুন্দর প্রতিমার জন্য নূতন করে মন্দির তৈরি করার একটুও উৎসাহ ছিল না আমার। তবে আমার সান্ত্বনা এই যে, পার্বতাম্মা যদি যশবন্তবাবুর কাছে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তো উনি নিশ্চয়ই তা পূরণ করতেন। অবশ্য আমার ভুল এখানেই যে আমি নিজেই এগিয়ে নিজের ঘাড়ে সব দায়িত্ব নিয়েছিলাম। ওখানে আরো কিছুদিন বেশি থেকে যাওয়াই উচিত ছিল, যাতে সব ভার শঙ্কর হেগ্‌গড়ের উপর দিতে পারতাম। বলতে পারতাম, 'মন্দিরটা এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর গাঁয়ের মোড়ল হয়ে আপনি শুধু চুপচাপ বসে থাকবেন?' তখন উনি নিশ্চয় লজ্জিত হতেন। তারপর ওঁর প্রশংসায় শতমুখ হয়ে বলতাম, 'আপনার নাম হবে, আপনি অমর হবেন,' তাতে ওঁর গর্ব হত। আর আমার টাকাও খরচ হত না। এখন উল্টে যতদিন না মন্দিরের কাজ শেষ হচ্ছে কতবার আমায় ওখানে যেতে হবে। এত করার পরও মনে হচ্ছে যে ও-গাঁয়ে ভক্তিভাবনার তুলনায় টাকার লোভই বেশি। তা না হলে কি মন্দিরের অবস্থা এরকম হতে পারে? রাম হেগ্‌গড়ের মতো নিশ্চয়ই আরো কয়েকজন আছেন ওখানে। আমাকে বেশি উৎসাহী দেখে ওরা আমায় সন্দেহও করতে পারে, অতদূর থেকে এসে ইনি বেনকা-ইয়ার মন্দির সংস্কার করাতে বসেছেন কেন? ব্যাপার গুরুতর।

মানে, সকলের থেকে চাঁদা নিয়ে নিজের পেটে পোরা। এই তো? যাক্‌গে এ-সব ভেবে এখন আর কি হবে? বন্ধুর জন্য যদি কোথাও ভুলও করে থাকি তাতে কিছু আসে যাবে না। তা ছাড়া যাঁদের আমি জানি না তাঁদের সন্দেহ করাও তো নিরর্থক। মনকে এই বলে প্রবোধ দিলাম, আমি যা করেছি তা ঠিকই করেছি।

যখন গাঁয়ে ফিরে এলাম তখন শীতকাল। শীতের পর গ্রীষ্ম এল। শঙ্কর হেগ্‌গড়ের বিল প্রত্যেক মাসে আসত। সঙ্গে সঙ্গে কতদূর কাজ এগলো তার বিবরণ শম্ভু পাঠাত: 'আমরা বর্ষার শেষে পুরনো মন্দিরের ছাদ ভেঙে দিয়েছি। ছাদের আর কিছুই ছিল না। দেওয়ালগুলো এত ধসে পড়েছে যে সবই ভাঙতে হচ্ছে। মেঝেটা পাথরের করা দরকার, না?' আরেকবার লিখল, 'কাঠের কাজের জন্য বাবা উঠোনের গোটা কয়েক গাছ কাটিয়েছেন। কিন্তু এখানে কাঠ কাটার লোক পাওয়া যায় না। ছুতোর মিস্ত্রীও পাওয়া যায় না। সিরসি কিংবা কুমটা থেকে আনাতে হবে। ওরা দ্বিগুণ মুজরী হাঁকবে।'

আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "তাই করবেন। বিশ্বাসী লোককেই ডাকবেন, তবে আগাম দিয়ে খামাকা ঝঞ্ঝাট বাড়াবেন না।" পরের চিঠিতে খবর এল, পাথরের কাজ আরম্ভ হয়েছে। দেয়াল তোলাও শুরু হয়ে গেছে। ছুতোর মিস্ত্রী কাজে লেগেছে। আশা করা যায় গরমের শেষাশেষি মন্দিরের ছাদও হয়ে যাবে। এত আশা দেবার পর যে চিঠিটা এল তাতে ছিল, "রাম হেগ্‌গড়ে বলছেন, যে-কাজে হাত দেওয়া হয়েছে সেটা ভালো করে করা দরকার। মন্দিরের সামনের চাতালটা একটু বড় করতে হবে, যাতে বেশি লোক ধরে। উনি বলছেন, ঘরের দেয়ালগুলো আরো উঁচু করে ছাদের উপর তামার পাত লাগিয়ে দেওয়া হোক্‌ যাতে টেকসই হয়।"

ওখান থেকে মন্দিরের মাপ আনিয়ে আমি নকশা তৈরি করে পাঠিয়েছিলাম। মন্দিরের দেয়াল উঁচু করার জন্য, নতুন নকশা করা হল। উত্তর দিলাম, "আজ পর্যন্ত মন্দিরের ছাদে খাপরাও ছিল না,

তোমাদের বেনকাইয়া ওমনি বৃষ্টিতে ভিজতেন। খাপরার ছাদই ভালো। যদি রাম হেগ্‌গড়ে নিজের টাকায় তামার পাত আনিয়ে দেন তো নিশ্চয় তা লাগিয়ে দেবেন।" এর উত্তরে শম্ভু লিখল, "আগে পঞ্চাশ টাকা দেবেন বলেছিলেন উনি, এখন তো তাও আর দেবেন বলে মনে হচ্ছে না। বরং পার্বতাম্মাকে আমার নামে যা নয় তা বলে আমার বিরুদ্ধে ওস্কাচ্ছেন।"

বেড়ে মজা; শঙ্কর হেগ্‌গড়ে আর পার্বতাম্মার কাছে নিশ্চয় উনি শুনে থাকবেন, যশবন্তবাবুর কিছু টাকা আমার কাছে আছে, তাই এখন উনি আমার পেছনে লেগেছেন। একদিন নাকি উনি পার্বতাম্মাকে বলেছিলেন, "তুমি একেবারে বোকা। নিজের খরচের জন্য অন্তত পঞ্চাশ টাকা তো চাইতে পারতে? তাও করলে না। তোমার জন্য এত করলাম আর তুমিই এখন আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ। যে লোকটা এসেছিল, সে তো যশবন্তের কেউ হয় না। তবুও ওর সঙ্গে তোমার এত ভাব। আমি ওর জায়গায় হলে সব টাকা তোমায় দিতাম। যাক্‌গে, তা তো হয় নি। তুমি মন্দিরের কথা বলেছ, ভালোই করেছ। আজ নয় তো কাল সে কথা তুলতেই হত। আমারও তাতে কম আগ্রহ ছিল না। মন্দির বলে কথা। বেনকাইয়া তো কোনো যে-সে দেবতা নন। ওঁর মন্দিরের ছাদে তামার পাত লাগাতে যদি দু-এক হাজার টাকা বেশি লাগে তাতে ক্ষতি কি? ওর বাপের টাকা তো নয়। ওটা হ'ল যশবন্তের, সেটা তো তার খরচ করাই উচিত। এখানেই যশবন্ত মানুষ হ'ল। সে বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই টাকা দিত।

"আর জানো, যখন যশবন্ত কুমটা থেকে চলে গেল, শুনেছি ওর কাছে দু-লাখ টাকা ছিল। স্ত্রী-পুত্রের উপর রাগ ছিল, তাই ওদের কিছু দেয় নি। বোম্বেতে রাজার হালে থেকেছে ও দু-হাতে টাকা উড়িয়েছে। শেষে একদিন মারা গেল। তোমাকে কত টাকা পাঠাত? মাত্র পাঁচ টাকা, না? সেদিন তোমার কাছে যে

লোকটা এসেছিল তার কাছে অন্তত গোটা পঞ্চাশ হাজার টাকা হবে, একলাখও হ'তে পারে। এটা কি করে হ'ল ?"

এইরকম সব কথা রাম হেগ্‌গড়ে পার্বতীকে বলে থাকে, শম্ভু আমায় জানাল। ভাবলাম এত সব কথা নিশ্চয়ই শম্ভু বানিয়ে লিখতে পারে না।

তারপর শীত পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই শম্ভুর একটা মস্ত চিঠি পেলাম : "আপনি ছাদের বিষয় যা লিখেছিলেন তা ঠাকুরমাকে শুনিয়ে দিয়েছি, ওঁরও সেই মত। কিন্তু ঠাকুরমা রাম হেগ্‌গড়ের বাক্যবাণ আর সহ্য করতে পারছেন না। রাম হেগ্‌গড়ে ওঁকে প্রায়ই বলেন, 'এতদিন তোমার সব ভার আমি নিয়েছিলাম, আর আজ তুমি পাঁচ টাকা মাসোহারা পেয়ে নিজেকে স্বাধীন মনে করছ। এখন আর আমায় কি দরকার তোমার ? আমি কতবার বলেছি যশবন্তের টাকা থেকে অন্তত মাসে পঞ্চাশ টাকা করে তোমার চাওয়া উচিত। তাও তুমি করছ না। অসুখে-বিসুখে কে তোমায় দেখবে ? তোমার কাছে আছে কে ? আগে তো আমার চাকরি করে নিজের ভরণ-পোষণ করেছ, এখন বয়স হয়েছে। আমি তো শুধু দয়া করে তোমায় চাকরি দিয়েছিলাম। তুমি ভেবেছ কি ? এমন করেই কি তোমার চলবে ?' এ-সব বলে উনি ঠাকুরমাকে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছেন।"

আমি বিচলিত হয়ে উঠলাম। পার্বতাম্মার কাছে ধন ছিল লক্ষ্মী। কিন্তু সেই লক্ষ্মী এখন রাক্ষসে পরিণত হয়ে তাঁকে গ্রাস করছে। ওঁরা, ওঁর নাম করে যশবন্তবাবুর টাকা আমার কাছ থেকে মারবার ফন্দী আঁটছেন, বেনকাইয়ার মন্দিরের অজুহাতে। এভাবে পার্বতাম্মার পেছনে লেগে থাকলে শেষে ওঁদের লাভ হবে, এই তাদের ধারণা। এই চাপে পার্বতাম্মার কষ্ট বেড়েই চলেছে। এখন যদি মাসে পঁচিশ টাকা করে পাঠাই তা হলে এবার পিয়ন বা শম্ভুর হাতে না পড়ে রাম হেগ্‌গড়ের হাতে পড়বে। টাকার সন্ধান পেয়েই লোভ হয়েছে। মাসে দশটাকা হিসাবে আমি পার্বতাম্মাকে টাকা দিয়ে এসেছিলাম,

তাতেই গাত্রদাহ। ওঁর পালিত পুত্রের ধন বলাটা আমার ভুল হয়েছে। আমার বোকামির জন্যই এই বুড়ো বয়সে পার্বতাম্মার শান্তি নষ্ট হল। আর ক'বছরই বা আছেন উনি? ও-বাড়ি ছেড়ে কি আর কোথাও যেতে পারেন? তারজন্য শঙ্কর হেগ্‌গড়েকেই চিঠি লেখা দরকার। ওঁকে লিখে দিলাম, "আপনার দিদির মতো পার্বতাম্মাকেও নিজের বাড়িতে এনে রাখুন, তাতে যা খরচ পড়বে আমি দেব।" শঙ্কর হেগ্‌গড়ে আমার কথায় রাজী হলেন, বোধহয় তাঁর দিদিরও পরামর্শ নিয়েছিলেন। তাই ওঁর দিদি পার্বতাম্মাকে নিজেদের বাড়ি আনতে উৎসুক হলেন। যদিও ওঁর মনে তা নিয়ে সন্দেহ কম ছিল না। রাম হেগ্‌গড়ে যা-কিছুই করে থাকুক, এতদিন পরে ওই তো ওঁর দেখাশুনা করেছে। সে আশ্রয় ছাড়া কি সহজ? তা ছাড়া ওঁদের পরিবারের আগের শত্রুতার কথাও তো বাদ দেওয়া যায় না। তাঁর বাবার দিব্যির কথা। সে কি পার্বতাম্মা ভুলতে পারে? তাই মুঙ্গাবিকা বিশেষ আশা না রেখেই, ওঁর বাড়ি গিয়ে এ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

শম্ভুর চিঠিতে জানলাম ওর পিসির এ চেষ্টা বিফল হয়েছে। পার্বতাম্মা বলেছেন, "আজ পর্যন্ত আমি শুধু গালাগালি শুনেই বেঁচে আছি। যখন আমি উপরের বাড়িতে কাজ করতাম তখন কি কেউ আমায় গাল দিত না? যশবন্তের সৎমা তো যা নয় তা বলেছে। যশবন্তের মা ছাড়া কে আমায় ছেড়ে কথা বলেছে? তারপর তো রাম হেগ্‌গড়েই বলো বা ওর বাপ বলো কেউই আমাকে কিছু শোনাতে কসুর করে নি। ওরা জানত আমার কেউ নেই, পেটের দায়ে কাজ করছি। রাতদিন খাটতাম, তার উপর গালাগালি খেতাম। আমি জানি, আমার ভাগ্যে এই আছে। এখন আমি না চোখে ভালো দেখতে পাই, না খাটতে পারি। যে যা বলে বলুক। যারা আমার ছেলের মতো তারাই হেনস্থা করছে। আমি মরলে এরাই সহানুভূতি দেখাবে—'আহা, পার্বতী মরে গেল, আমরা তার বিরুদ্ধে যা খুশি তাই বলতাম, কিন্তু সে তা মুখটি বুজে সহ্য

করে গেছে।' গালি দেওয়াও তো কারুর কারুর স্বভাবের অঙ্গ।"

শম্ভুর চিঠিতে জানলাম, রাম হেগ্‌গড়ে কেমন করে জানতে পেরেছেন যে ওঁর পিসির ইচ্ছে পার্বতী তাঁদের বাড়িতে থাকে। তারপর থেকে আরো পিছনে লেগেছেন। বলেন, "আহা, পার্বতীকে কিছু বলাই আমার অন্যায় হয়ে গেছে। তোমার ভালোর জন্য যা বললাম তা তুমি সারা গাঁয়ে রটিয়ে বেড়ালে। তবে যা ইচ্ছে করো। রটাও চারিদিকে। যাও, এই বুড়ো বয়সে শঙ্কর হেগ্‌গড়ের বাড়িতে গিয়ে আরামে থাকো। আমার তাতে কি আসবে যাবে?"

সেদিন সারারাত পার্বতাম্মা ঘুমোতে পারেন নি। ওর অবস্থা আমি বেশ ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি। পরদিন সকালে রাম হেগ্‌গড়ে তার স্ত্রীকে দিয়ে বলে পাঠাল, "যাও মা, যারা তোমাকে অভিশাপ দিয়েছিল তাদের বাড়ি গিয়েই থাকো। কেউ যদি তোমাকে হত্যা করে, আমরা তোমার আত্মার শান্তির জন্য কাজও করতে পারব না। গাঁ-সুদ্ধ লোককে পুলিশে টানাটানি করুক। আর আমাদের বাড়িতে পা রেখ না।" এই ভাবে নিজে থেকে সব বন্ধন ছিঁড়ে দিলেন। কিন্তু পার্বতাম্মা কোনো প্রতিবাদ করেন নি, নীলকণ্ঠের মতোই সব বিষ গলাধঃকরণ করলেন। শম্ভু আরো লিখেছে, "এই রকমই যদি চলতে থাকে তবে ঠাকুরমা দুশ্চিন্তায় ও না খেয়ে খেয়ে আরো দুর্বল হয়ে পড়বেন, আর নির্ঘাত প্রাণ দেবেন। বেনকাইয়ার মন্দির সংস্কার স্বচক্ষে দেখে যেতে পারবেন কিনা সন্দেহ।" এ-সব পড়ে আমি ভীত হলাম। বেনকাইয়ার মন্দির সংস্কার করছি কার জন্য? যশবন্তবাবুর হয়ে আমি যে দায়িত্ব নিয়েছি সে কার শান্তির জন্য? আমি চিন্তিত হলাম।

আমরা শিক্ষিত লোকেরা গ্রামবাসীদের সুখশান্তিপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে খুব বড় বড় কথা বলে থাকি। কিন্তু গাঁয়ে খারাপ লোকের সংখ্যা কি কম? কাউকে না জানিয়ে যদি বৃদ্ধাটিকে

টাকা পাঠাতে থাকতাম, সেই ছিল ভালো। তখন শম্ভুকে সন্দেহ করে উল্টে পার্বতাম্মার কষ্টই বাড়িয়েছি। আমি নিজেই তো কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করেছি। এত দূরে বসে বসে আমি শুধু পণ্ডিতের মতো উপদেশ দিয়েছি। কিন্তু যাঁর জন্য এ-সব করেছি এতে তাঁর কষ্ট আরো বাড়ছে। দু-একদিন বড় উদ্‌বেগে কাটল। শম্ভুকে মন্দিরের বিষয় কিছু নির্দেশ দিলাম, অন্য কোনো কথাই তুললাম না। ভাবলাম এখান থেকে উপদেশ না দিয়ে বরং নিজে গিয়ে পার্বতাম্মার থাকবার বন্দোবস্ত করে আসি।

এর মধ্যে আমি নিজেই আরো কিছু বিপদ ডেকে আনলাম। আরো যে তিন জনকে টাকা পাঠানো হত তাদের যশবন্ত-বাবুর মৃত্যুসংবাদ দিয়ে লিখেছিলাম, "ওঁর বিষয় আপনারা যা-কিছু জানেন, আমায় দয়া করে লিখে পাঠাবেন।" কিছু দিনের মধ্যে বিষ্ণুপন্তের উত্তরও পেলাম। মনে হল যশবন্তবাবুকে উনি শ্রদ্ধা করতেন। বছরে একবার আমার বন্ধু মহাবলেশ্বর যেতেন আর কিছুদিন ওঁর কাছেও থাকতেন। ঘাটে মশাই আজকাল আর ওখানে যাচ্ছেন না. পুনায় মেয়ের কাছে থাকতেন। এখানে ওঁর লেখাপড়া করার অনেক বেশি সুবিধা। উনি নম্রভাবে লিখেছেন, "আমার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। হাঁপানীর কষ্ট কমছে না, আমি লেখাপড়া নিয়েই থাকি। যশবন্তবাবুর সাহায্যেই এ-সব করতে সক্ষম হয়েছি। উনিই আমায় প্রেরণা দিয়েছেন। কিন্তু আপনার কথা আলাদা, আপনি তো আমাকে জানেন না, তবুও যে সাহায্য উনি করতেন তা আপনিও চালু রেখেছেন। ওঁর মৃত্যুর পরও আপনি সে দায়িত্ব বহন করে চলেছেন বলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কখনো পুনায় এলে আমাদের এখানেই উঠবেন। যশবন্তবাবুর বিষয় যা জানি সব বলব।" ওঁর চিঠি পড়ে বুঝলাম, উনি ভাবছেন আমিই ওঁকে টাকা পাঠাচ্ছি। তাই লিখলাম, "যা ভেবেছেন তা নয়, ওঁর আদেশ অনুযায়ী ওঁর টাকা থেকেই এ টাকা পাঠানো হচ্ছে।" তারপর এও লিখলাম, "যখন

পুনা যাবার সুযোগ হবে তখন আপনার ওখানে নিশ্চয় উঠব।" ওঁর চিঠি পড়ে যে কৌতূহল জেগেছিল তার নিবৃত্তির জন্য লিখলাম, "আপনি লিখেছেন আপনি লেখক। কিরকম বই লেখেন? দয়া করে জানাবেন।" মাস কাবার হয়ে যাবার পর ওঁর উত্তর এল। উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাই উত্তর দিতে দেরি হয়েছিল। লেখার কথায় বলেছেন, "ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয় আমার শঙ্কাগুলির সমাধান করছি।" তারপর আর আমি কিছু লিখি নি।

বাকী দু-জনের মধ্যে একজন ছিলেন কুমটার নিকটবর্তী হোন্নগচ্ছের মঞ্জইয়াবাবু। একবার হোন্নগচ্ছে গ্রামে যেন আমি যাই। কুমটা থেকে তিন-চার মাইল দূরে। ওখানে একবার রাতে দশ-বারোজন শ্রোতার সামনে ভাষণ দিয়েছিলাম। ভাবলাম, আর-একবার কুমটা যেতে হবে এঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। ওঁকে বেশ কতকগুলো চিঠি দিয়েছিলাম। চার-পাঁচ মাস কোনো উত্তর আসে নি। কিন্তু মনি-অর্ডারের রসিদগুলোয় ওঁরই সই ছিল। যেন কাঁপা হাতের লেখা। তাই উত্তর না পাওয়াতে ভাবলাম ওঁর বয়স হয়েছে—আমারই সেখানে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করা উচিত। আর-একজনও কুমটার কাছাকাছি থাকতেন। তাঁর উত্তর অনেকদিন পরে পেয়েছিলাম। উনি লিখেছিলেন, যশবন্তবাবুর মৃত্যুসংবাদ শোনার পর ওঁর মা তিনদিন পর্যন্ত মুখে কিছু তোলেন নি। আমি ওঁর সঙ্গে যশবন্তবাবুর কী সম্বন্ধ জানতে চেয়েছিলাম। তার কোনো জবাব আসে নি। আমিও ঘাঁটাই নি। এঁর নাম, ধারেশ্বর শীন (শ্রীনিবাস)। ধারেশ্বর নামটা যেন চেনা চেনা। সে গ্রামও আমার দেখা। তবে শুনেছি ইদানীং উনি কোডকণী গ্রামে গিয়ে বাস করছেন। কুমটা গেলে দরকার পড়লে ওঁর সঙ্গেও দেখা করা যাবে।

শম্ভু হেগ্‌ড়ের আরো তিনটে চিঠি এসেছিল। লিখেছিল, "ঠাকুরমার বিষয় আপনি কিছুই লেখেন নি কেন? উনি এখনো ওখানেই দুঃখকষ্টে আছেন। আমরা ওঁকে আমাদের বাড়ি আনতে

চেয়েছিলাম, কিন্তু উনি আসেন নি। দুমাসের ভেতর উনি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আমার তো যথেষ্ট সন্দেহ, বেনকাইয়ার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার সময় পর্যন্ত উনি বাঁচবেন কি না। এখন দেবস্থানকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, কারণ মূর্তি প্রতিষ্ঠার আগে পুজা হতে পারে না। এতদিন ধরে আপনি ঠাকুরমার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যই এ-সব করছিলেন কিন্তু উনিই যদি না বাঁচেন তো কার জন্য করা?" সব শেষে লিখেছিল, "মন্দিরের দেওয়ালের কাজ এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ছাদে কড়িকাঠ শাগ্‌গিরই লাগানো হবে। খাপরা এখনো আসে নি।"

এ-সব কথা মনে করে কখনো কখনো কেমন অদ্ভুত লাগে। আমার নকশা অনুযায়ী বেনকাইয়ার মন্দির আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। পুরনো মন্দিরের জায়গায় নতুন মন্দিরের প্রত্যেকটি অংশ আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। ছাদ হয়ে গেছে। চুনকামও হয়েছে। পার্বতাম্মার মানত অনুযায়ী অগুন্তি নারকেল মন্দিরের সামনে ঢালা হয়েছে। কখনো আবার দেখি মন্দির সম্পূর্ণ হয় নি, বেনকাইয়ার মূর্তি রোদে পড়ে শুকোচ্ছে। রাম হেগ্‌গড়ের শাপ ফলেছে। পার্বতাম্মা মরে পেত্নী হয়ে বেনকাইয়ার মন্দিরের চারপাশে ঘুরছেন আর চেঁচাচ্ছেন। শুনে আমি ভয় পেয়ে গেছি। তারপরই ভাবি এটা তো শুধু স্বপ্ন। তবে জীবনটাও কি একটা স্বপ্ন নয়? স্বপ্নে সুখ, দুঃখ, ভয় সব সত্যি বলে মনে হয়। এ জীবনকেও তো মায়া বলেন দার্শনিকেরা।

অনেকদিন কেটে গেছে। চৈত্র পূর্ণিমার পর শম্ভু লিখেছে: "বেনকাইয়ার মন্দিরের ছাদ হয়ে গেছে। কাঁচা বাঁশের ছাউনীর উপর সূর্যের কিরণ পড়লে সুন্দর দেখায়" তাও লিখেছে। আবার লিখেছে, "আপনাকে কতবার এখানে আসতে অনুরোধ করেছি কিন্তু আপনি তাতে কান দিচ্ছেন না। আসুন না একবার! যে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে সেটা দেখে যান। অন্তত পার্বতী ঠাকুরমাকে দেখে যান।" আমার মনেও এ প্রশ্ন বার বার উঠছে মন্দিরের কাঠামো

হয়ে গেছে। প্লাস্টার করা হবেই যাবে। বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাও হবে। কিন্তু এ-সবের চেয়ে বেশি দরকার হ'ল পার্বতাম্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ। কিন্তু যাব কি যাব না, এই অনিশ্চয়তায় আরো কিছুদিন কেটে গেল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একটা চিঠি পেলাম। যশবন্তবাবুর মৃত্যুসংবাদ পাবার পরই চিঠিটা লেখা হয়েছে: "মহাশয়! আপনি কে, কী করেন, কিছুই জানি না আমি। আমার চিঠি লেখায় ত্রুটি থাকলে ক্ষমা করবেন। আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন আমি কে? কিন্তু ক্ষোভ এই যে আপনি কখনো আমাদের খবর নেবারও চেষ্টা করেন নি। আমাদের বাবার মৃত্যুসংবাদ আপনার আমাদের কাছে পাঠানো উচিত ছিল। ওঁর শ্রাদ্ধ করার অধিকার শুধু আমাদেরই আছে। অন্তত আমার মাকে তো এ খবর আপনার জানানো উচিত ছিল; তিনি এখনো বেঁচে আছেন। তার বদলে আপনি বেনকনহল্লিতে গিয়ে আমাদের ঠাকুরমার কাছে বাবার বিষয়ে বড় বড় কথা বলে এসেছেন। এ-সব যেই শুনবে সেই আশ্চর্য হবে। বাবার টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তির অধিকারী আমি—আপনি নন। শুনেছি ওঁর প্রচুর টাকাকড়ি আপনার কাছে রয়েছে। ওঁর মৃত্যুসংবাদ না দেবার কারণও বোধহয় এই হবে। যাই হোক, ওঁর যা কিছু বাকী আছে তার পুরো হিসাব দিয়ে, ওটা ফেরত দিন। আমরা রসিদ দেব। তা না হলে আমাদের উকিলের মারফৎ চিঠি পাবেন। এটা আপনাকে বলে দেওয়া আমাদের কর্তব্য বলে আপনাকে চিঠি লিখলাম। ইতি

চোচ্চলমনে সীতারাম হেগ্‌গড়ে।"

চিঠিটা পড়ে বেশ লাগল। অন্তত এটা তো মনে করেছে যে মারা যাবার পর ওর বাবা অনেক টাকাকড়ি রেখে গেছেন। বাপের শ্রাদ্ধ করবার সুবুদ্ধিরও তো উদয় হল। প্রায় পনেরো বছর পরে বাপকে মনে পড়ল ছেলের। তবে ওর মা কমলম্মা বেঁচে আছেন জেনে দুঃখিত হলাম। যেরকম স্ত্রীই হোক-না কেন, বিধবা হবার

আঘাত তো পাবেনই। আমার এর সঙ্গে দেখা করা উচিত। তবে এত শীগ্‌গির দেখা করতে হবে ভাবি নি। ও যে এত বেশি গোঁড়া, আগে জানলে বোম্বে থেকে এসেই ওকে খবর দিতাম। কিন্তু আমার বন্ধুর ডায়েরিতে ওঁর শ্রাদ্ধাদি বিষয়ের মতামত জানতে পেরে আর আমি কিছু করি নি।

ডায়েরির প্রথম পৃষ্ঠাতেই যশবন্তবাবু লিখেছেন :

"এখন আমি আছি ; কিন্তু মৃত্যুর পর নয়। জন্মাবার আগেই আমি মরেছিলাম। মৃত্যুর পর শুধু আমার স্মৃতি থাকবে, আমি থাকব না। আমিই যখন নেই, তো আমার শ্রাদ্ধ করার কোনো অর্থ হয় না। আমার মধ্যে যে গুণ আছে, তাকে নিজের করে নেওয়াই আমার শ্রাদ্ধ করার সমতুল্য। এমন শ্রাদ্ধ যে-কেউ কারুর জন্য করতে পারে। এ করাটা তো মনুষ্যসমাজের কল্যাণের জন্য, কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য নয়। মানব শাশ্বত, কিন্তু আমি শুধু ক্ষণিকের জন্য।"

যশবন্তবাবুর চিন্তাধারা এরকমই ছিল। এমন অবস্থায় উনি বেঁচে থাকতেই যারা ওঁকে অশ্রদ্ধা করেছে, ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করেছে, তারা উনি মারা যাবার পর শ্রাদ্ধ করতে যায়, তার কি কোনো মানে হয় ?

সেইজন্যই আমি ওঁর কুমটা-নিবাসী ছেলের ঠিকানা জানতে বিশেষ ব্যগ্র ছিলাম না। সময় পেলে চিঠি লিখব ভেবেছিলাম। যাই হোক্ ওঁর পাস বুকে প্রায় হাজার দেড়েক টাকা আছে, ওটা ব্যাঙ্কে পড়ে থাকলে তো কোনো লাভ নেই, আইন অনুযায়ী তা ওঁর উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য। অবশ্য এবিষয়ে আগেই ওদের লিখে দিলে ভালো হ'ত। সব ভেবেচিন্তে যশবন্তবাবুর ছেলের চিঠির উত্তরে লিখে দিলাম :

"আপনি আমার বন্ধু যশবন্তবাবুর ছেলে, জেনে খুব খুশি হলাম। পরের কাছ থেকে শুনে আপনি আমাকে দোষ দিয়েছেন। হ্যাঁ, আপনার বাবার কিছু টাকা আমার কাছে আছে। আপনি সময়

করে যদি এখানে আসতে পারেন তো ভালো হয়। আপনার বাবা তাঁর মৃত্যুর আগে আমার নামে একটা ড্রাফ্ট পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলেন যে সে-সব টাকা আমি যেন আমার ইচ্ছামত খরচ করি। সে চিঠিটা আপনি দেখতে পারেন। ওঁর আঁকা কয়েকটা ছবি ও কিছু বই-ও আমার এখানে রাখা আছে। আপনি এসে সেগুলি নিয়ে যেতে পারেন। বোম্বাই ওভারসীজ ব্যাঙ্কের ২৫১৬ নম্বরের অ্যাকাউণ্টে মোট ১৬১৩-৭-১০ টাকা জমা আছে। আপনি সোজা ব্যাঙ্ককে লিখে সেটা আনিয়ে নেবেন। আপনার উকিল যদি আর-কিছু করতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন তাই করবেন।"

এ-সব হাঙ্গামার পেছনে কে থাকতে পারে ভাবতে গিয়েই বুঝলাম, এ রাম হেগ্‌ড়েরই কাণ্ড। রাম হেগড়ের সঙ্গে সঙ্গেই ওর বাবার কথাও মনে পড়ে গেল। যশবন্তবাবুকে ধার দিয়ে দিয়ে উনি নিজের জালে ফাঁসাবার ফাঁদ পেতেছিলেন। মাছ ধরবার শক্তি ছিল বটে। ব্রাহ্মণ হলেও মেছুয়ার কাজে নামলেন। এরকম লোকেরা পার্বতাম্মার নিঃস্বার্থতা কি করে বুঝবেন?

যেদিন সীতারাম হেগ্‌ড়েকে চিঠি দিলাম সেদিন শম্ভুকেও লিখলাম, "এ চিঠি আপনার কাছে পৌঁছুবার আগে আমি নিজেই পৌঁছে যাব ওখানে।" আমি তখনই বেরিয়ে পড়লাম। কুমটা—তারপর সিরসি, আর সেখান থেকে বেনকনহল্লি। যাবার মুখে কুমটায় নামি নি। ফেরার পথেও কুমটায় নামতে ইচ্ছে হ'ল না। যশবন্তবাবুর থেকে যাঁরা টাকা পেতেন তাঁদের মধ্যে দুজন ওখানেই ছিলেন। কিন্তু ওঁদের পরিবারের সব খবরাখবর জোগাড় করার জন্য অন্য লোকদের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ আমাকে করতে হ'ত। তার জন্য বেশ কিছুদিন না থাকলে কাজ হ'ত না। তাই ফেরার পথেও কুমটা না গিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

এবার স্বাদী যাবার জন্য গোরুর গাড়ি করতে হল না' বাস সার্ভিস শুরু হয়ে গিয়েছিল। দেড় ঘণ্টার ভেতর পৌঁছে গেলাম। যে রাস্তা দিয়ে আগেরবার বেনকনহল্লি গিয়েছিলাম এবারও সেই রাস্তাই

ধরলাম। তখন ছিল বর্ষাকাল আর এখন গরমকাল। রোদের তাপে চারিদিক যেন শুকিয়ে কাঠ। পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। নেড়া শাল্মলী গাছের ডাল থেকে ফুল ঝরে পড়তে দেখলাম। ঘেমে নেয়ে উঠলাম। তেষ্টা মেটাবার জন্য লম্বা লম্বা পা পেলে বেনকটিলা পর্যন্ত এলাম। মন্দিরের চারিপাশে আগাছা, বাঁশের ঝাড় কেটে ফেলা হয়েছে। নতুন মন্দিরের খাপরার ছাদ হয়ে গেছে। সব দেখে ভালো লাগল। শম্ভু তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। মন্দিরের লাল লাল ছাদ দেখে খুব খুশি হলাম। ভাবলাম যতটা হয়ে গেছে ততটা নিশ্চয় পার্বতাম্মা দেখেছেন। নাও যদি দেখে থাকেন, তা হলে চতুর্থীর পূজা না দেখে তাঁর প্রাণ বেরুতে পারবে না। উনি ততদিন নিশ্চয় বেঁচে থাকবেন। দূরে দাঁড়িয়ে মন্দির দেখছি, না যেন স্বপ্ন। এ অবস্থায় শম্ভুর ডাক কানে এলো।

"এসে পড়েছেন দেখছি। আপনি না আসলে ওঁর কি অবস্থা হ'ত জানি না" বলে আমায় সম্ভাষণ জানাল। বার বার মন্দির পরিক্রমা করলাম। তন্ন তন্ন করে মন্দিরটা দেখলাম। কাঠের কাজ শেষ হয়েছে। প্রাচীনকালের মোটা মোটা থাম, কার্নিস ও কড়িকাঠের উপর নকশা করা হয়েছে। মন্দিরের ভেতরটা চুনকাম করা হচ্ছে। শম্ভুর পিঠ চাপড়ে বললাম, "সাবাস।" যে শম্ভু আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারত না তারও যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। বেশ খুশি খুশি মুখে টান হয়ে দাঁড়াল। তবুও খুশির মাত্রা আরো বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম :

"আপনার বাবা বাড়িতে আছেন তো?"

"এখন আর কোথায় যাবেন? পূজা করছেন খুব সম্ভব।"

"আপনি পূজাটুজা করেন না?"

"যতদিন বাবা আছেন, উনিই করবেন।"

"তা হলে? ঈশ্বর শুধু একজনের ··· "

"তা নয়। কিন্তু আপনিও তো আমার মতো। সেদিন সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় আপনাকে তো জপ করতে দেখি নি।"

"এ কিছু নতুন ব্যাপার নয়। কখনও করি নি।"

"গজাননের প্রতি এত ভক্তি থাকা সত্ত্বেও ...।"

"গজাননের প্রতি ভক্তি নয় ভাই, যিনি গজাননকে ভক্তি করেন তাঁর উপর ভক্তি।"

এর মানে ও বুঝল না। আমি তখন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম, "চলুন, আগে ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করা যাক্। তারপর আপনাদের বাড়ি যাওয়া যাবে।"

আমার হাত ধরে সে পাহাড় থেকে নামতে লাগল। এই খাড়া পাহাড় দিয়েই আমি প্রথমবার নেমেছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "কাদা নেই তো ?" ও বললে, "নিজেই দেখে নিন। রাস্তা সারানো হয়েছে। চওড়া করা হয়েছে। পাথর দিয়ে সিঁড়িও করা হয়েছে।" ওদের বাড়ি পৌঁছুলাম। কিন্তু শঙ্কর হেগ্‌ড়ে বা তাঁর দিদির সঙ্গে দেখা না করেই দূর থেকে 'এক্ষুনি আসছি' বলে শম্ভুর সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম। খিড়কি দোর দিয়ে বেরুবার পরই বললাম, "শম্ভু ভাই, আমার বিশ্বাসের উপযুক্ত কাজ আপনি করেছেন। আপনার মঙ্গল হোক্। আরেকটা আশা রাখি, সেটাও পূর্ণ করবেন তো ?"

"বলুন। আপনি আমায় জেলে পাঠাতে পারতেন, তার বদলে আমায় ক্ষমা করেছেন, কী না করতে পারি আপনার জন্য ?"

"তা হলে, আপনাকে একটু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।"

"বলুন কি করতে হবে। সাধ্যে কুলোলে অবশ্যই করব।"

"তা না হলে বলতামই না। শুনুন, আমাদের যশবন্তবাবুর বাড়ির নীচের অংশটা এখন কার ? আপনাদের, না রাম হেগ্‌ড়ের ?"

"রাম হেগ্‌ড়ের তো নয়ই। ওটা আমাদের অধিকারে। ওখানে কেউ আসেও নি আসতেও পারে না। আমি অবশ্য সঠিক বলতে পারব না, আমাদের অধিকার কোন্ হিসেবে। চল্লিশ বছর হয়ে গেছে, এখন তো অন্য কারুর সম্পত্তি হলেও এটা আমাদেরই ধরে নিতে হবে।"

"ভালো কথা ! আপনি তা হলে বাঁশের ঝাড় কেটে পুড়িয়ে দিন।

তারপর ওখানে একটা কুঁড়ে ঘর তুলে দিন। পার্বতাম্মার জন্য। আপনাদের বাড়ি থাকতে নিশ্চয় ওঁর সংকোচ হয়। কুঁড়েটায় উনি তা হ'লে থাকতে পারবেন। হপ্তা দুয়েকের মধ্যে সব হয়ে যাবে না ? তা হলে আপনার পিসিমাও খুব খুশি হবেন।"

"বাঃ, চমৎকার প্রস্তাব ! এখানে থাকতে ওঁর কোনো কষ্ট হবে না। তবে ঠাকুরমা রাজী হলে হয়।"

"রাজী করাবার ভার আমার।"

কথা বলতে বলতে আমরা মাঠের রাস্তা পেরিয়ে গেছি। তারপর রাম হেগ্গড়ের বাগান ও উঠোন পার হয়ে পার্বতাম্মার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। শম্ভু কুয়ো থেকে জল তুলে আগে নিজের পা ধুয়ে আমাকেও পা ধোবার জল দিল। তারপর আমরা ভেতরে ঢুকলাম। ও ডেকে বলল, "ঠাকুরমা, তোমার পালিত ছেলের বন্ধু এসেছেন।" আমি ওর পেছনে পেছনে সোজা ভেতরে চলে গেলাম। ঘরটা একেবারে অন্ধকার। এখানেই বসে একদিন খেয়েছিলাম। পার্বতাম্মা নিজে না খেয়ে আমাকে খাইয়েছিলেন আর নিজের পালিত পুত্রের আত্মার তুষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে বসেছিলেন। সেখানে উনি একটা ছেঁড়ামাদুর বিছিয়ে শুয়েছিলেন। আগের তুলনায় খুব বেশি রোগা লাগছিল। বেশ দুর্বল। মাথা হেঁট করে আমি প্রণাম করলাম। বললেন,

"বাছা, এই গরিবকে দেখবার জন্য কেন অতদূর থেকে এলে। আমারই জন্য এসেছ, না বাবা ?"

"হ্যাঁ মা তাই। আপনি, আপনার পালিত পুত্র, আর বেনকাইয়া —সবার ডাকে এসেছি।"

কিছুক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "বেনকাইয়া তোমার মঙ্গল করুন। আমাকে মন্দির দেখাতে এসেছ না ? আমার ছেলে তোমাকে দিয়েই এ-সব করাচ্ছে। কিন্তু আমার ভাগ্যে কি···," বলেই চুপ করে গেলেন।

"মা, এই কি আপনার বেদান্ত ? আপনার হয়েছে কি ?

বেনকাইয়ার এত সেবা করেছেন, উনি কি আপনার সেবা না নিয়েই আপনাকে ডেকে নিতে পারেন ?"

"এ ক'দিন বাঁচি তো আমার পরম ভাগ্য।"

"আপনার বেনকাইয়া যদি সত্যিই ভগবান, তা হলে কেন বাঁচবেন না ?" খুব ভক্তিভরে কথাটা বললাম আমি। ওঁর অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হচ্ছিল। ইতিমধ্যে শম্ভু নিম্নস্বরে রাম হেগ্‌ড়ের কীর্তি কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করল।

পার্বতাম্মা বললেন, "এও একটা সহজাত গুণ।"

"মা, আপনার পালিত পুত্রের টাকাকড়ির কথা যদি না বলতাম তো আপনাকে এত কষ্ট পেতে হত না। যাই হোক্, আপনার ইচ্ছাটা পূর্ণ করতে পারলাম এই আমার পরম সৌভাগ্য। নইলে আমরা কেই বা কাকে জানতাম।"

"তুমিও আমার পেটের সন্তানের মতো বাবা। জানি না, পূর্বজন্মে আমি তোমার কে ছিলাম।"

"আপনি যখন আমাকে এত আপন মনে করেছেন তখন আমার আর-একটি অনুরোধ রাখতে হবে মা।" বলে আমার প্রস্তাবটা শোনালাম।

শম্ভুও বলল, "ঠাকুরমা, আর আপনি না করবেন না, রাজী হয়ে যান। এ ভাবে না খেয়েদেয়ে আর আপনাকে এখানে থাকতে দেওয়া হবে না।"

উনি কিছু বললেন না। আমরা 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্' জেনে বাড়ির দিকে ফিরলাম। আমরা যখন ফিরছিলাম, রাম হেগ্‌ড়ে বৈঠকখানায় বসে পান চিবুতে চিবুতে আমাদের দেখেও না দেখার ভান করল, আমরাও ওঁর পন্থা অনুসরণ করে চলে এলাম।

আমরা যখন শম্ভুর বাড়ি পৌঁছুলাম, শঙ্কর হেগ্‌ড়ে পূজাপাঠ শেষ করে কপালে তিলক কেটে আমাদের অপেক্ষায় বসেছিলেন। আমাদের দেখে অভ্যর্থনা করলেন। এবার আমি তিনদিনের জায়গায় ছ দিন ওখানে থেকে গেলাম। শঙ্কর ও শম্ভু হেগ্‌ড়ের

দৌলতে বেশ কয়েকজন মজুর পাওয়া গেল। ওরা দুদিনেই বাঁশের ঝাড় কেটে-কুটে জঙ্গল পরিষ্কার করে দিল। যেখানে আগের বাড়িটা ছিল সেখানে মাটি খুঁড়ে থাম বসানো হ'ল, আর ছিটেবেড়া দেওয়া হল। বাঁশের ছাউনী হল। তার উপর খড়। দুদিনেই কুঁড়েঘর তৈরি হয়ে গেল। শঙ্কর হেগড়ে বর্ষার আগেই একটা পাকা ঘর তৈরি করে দেবার কথা দিলেন। পঞ্চাশ টাকার মধ্যেই সব কাজ হয়ে গেল। এ-সব আমি যশবন্তবাবুর টাকা থেকেই করিয়েছিলাম। তাই শঙ্কর হেগড়েকে টাকা দিয়ে দিলাম। উনি গাঁইগুঁই করে শেষে নিয়ে নিলেন। ভালো দিন দেখে পঞ্চম দিনে, আমি, শম্ভু ও মুঙ্গকাওয়া তিনজনে পার্বতাম্মার বাড়ি গেলাম। ওঁকে ওঁর পালিত পুত্রের বাড়ি আনলাম। খুব তৃপ্তি হ'ল। তারপর ওঁকে শোওয়ানোর ব্যবস্থা করে মুঙ্গকাওয়া বললেন, "এখানেই তুমি কতবার যশবন্তকে তোমার সঙ্গে শুইয়েছিলে পার্বতী, মনে আছে, না?" বলতে গিয়ে তাঁর চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল।

পার্বতাম্মা বললেন, "বেনকাইয়ার দয়া।"

এখানেই উনি তাঁর যৌবন কাটিয়েছিলেন, এ বাড়ির নুন খেয়েছিলেন। সেখানে এখন একটা কুঁড়ে ঘর উঠল। মাথা গোঁজবার ঠাঁই তো হল? শেষকালে নিজের বাড়িতে জায়গা তো পেলেন। সে আনন্দ অতুলনীয়।

সেদিন দুপুরে অর্থাৎ আমার থাকার ষষ্ঠ দিনে আমরা ওঁকে বেনকাইয়ার নতুন মন্দিরে ধরে ধরে নিয়ে গেলাম। দুটো থামের মাঝে ঠেসান দিয়ে উনি কোনো রকমে বসলেন। মুঙ্গবিকা ও পার্বতাম্মা দুজনেরই আনন্দের সীমা নেই। যশবন্তবাবুর ইচ্ছানুযায়ী স কাজ হয়ে যাওয়াতে আমিও খুব খুশি ছিলাম। ওঁর টাকা যথাযথ খরচ করা গেছে বলে আমিও তৃপ্তি পেলাম।

আপনারা নিশ্চয় মনে করেছেন আমি এরপরও একবার বেনকনহল্লি গিয়েছিলাম। তা ঠিকই ধরেছেন। যখন বেনকাইয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল তখন স্বচক্ষে তার পূজা দেখতে শেষবার সেখানে গিয়েছিলাম।

সকালবেলা পূজা দেখে পার্বতাম্মার আশীর্বাদ নিয়ে যখন গাঁয়ে ফিরে এলাম তখনই পার্বতাম্মার মৃত্যুসংবাদ পেলাম।

আট

পনেরো দিন পরে চোচ্চলমনে সীতারামের আর-একটা চিঠি পেলাম। এটা নিশ্চয় আগের চিঠির চেয়েও ক্রূর হবে মনে করে খুললাম। তবুও ভালো, এবার যেন মাথা ঠাণ্ডা করে লিখেছে—

"মহাশয়,

আগের চিঠিতে বাবার মৃত্যু সংবাদ না দেবার জন্য আমার অনুযোগ ছিল। সে বিষয় আপনি কিছু লেখেন নি। আমাদের মধ্যে বনিবনা ছিল না সেটা বোধহয় আপনি জেনে থাকবেন। তাই বাবার মৃত্যুর সংবাদ তখনই দেন নি। আপনি না দিলেও আমরা একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয়র থেকে সব জেনেছি। তারপর বাবার শ্রাদ্ধও করেছি। ব্যাঙ্কের টাকার কথা লিখেছেন, ধন্যবাদ। আমার বাবা আপনাকে নগদ কত টাকা দিয়েছেন? এ বিষয় কিছুই লেখেন নি। এ ভালো কথা নয়। আইনত আমার বাবার স্থাবর, অস্থাবর, সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী শুধু আমরাই। এর বেশি এখন আর কিছু লিখতে পারি না। কারণ সব কথা তো আমি জানি না। যত শীগ্‌গির পারি আপনার ওখানে আসব। বিশ্বাস করতে পারি কি আমি গেলে আমায় সব কাগজপত্র যা আপনার কাছে রয়েছে, দেখাবেন? এ ছাড়া বাবার অন্যসব জিনিস বোম্বেতে কোথায় আছে, আর কি কি জিনিস আছে, আগেই বলে দিলে আনতে সুবিধা হবে। আমার বাবা আপনার যেমন আপন ছিলেন, আমাকেও তেমনই ভাববেন। এই মনে করে চিঠিটা লিখলাম। ক্ষমা করবেন। নমস্কার। ইতি—

সীতারাম হেগ গড়ে।"

যতদূর জানি যশবন্তবাবুর একটিই ছেলে। মেয়ে বোধহয় তিনটি। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে, আর শ্বশুরবাড়িতেই সবাই আছে। চিঠিতে সীতারাম যে 'আমরা, আমরা' বলেছে তাতে বোনেদেরও ধরেছে বলে তো মনে হয় না। আমরা গৌরবে বহুবচন। এ-সব আমার মোটেই ভালো লাগল না। চিঠির উত্তরে তাই একটু ব্যঙ্গ করে লিখলাম :

"আপনি আমায় বিশ্বাস করে যে চিঠি লিখেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি যে বিষয় জানতে চেয়েছিলেন তা আগেই লিখেছি। বোম্বের ঠিকানাও দিয়েছিলাম। বোম্বেতে কিছু বাসন, টেবিল, চেয়ার ছিল। সে-সব আমি আনি নি। সে-সব জিনিষ বাড়িওয়ালার কাছে রেখে এসেছি। আপনার সময়মত আপনি এখানে আসতে পারেন। আমি যা কিছু জানি, আপনাকে সব বলতে সব সময় প্রস্তুত। ওঁর যে জিনিষ এখানে আছে তা আপনি দেখতে পারেন। ইতি

আপনার..."

চিঠিটা লিখে ডাকে ফেলে নিজের কর্তব্য শেষ করলাম। ভাবলাম চিঠি পেলেই সোজা এখানে চলে আসবে। কিন্তু তা না করে, নিশ্চয় অনেক, অনেক কিছু পাবার আশায় সে সোজা বোম্বে গিয়ে জামসেদবাবুর সঙ্গে দেখা করল। জামসেদবাবুর চিঠিতেই জানলাম সেটা। বোধহয় ওখানেও নিজের স্বভাবের পরিচয় দিয়ে এসেছে।

উনি লিখেছেন :

"আপনার ঠিকানা আমি নিয়েছিলাম। কিন্তু একবছরের মধ্যে একটাও চিঠি লিখতে পারি নি। আপনি বোধহয় আমায় ভুলে গিয়ে থাকবেন। সম্প্রতি একটা ঘটনা ঘটাতে আপনাকে চিঠি লিখতে হ'ল।

"এই ক'দিন আগে আপনার চিঠি নিয়ে সীতারাম বলে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। উনি যশবন্তবাবুর ছেলে বলে পরিচয়

দিয়েছিলেন বোধহয়। যখন আসেন আমি বাড়ি ছিলাম না। আমার স্ত্রী ওঁকে বসান, পরে কথায় কথায় অনেক কিছু জানতে পারেন। ওঁর আচার-ব্যবহার আমার স্ত্রীর একটুও পছন্দ হয় নি। আমি না ফিরলে, আমার সঙ্গে দেখা হতে পারে না তাই উনি চলে গেলেন। উনি চলে যাবার একটু পরেই আমি বাড়ি ফিরি। আমার ধারণা ছিল যে আপনি যশবন্তবাবুর একজন আত্মীয়। পরে সীতারাম আবার আসেন, উনিই বললেন, আপনারা আত্মীয় নন। আপনি অবশ্য কখনো বলেন নি আপনারা আত্মীয়, কিন্তু আমি সেরকমই ধরে নিয়েছিলাম। যশবন্তবাবুও কখনো এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নি। তবুও আমি ভেবেছিলাম ওঁর ছেলেই ওঁকে টাকা পাঠায়। এখন দেখছি সবই আমি ভুল বুঝেছি।

"ওঁর মুখে আপনার নিন্দা শুনে দুঃখিত হলাম। আমি বলে দিয়েছি, আপনার বাবার অন্তিম সময়ে উনি নিজেই আমাকে দিয়ে আপনাকে ডেকে পাঠান তারপরই আপনি আসেন, তবে আপনার আসবার আগেই ওঁর মৃত্যু হয়। তারপর আপনি ওঁর বাড়িতে গিয়ে যা কিছু ছিল সব কিছু নিজের অধিকারে রেখে ফ্ল্যাটটা বাড়িওয়ালাকে ফিরিয়ে দিলেন। এখন ওখানে অন্য ভাড়াটে বসেছে। ওঁকে বললাম, বাড়িওয়ালার কাছে আপনার বাবার কিছু জিনিষ যদি থাকে, চেয়ে নিন। উনি বললেন, আমি ও আপনি মিলে ওঁর বাবার হাজার হাজার টাকার সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছি। শুনে আমার ভীষণ রাগ হ'ল আর তক্ষুণি ওঁকে বাড়ি থেকে বার করে দিলাম। পরদিন শুনলাম উনি বাড়িওয়ালাকে নিয়ে এসেছিলেন। যশবন্তবাবুর চেয়ার সোফা যেগুলো আপনি রেখে গিয়েছিলেন সে-সব বাড়িওয়ালা ওঁকে দেখালেন, আর নিয়ে যেতে বললেন। বোধহয় বাড়িওয়ালার সঙ্গেও উনি ঝগড়া করেছেন। বাড়িওয়ালাও ওঁকে কিছু বলতে বাকী রাখেন নি। তৃতীয়বার আমি বাড়ি থাকতেই এসেছিলেন, যশবন্তবাবুর

জিনিষগুলো আমার কাছে বিক্রি করতে। দরকার না হলেও বন্ধুর জিনিষ বলে একশো টাকা দিয়ে কিনে নিলাম।

"তারপর নিজের বাপের গল্প আমায় শোনালেন। বললেন, ওঁর কাছে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল। পরিবারের সবাইকে ছেড়ে দিয়ে বোম্বাই চলে আসেন। এখানে টাকা জলের মত খরচ করেন। স্ত্রী-পুত্রকে অশেষ কষ্ট দিয়েছেন ইত্যাদি। ছেলে হয়েও বাপের নামে যা নয় তাই বলেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমায় সব শুনতে হল। ও যা বলেছে তাই কি সত্যি? এইজন্যেই বোধহয় যশবন্তবাবু স্ত্রী-পুত্রের বিষয় কিছু বলতেন না। বোধহয় ওদের ভালোবাসতেন না। তবে সত্য-মিথ্যা ভগবানই জানেন। কিন্তু আমি ওঁর একেবারে আলাদা রূপ দেখেছি। দাদাকে কি ভাবে রেখেছিলেন সে তো স্বচক্ষেই দেখেছি। দাদা উল্টে ওঁকেই দোষ দিত, তবুও যশবন্তবাবু ওকে আপনার করে নিয়েছিলেন। তখনই বুঝেছিলাম যে যশবন্তবাবু তাঁর বিরোধীদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না। ভালো কথা, আর-একটা খবরও সে দিয়েছে, ওর বাবা নাকি খুব রাগী ছিলেন। আমি তো এত-দিনে একবারও রাগ করতে দেখি নি। সব দোষ সে আপনার ঘাড়েই দিয়েছিল। বলেছে, যশবন্তবাবু আপনাকে পঞ্চাশ না পচাত্তর হাজার টাকা তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে দেবার জন্য দিয়েছিলেন যেটা আপনি গাপ করে বসে আছেন। তাই ওর বাবার মৃত্যু সংবাদ আপনি ওর থেকে লুকিয়েছেন।

"এখানে এসে আমার বন্ধুর বিষয় কতকগুলো মিথ্যে সন্দেহ ভুল দিয়ে চলে গেছে।"

স্বার্থপর যারা তাদের স্বভাব এইরকম হয়। নিজে ঠিকমত না জেনে পরের কথা ওরা অনায়াসে বিশ্বাস করে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তার উপর যেখানে টাকার ব্যাপার সেখানে তো বদনাম হওয়াই স্বাভাবিক। আমি একা এ নিয়মের ব্যতিক্রম কি করে হতে পারি? এ-সব রটাবার আগে সীতারাম আমার

কাছে এসে সব জেনে নিলে ভালো হত। কিন্তু আমি তো আর পৃথিবীর সকলকে নৈতিক শিক্ষা দেবার ভার নিই নি? ভাবলাম, আমার কাছে যশবন্তবাবুর যে টাকা আছে, যাদের যা দেবার, দিয়ে রেহাই পাই।

চিঠি আসার পনেরো দিন পরেই সীতারাম হেগ্‌গড়ে স্বয়ং আমার এখানে এসে হাজির। চেহারায় বাপের সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য ছিল। না লম্বা, না বেঁটে। বেশ চটপটে। উত্তর কন্নড়ের গ্রামের শৌখিন লোকদের মতো হালফ্যাশনে-ছাঁটা চুল। মাথায় কালো টুপি। কানে চুনী পান্নার কুণ্ডল ও মাকড়ী। সাদা পোশাক। কোটের সব বোতাম খোলা, কাঁধে জরিদার সূতি চাদর। বেশ দূর থেকে জুতার শব্দে তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করলেন। তা-দেওয়া গোঁফ। চালচলন বেশ ভারিক্কি। দূর থেকে ওকে আসতে দেখে মনে হল যেন বাঘের ছানা। অনেক দিন ধরে তাঁর প্রতীক্ষায় ছিলাম, আমিই আগে নমস্কার করে বললাম, "কুমটা থেকে, না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"চোচ্চলমনে সীতারাম হেগ্‌গড়ে বাবু?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"আসুন, বসুন। আপনি আসবেন জানতাম। আগে মুখ-হাত ধুয়ে নিন। চা, না কফি?"

"চা খাবার সময় নেই। কাজ সেরে আজই আমায় মঙ্গলুর যেতে হবে। কুমটা তো আর হাতের কাছে নয়? আসা-যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়।"

"যা বলেছেন। বাসে যেতে হয়, রাস্তায় গোটা কয়েক নদীও আছে। আমিও ওখানে ঘুরে এসেছি। আসুন হাত-মুখ ধুয়ে নিন। খাওয়াদাওয়ার পর কাজের কথা হবে।"

"এত সময় কোথায়? আপনাকে বললাম না, একদম সময় নেই!"

প্রতি কথায় অহংকার ফুটে বেরুচ্ছে। তাই "আমারও কাজ

আছে" বলে আমি উঠে ওঁর কাছ থেকে সরে বসলাম। তখনি মনে হল এটা ঠিক নয়। তাই আবার উঠে নিজের ঘরে গিয়ে একটা বই নিয়ে বসলাম। ইতিমধ্যে আমার একজন অধ্যাপক বন্ধু এসে পড়লেন। আমিও বেঁচে গেলাম। আধঘণ্টা ধরে ওঁর সঙ্গে নানা রকম গল্প হল। আমার বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "বাইরে কে বসে? দেখতে যেন সাক্ষাৎ লঙ্কার রাবণ।...কেন এসেছেন? পান-তামাকে ঠোঁট দুটো একেবারে লাল। যেন পিচকারী ছুঁড়ছেন!" ওঁর কথায় পুলকিত হয়ে আমিও গেয়ে উঠলাম "ছুঁড়ো না পিচকারী।" বন্ধুটি বললেন, "এই, এই, উনি শুনতে পাবেন যে।"

"গান তো লোককে শোনবার জন্যই।"

তখনি বাইরে থেকে সীতারাম হেগ্‌ড়ে সাড়া দিল, "মশাই, আপনি চিঠি দেখাবেন বলেছিলেন, দেখাবেন না?" ভেতর থেকেই জবাব দিলাম, "আপনার রাগ পড়ে গেছে কি? তা হলে চলে আসুন, দেখাতে পারি।" এমন সময় একজন সাক্ষীরও দরকার ছিল, কারণ ওকে চিঠি দেখালে ও যদি ছিনিয়ে নেয় বা ছিঁড়ে ফেলে? উনি ঘরে ঢুকলেন। আমার অনুরোধে বসলেন। তখনি চাকর তিনজনের জন্য কফি ও জলখাবার নিয়ে এল। আমি ওঁকে খেতে অনুরোধ করলাম।

উনি তখন হাত ধোবার জল চাইলেন। ছোকরাটা জল দিল। ভাবলাম উনি বোধহয় শুধু মুখ ধোবেন, কারণ ওঁর কথাবার্তায় আগেই মনে হয়েছে যেন আমার এখানে জলস্পর্শ করবেন না এই প্রতিজ্ঞা করেই এসেছেন। জল খাওয়া শেষ হলেই ওঁকে বোম্বে থেকে আসা জামসেরবাবুর চিঠিটা ধরিয়ে দিলাম। উনি পড়ে ফেরত দিলেন।

তারপর, অসুস্থ হবার পর যে 'তার'টা ওর বাবা পাঠিয়েছিলেন সেটা দেখালাম।

উনি ওটাও পড়ে নিলেন।

"এই দেখুন, মারা যাবার এক সপ্তাহ আগে আপনার বাবা আমাকে যে চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন," বলে সে চিঠিটা দিলাম।

ওঁর পড়া হয়ে গেলে, চিঠিটা নিয়ে নিলাম। "পনেরো হাজার টাকার ড্রাফ টের সঙ্গে আপনার বাবা এই চিঠি দিয়েছিলেন," বলে সেটাও দিলাম।

ওটাও পড়লেন। তারপর জানি না কী ভেবে বললেন, "এতে বাবা লিখেছেন, 'আমি নিজে আসব, নিশ্চয় আসব।' এর অর্থই হল ও-টাকাটা উনি ফেরত নিতে আসবেন। কিন্তু ওঁর মৃত্যুর পর তো তাঁর উত্তরাধিকারী আমি, তাই ওটা আমার প্রাপ্য…।"

"কিন্তু চিঠির প্রথম দিকেই তো স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে 'আমি না থাকলে টাকা কিভাবে খরচ করতে হবে…'। যে স্পষ্ট আদেশ দিয়েছিলেন সেটা তো আমাকে মানতে হবে, না?" বলে ওঁর কাছে সন্তর্পণে গিয়ে তাড়াতাড়ি চিঠিটা নিয়ে নিলাম।

"উনি নেই বলে কি আমরাও নেই নাকি?"

"আপনি আছেন নিশ্চয়। কিন্তু উনিই তো ধরে নিয়েছিলেন যে আপনি নেই। তাইতেই তো সব গোলমাল।"

আমার তাড়াতাড়ি চিঠি নিয়ে নেওয়া ও এ কথা বলাতে ওঁর খুবই খারাপ লাগল। উত্তেজিত হয়ে বললেন, "ছেলের চেয়ে ওঁর সম্পত্তিতে আপনার অধিকার বেশি নাকি? সব-কিছু হারিয়ে গাঁয়ে যে বুড়িটা খেটে মরছে তার জন্যও কি কিছু নেই?"

আমিও গরম হয়ে উত্তর দিলাম, "এ-সব কথা আপনার বাবা থাকতে তোলেন নি কেন? আমায় এ-সব বলার কী অর্থ? যশবন্তবাবুর উইল অনুযায়ী কাজ করা ছাড়া আর আমি কী করতে পারি? তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে আমি কোনো কাজ করব না।"

"এর মানে পার্বতাম্মার নামে মন্দির-সংস্কারের ছুতো করে, বাকি টাকাটা আপনার মারবার ইচ্ছে, বাবার স্ত্রী-পুত্রকে কিছুই দেবেন না এটাই স্থির করেছেন। আমাদের হেগ্‌গডেমশাই একেবারে ঠিকই বলেছেন।"

"এই বাক্স দুটোয় বই ও ওঁর আঁকা গোটাকতক ছবি আছে। দেখবেন? সময় হবে কি? এ-সব আমায় দেন নি। আমি নিজেই নিয়ে এসেছি। চান তো সব আপনি নিয়ে যেতে পারেন।"

"এ বাক্স দুটো নদীর জলে ফেলে দিন। আমার বাবা যে চিঠিটা আপনাকে লিখেছেন সেটা আমায় দিন।"

ওঁর চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল। খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। আমার বন্ধুকে বললেন, "দেখুন, পুরাণেও বোধহয় এরকম কোনো নজির নেই যে বাপ নিজের ছেলের সঙ্গে এমন শত্রুতা করেছে।" ওঁর এভাবে বাপের নিন্দা করা দেখে আমি সহ্যের সীমা হারিয়ে বললাম,

"কোনো পুরাণে বাপের এভাবে নিন্দে করতে পারে, এমন ছেলেরও নজির নেই। তবে পুরাণশাস্ত্র চর্চা করার জায়গাও এটা নয়।" তারপর উনি বোকার মতো সংক্ষেপে তাঁর আসার উদ্দেশ্য আমার বন্ধুকে বলতে লাগলেন। বন্ধুটি তো এ-সব দেখে অবাক।

"তা হলে আমি যাই?" উনি জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি বললাম, "আমার বাড়ি অতিথি হয়ে এসেছেন। আমি আপনাকে যেতে কী করি বলি? তায় আবার আমার বন্ধুর ছেলে। রাগ পড়ে গেলে, মন সুস্থির হলে বিদায় নেওয়াটা ভালো নয় কি?"

শুনে আপনারা বিস্মিত হবেন, সেদিন কিন্তু সীতারাম হেগ্‌ড়ে আমার বাড়িতে অতিথি হয়ে রয়ে গেলেন। আমি খুব সাবধান থাকলাম, ওঁর বাবার বিষয় আর বিশেষ কিছু বলি নি। বরং উনিই নিজের বাবার বিষয় আমায় কিছু শোনাতে চাইছিলেন। তখন আমি ওঁকে জানিয়ে দিলাম যশবন্তবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি। তারপর সীতারাম হেগ্‌ড়ে বোধহয় অনেক ভেবেচিন্তে আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। আমার বিচার-বিবেচনা, সহ্যশক্তির খুব প্রশংসা করলেন। নিজেদের অবস্থা, মায়ের কষ্ট ও ধারকর্জের কথা বলে আমার সহানুভূতি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। আমিও 'হুঁ'

করে গেলাম। পরদিন ওঁর বাবার চিঠির একটা নকল করে তাতে সই করে ওঁকে দিয়ে বললাম, আসল চিঠিটা আমার কাছে রইল।

ওঁর ধরন-ধারণে ওঁর প্রতি আমার অবিশ্বাস জন্মেছিল। ওঁর পোশাক-আশাক আর গর্বিত ভাব দেখে মনে হচ্ছিল না উনি ধার করে কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। তবে এও নয় যে ওঁর বোনরা বড় সুখে আছে। তাই আমি বললাম, "আপনি এসে খুব ভালো করেছেন। আপনার বাবা আমায় যে টাকা দিয়েছেন তা অযথা খরচ করব না। বেনকাইযার মন্দির সারাতে কিছু খরচ করেছি। ওঁর উইল অনুযায়ী চারজন লোকের কাছে প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠাচ্ছি। একদিন আপনাদের গাঁয়ে যাব। ওঁর সন্তানদের মধ্যে কেউ অর্থকষ্টে থাকলে যেমন বুঝব দেব নিশ্চয়। আমি যতদূর করতে পারি করব।" এ-সব শোনার পর আমার তো মনে হল উনি বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

ফিরে যাবার পর উনি ক্রমাগত চিঠি লিখেই চললেন। কোনোটা আমার বিরুদ্ধে, কোনোটা খুব নম্র হয়ে, আবার কোনোটায় প্রশংসা করে বা নিন্দে করে। আমি কোনোটারই উত্তর দিলাম না। তার মতো আমার তো কোনো তাড়া ছিল না। তাই চুপ করেই রইলাম। ভেবেছিলাম গজাননের উৎসবে যখন যাব তখন ফেরার পথে কুমটা হয়ে আসব। কিন্তু সময় পেলাম না।

নবরাত্রির সময় উনি কুমটার এক উকিলকে দিয়ে নোটিশ পাঠালেন: 'এতদ্বারা আপনাকে সূচিত করা হইতেছে···।' ঐ নোটিশ অনুযায়ী আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা, প্রতিশত আট টাকা সুদ সমেত ওঁকে দিতে হবে। তার সঙ্গে রেজিস্টার্ড নোটিশের খরচ চার আনা ও উকিলের ফি এক টাকা দিতে হবে। এ কথাই বিস্তারিত ভাবে লেখা ছিল। না দিলে, জানেনই—এর ফল ভালো হবে না ইত্যাদি।

নোটিশ পড়ে বেশ মজা লাগল। একজন উকিল বন্ধুর পরামর্শ নিতে গেলাম। নোটিশটা পড়ে বন্ধুটি খুব হাসলেন। বললেন,

"এর আবার কি উত্তর আছে? যশবন্তবাবুর চিঠিতে তো সব অধিকার আপনাকেই দেওয়া হয়েছে। মামলা মোকদ্দমা হলেও এখানেই হবে। সীতারাম যদি চায় তো এখানে এসে কোর্টে দাবি করুক যে মোকদ্দমা মঙ্গলুরে হোক্, কারণ পনেরো হাজার টাকার মামলা যে। মামলা করলে ওঁর লোকসান বই লাভ কিছু নেই। তবে এখানকার একজন উকিলের যদি ভাল আমদানী হয়, তাতে আপনি বাগড়া দেবার কে?"

আমি বললাম, "আপনারা উকিলরা জাত 'হপ্প্‌কক্'।"

উনি আমার তুকুভাষা বন্ধু, কন্নড়ের 'হপ্প্‌কক্' বুঝবেন কি করে? তাই বললাম, "হপ্প্‌কক্ মানে, মড়া খেকো শকুনি। জ্যান্ত মানুষেরই মাংস খামচে খান, মরে গেলেও ছাড়েন না।"

নোটিশ দেওয়ার তিনমাস পরেও সীতারাম কিছু করল না। মনে হল, ওর উকিল নিশ্চয় এই পরামর্শ দিয়ে থাকবে যে কাজ হলে নোটিশেই হবে নইলে কিছুই হবে না।

এবার গরমে আমি কুমটা যাব ঠিক করেছিলাম। ওখানে গেলে সীতারাম, ও সম্ভব হলে, ওর মা-বোনদের দেখবার ইচ্ছা ছিল। আমার বন্ধুর স্নেহপাত্র ধারেশ্বর শান আর হোন্নগচ্ছে মঞ্জৈয়ার সঙ্গেও দেখা করতে চাইছিলাম। যশবন্তবাবুর উপর যাদের রাগ ছিল তাদের কাছে ওঁর বিষয়ে কিছু জানতে চাই কিন্তু সে আশা পূরণ হবার নয়। সীতারাম হেগ্‌গড়ে যেটুকু সময় আমার ওখানে ছিল, ও যেরকম সব চিঠি লিখেছিল, তাতেই ওদের একপ্রকার চিনে নিয়েছিলাম। আমার বন্ধুও তাঁর স্ত্রী-পুত্র পরিবারের তুলনা মল্লিকা ও আমগাছের সঙ্গে করেছিলেন। মল্লিকা লতার পরনির্ভরতাও দেখিয়েছিলেন। সন্তানদের বিষয় না জানি কত কী লেখবার ছিল। অথচ ডায়েরিতে একবারও ছেলের উল্লেখ নেই। সীতারাম ফিরে যাবার পর শুধু এই উদ্দেশ্যেই ওঁর ডায়েরি আবার আমি পড়েছিলাম। মেয়েদের কোনো উল্লেখ নেই। সবাইকে ভুলে গিয়েছিলেন কি? মেয়েরাও বোধহয় বাপকে কোনো চিঠিপত্র দিত না।

স্ত্রীর প্রতি ওঁর যে ঘৃণা ছিল তারই ফল বোধহয় মেয়েদের ভুগতে হয়েছে। তাঁর নিজের সন্তানদের প্রতি আমার বন্ধুর এরকম উপেক্ষা আমারও ভালো লাগত না। কিন্তু এই উপেক্ষা বা ঘৃণার কারণ কি? কারণ নিশ্চয় বেশ বড় রকম হবে। তিনি যা করেছেন তা করবার প্রেরণা জুগিয়েছে। অতীত জীবনের স্মৃতি— যা তিনি ভুলে থাকতে চেয়েছিলেন। ছবি আঁকার পেছনেও এই একই কারণ। একটা কথা বারবার লেখার চেষ্টা দেখা যেত। তিনি ছবিগুলিতে যে ভাব প্রকাশ করতে চাইতেন, শিল্পী হিসেবে সে যোগ্যতা তাঁর ছিল না, তাই শুধু খেয়ালের বশে ছবি এঁকে গেছেন।

একদিন ওঁর ডায়েরি পড়বার সময় একটা উপমা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। "দুধ যেমন দুধের সঙ্গে মিশে যায় তেমনি জলের সঙ্গেও। দুধের সঙ্গে দুধ মিশলে ভালো, কিন্তু জল মিশলে দুধের গুণ কমে যায়, আর মিষ্টতাও। জলের পরিমাণ বেশি হ'লে দুধের শুধু রঙটাই থাকে।

"দই আর জলে মেশে না। দই টক জিনিষ। টক দইয়ের সঙ্গে টক দই ঠিক। এর সঙ্গে জল মেশালে ঠিক বোঝা যাবে; শেষ পর্যন্ত দই কেটে যাবে আর জল আলাদা দেখা যাবে।

"দুধ ও জল দুটোই হাড়িতে রাখা যেতে পারে। দুধের বদলে জলে যদি দই ঢেলে দেওয়া হয়? টক দই? তামার পাত্রে ঢাললে কি ওটা দই থাকবে? বিষ হয়ে যাবে। গরিব লোকের হাঁড়িতে ঢালা টক দই কিরকম, কেউ বুঝতে পারে না। বড় লোকের কাঁসার বাসনে ঢালা দইও কি, তা কেউ জানে না। তার বদলে তামার বাসন নিজের গুণ দইকে দিয়ে বিষিয়ে তোলে।"

পৃথিবীর কোন্ রূপ দেখে আমার বন্ধুর মনে এ কথা জেগেছিল? পাড়াপড়শীর দৃষ্টান্ত দেখে থাকবেন। এদের সঙ্গে নিজের পরিবারের হয়তো তুলনা করেছেন। গরিবের হাঁড়ির সঙ্গে বড়লোকের কাঁসার বাসনের তুলনা করে থাকবেন। তার জন্য নিজের দাম্পত্য-

জীবন দুধের সঙ্গে দুধ ছিল না, দুধের সঙ্গে জলও নয় বরং তামার হাঁড়িতে রাখা টক দই ছিল। বিষ ছাড়া তার আর কী পরিণতি হতে পারে? এই ভাবেই নিজেকে প্রকাশ করে থাকবেন। এক রকমের দুটো জিনিষ মিশে এক হতে পারে, কিন্তু পাত্রটা যদি তামার হয় তো সংসার ও সমাজের পক্ষে সেটা বিষ হয়ে দাঁড়ায়। দুধের সঙ্গে জল মিশালে দুধের গুণ কম হয়ে যাবে কিন্তু বিষে পরিণত হবে না। ক'জন স্বামী-স্ত্রী দুধে দুধের মতো হতে পেরেছেন? ওঁর মধ্যে একজন জল হলেও চলতে পারে, কারণ তাতেও দাম্পত্য জীবন টিকে যাবে। কিন্তু আমার বন্ধুর বেলা ওটা ছিল জল ও টক দইয়ের মিশ্রণ তাও তামার পাত্রে রাখা। তাই উনি সে বিষ থেকে মুক্তি পাবার জন্য বোম্বের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন।

সীতারাম হেগ্‌ড়েকে দেখেই বুঝেছিলাম সে তাঁদের বিষময় দাম্পত্য জীবনের ফল। তবে অন্য সন্তানও যে এমনি হবে কী করে বলি? ওদেরও আমার দেখতে ও জানতে হবে। তাই একদিন কুমটার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

কুমটা আমার গ্রাম থেকে দেড়শো মাইলের বেশি দূর হবে না। বাসে কয়েক ঘণ্টার পথ। কিন্তু আসলে তা নয়। কতবার বাসে ওঠা নামা, কতবার নৌকা করে নদী পার হওয়া, তারপর আবার বাসের অপেক্ষা করা। বারবার এরই পুনরাবৃত্তি, তাই আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যখন সেই গরমে হেন্নাবার নদী পার হয়ে শেষ বাসে চড়ছিলাম, তখন আমার চেহারাও সীতারাম হেগ্‌ড়ের মতো লাল হয়ে উঠল। আর তো মাত্র বারো মাইল পথ বাকী, সেটাই সান্ত্বনা। আদ্দিকালের ছ্যাকড়া বাস, যেন কত যুদ্ধে ঘায়েল হয়ে এসেছে—তায় আবার যাত্রীর গাদাগাদি। ওতেই চড়তে হ'ল। কর্কী গাঁ, হল্‌দীপুর পার হলাম, ধারেশ্বর এল বলে। তার পরেই কুমটা। ধারেশ্বরে হঠাৎ বাস থেমে গেল। ধারেশ্বর প্রাচীনকালের একটি তীর্থস্থান। এরপর বাস আর চলল না, শোনা গেল কলকব্জা কিছু বিকল হয়েছে। বাধ্য হয়ে যাত্রীরা নেমে পড়ল। দু'ঘণ্টার

আগে আর কোনো বাস নেই। মেরামত করতে কত সময় লাগবে জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল ওখান থেকে কুমটা কিংবা সিরসিতে খবর পাঠাতে হবে, তারপরই কিছু হতে পারে। তার মানে সেদিনের যাত্রা ঐ পর্যন্তই।

তখন দুপুর দুটো। রোদের প্রচণ্ড তাপ। দু-একজন সহযাত্রী হাঁটতে আরম্ভ করলেন। আমিও ঠিক করলাম এখন হাঁটাই শ্রেয়। এটাই ধারেশ্বর। আমার লিস্টের শীন এখানকারই লোক। একটা দোকানে গিয়ে চা ও চিঁড়ে ভাজা খেলাম। দোকানদার বেশ বৃদ্ধ। জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি বলতে পারেন, ধারেশ্বর শীন বলে কেউ এখানে থাকতেন?"

উনি বললেন, "এখনো আছেন। এখানে দশজন শীন আছেন," এই বলে নাম শোনাতে লাগলেন— "বেঠ ঠিমনেয় শীন, বেলিনমনেয় শীন, কেশরুগচ্ছে শীন ... ।"

এখনি যখন ঝেড়েপুছে এতজন শীন, না জানি আগে কতজন ছিল। তাই আবার বোঁচকা বগলে কুমটার পথ ধরলাম।

নয়

দুদিন ধরে রাস্তার ধুলো খেয়ে কুমটা পৌঁছুতে পৌঁছুতে আমি একেবারে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ওখানে পৌঁছে সবচেয়ে আগে কোথায় যাব কিছু ঠিক করা ছিল না। কুমটার কাছাকাছি এসেই পুরনো বন্ধুদের এক এক করে মনে পড়তে লাগল। প্রথমেই সীতারাম হেগ্‌গড়ের বাড়ি যাব না ঠিক করলাম। কারণ প্রথম স্টেপেই চালে ভুল ঠিক নয়। সঙ্গে সঙ্গেই আরেকজন সীতারামকে মনে পড়ল, সে অবশ্য হেগগড়ে নয়। গাঁয়ে ঢোকার পর ওর বাড়িটাই প্রথম পড়ে। অনেকদিনের বন্ধু বলে ওখানেই গেলাম। "বাড়িতে কে আছেন?" ডাকতেই উনি বেরিয়ে এলেন।

"আরে, কারন্তবাবু যে, আসুন ... আসুন" বলে অভ্যর্থনা করলেন। আমার জন্য খাবার জল আনালেন। কেন এসেছি, কোনো কৌতূহল প্রকাশ না করে জিজ্ঞাসা করলেন, "দু-একদিন থাকবেন তো ?"

বললাম, "দু-একদিন কেন, চার-পাঁচ দিনও থাকতে পারি।"

"তা হলে তো খুবই ভালো।"

আমি বেড়াতে ভালোবাসি তা ওঁর জানা, তাই ভাবলেন নিশ্চয় কোনো কাজে এসেছি, শুধু শুধু আর আসব কেন ? তাই আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। সীতারামের সম্বন্ধে আমিও ওঁকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। কেননা আমি পুলিশের দারোগা হয়ে তদন্ত করতে তো আসি নি। এখানে আরও দু-চারজন বন্ধু আছেন। তাঁদের বাড়ি গিয়ে, ওঁদের কুশল প্রশ্ন করে, কথায় কথায় কিছু বের করতে চেষ্টা করতে হবে।

প্রথমদিন সভাবন্তের বাড়িতেই থাকলাম। তখন স্নানান্তে ঘুমের প্রয়োজন ছিল। ওঁরা খুব যত্নসহকারে আমাকে খাওয়ালো, খেয়েদেয়ে খুব আরামে ঘুমোলাম। সকালে জলখাবার পর আরেক-জন বন্ধুর বাড়ি গেলাম। যে রাস্তা দিয়ে ওঁর বাড়ি গেলাম সেই রাস্তায় চোচ্চলমনেদের দোকান ছিল। সামনে বারান্দা, তারপর দরজা, উঠোন পেরিয়ে দোকান ঘর। বাইরে যে 'সাইনবোর্ড' ছিল সেটা খুব ভালো করে দেখে বন্ধু মুণ্ডেশ্বর উকিলের বাড়ি পৌঁছুলাম। ওকালতিতে ওঁর বিশেষ পশার ছিল না। প্রায় অবসরপ্রাপ্ত উকিল বলা চলে। এখন ওঁকে শুধু নমস্কার করে চলে আসব। উনি আমার বেশ জানাশোনা। তা ছাড়া এখানকার একজন গণমান্য ব্যক্তিও বটে। ভাবলাম যশবন্তবাবুর আত্মীয়রা আমার বন্ধুর সম্বন্ধে অনেকরকম টিপ্পনী কাটবে, তার চেয়ে নিরপেক্ষ অনাত্মীয়ের কাছে খবর নেওয়া ভালো। তাই মুণ্ডেশ্বরকে "এখন তো আপনি কোর্টে যাবেন, সন্ধ্যাবেলা আবার আসব," বলে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে ফিরে এলাম।

'হোন্নগচ্ছে' এখান থেকে তিন মাইল দূরে। সেখানে যাবার জন্য

রওনা হলাম। গ্রামটা একবার শুধু রাত্রিবেলায় দেখেছিলাম। আন্দাজে একটা রাস্তা ধরে দু-পাশে খালি ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গ্রাম দেখতে দেখতে হাটতে লাগলাম। দু-মাইল যাবার পর চোদ্দ বছর বয়স্ক একটি ছেলেকে. কাঁধে বই খাতা চাপিয়ে স্কুল যেতে দেখলাম। অনিশ্চিত ঘোরাফেরা না করে বাড়িটা কোন্‌খানে জানবার জন্য, ছেলেটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "হোন্যগচ্ছে মঞ্জইযার বাড়ির রাস্তা কোন্‌টা ?"

"এই তো হোন্যগচ্ছে মঞ্জইয়ার বাড়ি। সে তো আমাদের বাড়ি। তবে মঞ্জইয়া নামের আর একজনও আছেন।"

ছেলেটি সে বাড়ির রাস্তা বাৎলে দিল, কোন্ একটা তাল গাছ, ডুমুর গাছ, তারপর কী আছে, সব বলে যেতে লাগল।—আমি সে সব কিছুই ধরতে পারি নি, গাঁয়ে তো কত তালগাছ, ডুমুর গাছ আছে। তাই জিজ্ঞাসা করলাম. "বাড়িটা দেখিয়ে দেবে ? তবে তোমার স্কুলের সময় হয়ে গেছে, না ? তা হলে থাক্।"

"আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।" বলে ছেলেটি লম্বা লম্বা পা ফেলতে আরম্ভ করল। ওর পিছনে আমিও চললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের বাড়ি কত দূরে ?"

"এই দু-এক ফার্লং।"

"তোমাদের বাড়িতে কে কে আছেন ?"

"মা, বাবা, আর দুটি ছোট ভাই।"

"ছোট ভাইরা স্কুলে যায় না ?"

"হ্যাঁ, তারা ছোট স্কুলে যায়।"

"আর তুমি ?"

"গির হাই স্কুলে যাই।"

"তা হলে দুপুরে খেতে আসতে তো অনেক হাঁটতে হয় ?"

"দূর বলেই আর আসি না।"

"স্কুলেই থাক ? খাও কোথায় ?"

"খাই না," সে বলল, আমারও তখন ওর শীর্ণ চেহারার দিকে দৃষ্টি পড়ল। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

"মার্কেটের কাছে তোমার কোনো আত্মীয় বা বন্ধু নেই, যেখানে একবেলা খেতে পার?"

"আছে। তবে ওদের ওখানে আমি যাই না।"

"ওরা গরিব?"

"না, ওরা খুব বড়লোক। আমার মামার বাড়ি। ওঁর দোকান ও বাড়ি দুটোই মার্কেটে। আমাদের মধ্যে বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই।"

"ওঁর নাম?"

"চোচ্চলমনে।"

"তুমি ওঁর কে?"

"বোনের ছেলে।"

"তোমার বাবার নাম মঞ্জুইয়া না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি কোন্ গাঁয়ের? আপনাকে দেখলেই অন্য গাঁয়ের লোক বলে বোঝা যায়।"

"হ্যাঁ, আমি দূরের গাঁয়ের। ব্যাঙ্গালোরের দিকের লোক।"

"আপনি অতদূর থেকে আসছেন?" তারপর আমাকে দেখাল, "ঐ যে তালগাছ দেখছেন, ওর সামনের বাড়িটাই কেতরকী মঙ্গইয়া বাবুর।"

"কিন্তু তুমি— তোমার নাম কি?" আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম।

"যশবন্ত" বলেই সে তাড়াতাড়ি চলল।

"দাঁড়াও যশবন্ত, আর-একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।"

ছেলেটি আবার ফিরে এসে দাঁড়াল, "কী চান আপনি? আমার স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে যে···।"

"তা ঠিক বলেছ। ঘণ্টা পড়ার আগেই স্কুলে পৌঁছে যাওয়া উচিত, না? আমার জন্য তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার দাদামশাই আমার বন্ধু ছিলেন। তাই বলতে আবার তোমায় ডাকলাম।"

"কে ? চোচ্চলমনের বড় হেগ্‌গড়ে মশাই ?"···তা হলে আপনি কে ?"

"আমার নাম শিবরাম কারন্ত।"

"তা হলে আমাদের বাড়ি চলুন। আমার বাবাকেই তো আপনি প্রত্যেক মাসে মনি-অর্ডার করেন, না ?" তারপর আমার হাত ধরে বলল, "কেভরকার বাড়ি আর-এক দিন যাবেন। আমার মা, বাবা আপনাকে দেখলে খুব খুশি হবেন।" বলে আমায় টানতে লাগল। মঞ্জইয়ার কাঁপা হাতের লেখা দেখে আমি তাঁকে বৃদ্ধ বলেই ধরে নিয়েছিলাম। সেইজন্য বুড়ো মঞ্জইয়ার বাড়ি যেতে চেয়েছিলাম। এই ছেলেটির বাবা আমার মঞ্জইয়া হতেই পারেন না তাই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু যখন বুঝলাম, এই মঞ্জইয়াই সুব্বরাবুর জামাই, এই ছেলেটির বাপ, তখন অসমঞ্জসে পড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ছেলেটি তখন জিজ্ঞাসা করল, "কি হল ?"

"তোমার বাবার হাতের সই দেখে আমি ওঁকে বৃদ্ধ মনে করেছিলাম। তাই তো এখানে না এসে আমি অন্য মঞ্জইয়ার বাড়ি যেতে চেয়েছিলাম।"

ছেলেটি নম্রভাবে বলল, "আগে আপনার নাম জিজ্ঞেস করি নি তাই গণ্ডগোল হল। আসুন না, আমার বাবার কাছে যাই। উনি বাতে ভুগছেন। প্রায় বছর হতে চলল বিছানায় পড়ে।" সে আমায় প্রায় টেনেই আধ মাইল পথ বেয়ে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। বাড়ি ঢুকেই একপাশে বইখাতা রেখে, দৌড়ে ভেতরে চলে গেল, মা-বাবাকে আমার আসার খবর দিতে। তারপর আমার হাত-পা ধোবার জন্য একঘটি জল এনে মাদুর পাততে লাগল। ইতিমধ্যে একটি রোগামত মহিলা এলেন, দেখলেই গরিব বোঝা যায়, চেহারায় বেশ লক্ষ্মীশ্রী রয়েছে। কোনো সঙ্কোচ না করেই এগিয়ে এসে আমায় নমস্কার করলেন। তারপর বললেন, "আমার বাবার পুণ্যে আজ এ বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। আপনারা সব ভালো আছেন আশা করি ?···ঐ যে আমার স্বামী শুয়ে আছেন।" তারপর

যশবন্তকে বললেন, "যশু, তুমি আর আজ স্কুলে যেয়ো না, তোমার ছোট ভাইরা আগেই চলে গেছে।"

"হ্যাঁ মা, আজ যখন উনি এসেছেন···আমি কি যেতে পারি ? তুমি ভেতরে যাও, আমি এখানে আছি। কিছু জলখাবার করো। আপনি জলখাবার পর বাবার সঙ্গে দেখা করবেন, না আগেই ?"

"জল খেয়ে নিতে দাও বাছা," বলে ওর মা ভেতরে চলে গেলেন। ছেলেটিকে কাছে বসিয়ে ওর মা, ভাই, জমিজমা, সব বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। এতদিন ধরে এদের বাড়ি না আসতে পারার জন্য অনুশোচনা হতে লাগল।

ছেলেটি আমায় জিজ্ঞাসা করল, "আমার দাদামশাই আপনার খুব চেনা লোক ছিলেন বুঝি ? উনি বোম্বেতে মারা গেছেন, না ? সে সময় ওঁর কাছে কেউ ছিল ? সাতারাম হেগ্‌ড়ে বোধহয় গিয়ে থাকবেন।"

আমি বললাম, "পরে তোমায় সব বলব। মাত্র তিনটে ছোট ছোট ক্ষেতের আয়ে তোমাদের খরচ চলে যায় ?"

"আর তো উপায় নেই। মা বলেন, আগে অনেক ছিল কিন্তু ধার শোধ দিতে সব গেছে। এটুকু আমার বাবা কোনও মতে বাঁচিয়ে নিয়েছিলেন।"

এর মধ্যে যশবন্তর মা একটু জলো দুধ ও চালের আটার নোন্তা হালুয়া খেতে দিলেন। বললেন, "আমরা গরিব, আমাদের চা খাওয়ার অভ্যাস নেই। এটা সুজির উধিটুও নয়, চালের সুজি। সুদামার আতিথ্য স্বীকার করুন।"

"এ আপনি কী বলছেন মা ? অতিথি সৎকারে আন্তরিকতা চাই, তার জন্য চালের সুজি বা গমের সুজি কি-বা চা-কফির দরকার হয় না।"

আমার খাবার সময় ছেলেটিকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে বললাম, "তুমিও একটু খাও না ?"

"আমার তো আগেই কাঞ্জিও খাওয়া হয়ে গেছে।"

তবুও আমি জোর করে একটু খাওয়ালাম।

তারপর মা ও ছেলের সঙ্গে একটা ঘরে গেলাম। বসবার জন্য পিঁড়ি দিল। কন্দিলের প্রদীপ জ্বালিয়ে মঞ্জইয়ার পাশের জানলাটা খুললেন। আমি বারণ করা সত্ত্বেও উনি ধীরে ধীরে উঠে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলেন। আমি ওঁর সামনে গিয়ে বসলাম। উনিই কথা আরম্ভ করলেন :

"একেবারে উঠি না তা তো নয়। স্নান ও পায়খানার জন্য উঠতেই হয়, তবে কিছু না ধরে যেতে পারি না। এ রোগটার কোনো নাম নেই। কেউ কেউ এটাকে বাত বলে। তবে বাতের সব ওষুধই তো করে দেখলাম, কোনো লাভ হয় নি। যতদিন ভোগ আছে ভুগতেই হবে।...এ ছাড়া আর কোনো কষ্ট নেই। যশু আমার বড় হলে আর কোনো ভাবনা নেই।"

"দাদামশাই-এর নামেই নাতির নাম ?"

"আপনি আমার শ্বশুরমশাই-এর কথা লিখেছিলেন...। আমার এই অবস্থা বলেই উত্তর দিতে পারি নি। অবশ্য কাউকে দিয়ে লেখাতে পারতাম...। শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে আপনার অনেকদিনের জানাশোনা ?"

আমাদের আলাপ কি করে হয়েছিল সব ওঁকে বললাম। তারপর যশবন্তবাবুকে যিনি মানুষ করেছিলেন সেই মায়ের কথাও শোনালাম। ওঁরা সবাই খুব আগ্রহসহকারে শ্রদ্ধাভিভূত হয়ে আমার কথা শুনছিলেন। পার্বতাম্মার অন্তিম সময়ের বর্ণনা শুনে সকলের চক্ষু সজল হয়ে উঠল।

"আপনি ভাগ্যবান, সে পুণ্যবতী নারীর দর্শন করে এসেছেন। আমরা ওঁকে কখনো দেখি নি। আপনি খুব ভালো কাজ করেছেন, আমার শ্বশুরমহাশয়ের নাম অমর হবে...। দেখুন না, আমার শ্বশুরমশাই ওঁর স্ত্রী ও সন্তানদের, বিশেষ করে স্ত্রীপুত্রের যেন শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন সকলে ওঁর নিন্দা করে।...তবে হ্যাঁ, উনি এই মেয়েটিকে একটু বেশি ভালোবাসতেন। আমার যখন বিয়ে

হয়েছিল আমরা বেশ অবস্থাপন্ন ছিলাম। আমাদের বৃহৎ সংসার ছিল। বিষয়সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেলে আমাদের ধার শোধ দিতেই সব গেল। আমার বাবার অনেক ধার ছিল। তখন শ্বশুরমশাই আমায় সাহায্য করে আমাদের বাঁচিয়েছিলেন। মামলা-মোকদ্দমায়ও অনেক খরচ করেছিলেন, তবে কোনো ফল হয় নি। ওঁর সাধ্যমত উনি সবই করেছিলেন কিন্তু ভাগ্যকে এড়াবে কে? এখন যেটুকু দেখছেন যদি বলি সেটা ওঁরই দেওয়া তো বাড়িয়ে বলা হবে না। সীতারাম এ সহ্য করতে পারত না। শ্বশুরমশাইয়ের জীবদ্দশায় আমাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কয়েক বছর পরে তো শ্বশুরমশাই কুমটা ছেড়েও চলে গেলেন। আমরা জানতাম না উনি কোথায় আছেন, না জানি কতকষ্ট ওঁকে ভুগতে হয়েছে। কেন যে এমন করলেন?"

কথা বলতে বলতে মঞ্জাইয়া ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওঁর আর-সব বোনেরা কোথায় থাকেন, তাঁরা ওঁর থেকে ছোট না বড় ইত্যাদি।"

ওঁর স্ত্রী বললেন, "আমরা বাবার চারটি সন্তান। সবচেয়ে বড় সীতারাম, কুমটায় দোকান করেছে। আমার মা ওর সঙ্গেই থাকেন।"

"বাপের বাড়ি এত কাছে, নিশ্চয় আপনার বেশি যাওয়া-আসা আছে?"

"যতদিন আমাদের অবস্থা ভালো ছিল, আর বাবাও ছিলেন, ততদিন আসা-যাওয়া ছিল। মেয়েদের মধ্যে আমিই বড়। আমার মা ও ভাইয়ের স্বভাব একেবারে আলাদা। ওঁদের কাছে টাকাই সব।"

আমি হেসে ফেললাম।

"এটা বলা আমার উচিত হয় নি, না? আমাদের কষ্টের সময় ওঁরা কোনো সাহায্য করেন নি। তবুও এভাবে অনুযোগ করা ঠিক নয়। যাক যখন বলেই ফেলেছি তখন আর কি হবে। ভুল তো হয়েই গেছে। আমার স্বামী ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ করতে বারণ করেন। কি জানি, কেন বলে ফেললাম?"

মঞ্জাইয়া বললেন, "জলজা, এবার তুমি রান্নার ব্যবস্থা করো, উনি এখানেই খাবেন আজ।"

আমি বললাম, "না, না, কুমটায় সভাবন্তের ওখানে খাব বলে এসেছি। একটু দেরি হয়ে গেলে কোনো ক্ষতি নেই।"

"উনি ভাগ্যবান। সীতারাম, সভাবন্তকে ও তাঁর বড় ভাইকে বেশ ভালো ভাবে জানে। বড় ভাই মারা গেছেন। আজ যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে যাঁরা গেছেন তাঁরাই ভাগ্যবান।"

"জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েই আপনি এ কথা বলছেন। এ সংসারে কে না কষ্ট পায়? কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না, জানেন তো? এ নিয়ে অহেতুক মন খারাপ করবেন না।"

"তা ঠিক বলেছেন। তবে 'মরে গেলে মানুষ ভাগ্যবান' এ ধরনের কথা ছেলেমানুষদের সামনে বললে, তারা ভাবতে পারে তাদের জন্ম বৃথা।"

সঙ্গে সঙ্গেই যশবন্ত বলে উঠল, "বাবা, আপনি তো বলতেন, 'কষ্টের শেষ নেই' এ ভাবা ভুল। কষ্ট কখন-সখন হয় বটে কিন্তু তার লাঘব হতেও দেরি লাগে না।"

"হ্যাঁ বাবা, ভগবানের কৃপায় এতদিন চলেছে। এবার তুমি বড় হয়ে উপার্জন করলেই আমরা সুখের মুখ দেখব।"

আমিও তাতে সায় দিয়ে বললাম, "আপনার ছেলে আপনার চেয়ে ভাগ্যবান। যশবন্ত, তুমি বড় হলে নিজের মা-বাপকে দেখবে তো?"

ও বলল, "তবে ছেলে হয়েছি কিসের জন্য?"

"তা হলে এখন আসি" বলে আমি উঠে পড়লাম। "আরও দুদিন কুমটায় আছি, আবার আসব।"

"না, না, তা কি হয়?" বলে উনি যশুকে ডাকলেন।

ছেলেও বলল, "আমি যাচ্ছি বাবা, এক্ষুণি দৌড়ে গিয়ে সভাবন্ত-বাবুর ওখানে বলে আসছি।"

আমার কোনো কথা না শুনেই ও ছুটে বেরিয়ে গেল। ওকে দেখে আমি ভাবলাম, যশবন্তবাবুও ছেলেবেলায় এরকম তুখোড় ছিলেন

নিশ্চয়। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার স্ত্রীর নাম কি জলজা ?"

উনি হেসে বললেন, "আমার শ্বশুরমশাই মেয়েদের চোখ দেখে নাম রেখেছিলেন জলজাক্ষী, বনজাক্ষী আর মীনাক্ষী।"

আমিও মৃদু হেসে বললাম, "আরও মেয়ে হলে বোধহয় কামাক্ষী, হরিণাক্ষী নাম দিতেন।" তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার শালীরা কোথায় থাকেন ?"

"বনজার বাড়ি দক্ষিণে কেক্কার গ্রামের কাছে। খুব বড়লোকের ঘরে বিয়ে হয়েছে। অনেক সম্পত্তি আছে, ওদের স্বচ্ছন্দে দিন কেটে যায়। আর-এক জনের বিয়ে হয়েছে 'যান' গাঁয়ে, একেবারে অজ পাড়াগাঁ। যতদূর জানি সেও বড় ঘরে পড়েছে। অর্থকষ্ট নেই। ওদের দুজনের সম্বন্ধ আমার শাশুড়াই করেছিলেন। কিন্তু আমাকে শ্বশুরমশাই নিজের কন্যার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তাই শাশুড়ীর কাছে কথাও অনেক শুনতে হয়েছে। মানে, শাশুড়ীর জিত হল। আমি ম্যাট্রিক পাস করে মহকুমায় চাকরি পেলাম। শ্বশুরমশাই ভেবেছিলেন, লেখাপড়া জানা, সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, করে খেতে পারবে। শাশুড়ী মেয়েদের অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে দিতে চাইতেন। যাদের সম্পত্তি কম ও ভাগীদার বেশি তেমন ঘরে মেয়ে দিতে রাজী ছিলেন না। উনি নিজেও যে বড় ঘর থেকে এসে-ছিলেন। কিন্তু বাপের বাড়ি থেকে উনি কিছুই পান নি। উনি অন্য ছেলেমেয়েদের কিছু দিয়েছেন কিনা, আমার জানা নাই, তবে আমাদের কিছু দেন নি।"

"কেনই বা দেবেন ?" বলতে বলতে জলজাক্ষী ভেতরে এলেন। "তেলা মাথায় তেল ঢালাই পৃথিবীর নিয়ম। যাদের কিছু নেই, তাদের কেন দিতে যাবেন ?"

মণ্ডইয়া বললেন, "যে সন্তান মানুষ হয়ে গেছে, তার আর মা-বাপের মুখ চেয়ে বসে থাকা শোভা পায় না। নিজের পায়ে

দাঁড়ানো উচিত। এই অসুখটাই আমার কাল হয়েছে, নইলে এরকম অভিযোগ করতে হত না।"

এরপর আবার যশবন্তবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমিও এই সুযোগে ওঁর শ্বশুরের উইল অনুযায়ী কি ভাবে টাকা খরচ করতে হবে ওঁকে বললাম। শুনে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের সীতারাম কি এ-সব জানে?"

"হ্যাঁ, এরপর ও বোম্বে গিয়েছিল। আপনার শ্বশুরের নামে ব্যাঙ্কে যে টাকাটা আছে, সেটা ওই পাবে। এতদিনে পেয়ে গিয়েও থাকবে।"

"ওর বাড়ি আপনি যান নি?"

"এখন পর্যন্ত যাই নি, তবে যাবার ইচ্ছা আছে। ফেরবার আগে যাব একবার।"

"আমার শালাকে আপনি দেখেছেন, না?"

"হ্যাঁ, একবার আমার বাড়ি এসেছিলেন। চিঠিও দিয়েছিলেন। চিঠির জবাব আপনি ছাড়া সকলে দিয়েছেন।"

"সত্যি ভারি ভুল হয়ে গেছে আমার। আপনি কিছু মনে করেন নি তো?"

"না, না, সে কি কথা? আপনার হাতের লেখা দেখেই তো বোঝা গিয়েছিল আপনি অসুস্থ, তাই চিঠি লিখতে পারেন নি।"

শ্বশুরের বিষয়-আশয়ে মঞ্জুইয়ার কোনো আসক্তি দেখা গেল না।

"আমার শ্বশুরমশাই শুনেছি আগেও এভাবে টাকাকড়ি বিলিয়ে দিয়েছেন। সেটা অবশ্য আমার শাশুড়ীর থেকে শোনা, আমার মত নয়। আমার শ্বশুরের প্রকৃতিই ছিল ভিন্ন। কারুর কষ্টের কথা শুনলেই তিনি বিগলিত হয়ে অর্থ সাহায্য করতেন। এরকম স্বভাব ছিল বলেই আপনাকে ভালো কাজে টাকা খরচ করতে বলেছেন। এমন সুবুদ্ধি আর ক'জনের থাকে?"

আমরা সকলেই চাই আমাদের সম্পত্তির অধিকারী আমাদের

নিজের সন্তানই হোক্। কিন্তু মঞ্জইয়াকে এর ব্যতিক্রম মনে হল। সীতারামের বিপরীত। বড় ভালো লাগল।

সেদিন দুপুরে উনি আমার পাশে বসে খেলেন। আমি যদিও ওঁকে নড়াচড়া করতে বার বার মানা করেছিলাম। যশবন্ত ওঁর পাশেই বসেছিল। যখন ভাত বাড়া হচ্ছিল তখন ওর ছোট ভাই দুটিও এসে গেল। হাত-পা ধুয়ে ওরাও বড় ভাইয়ের দেখাদেখি নিজের নিজের কাঁসার বাটি নিয়ে লাইনে বসে পড়ল। তিনটি ছেলেই দেখতে মায়ের মতো। চেহারা থেকেই এদের দারিদ্র্য প্রকট হয়। পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না যারা তাদের চেহারা আর এর থেকে কী ভালো হবে?

খাবার সময় যশবন্তকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার ছোট ভাইদের নাম কি?"

সে বলল, "জয়বন্ত আর ভগবন্ত।"

আমি ভগবন্তকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভগু, তোমার বড় দাদামশায়ের নাম কী ছিল জানো?" আমি অপরিচিত বলে ও আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মঞ্জইয়া জিজ্ঞাসা করলেন, "কার কথা বলছেন?"

"আপনার শ্বশুরের বাবার নামও ভগবন্তৈয়া ছিল।"

"তাই নাকি? শুনলে ভগু, তোমার বড় দাদামশায়ের নামও ভগবন্ত ছিল।"

"বাবা, ইনি কে? তুমিও যে উঠে এসে এঁর সঙ্গে বসে খাচ্ছ?"

"ইনি অনেক দূর থেকে এসেছেন বাবা। এমন লোকের দর্শন কি রোজ রোজ পাওয়া যায়? তাই আমি উঠে এসেছি।"

তখন আমি ওকেই বললাম, "আমি কেন এসেছি তুমি জানো?"

"না, জানি না।"

"বলব, কেন এসেছি?"

"বলুন-না।"

"তোরগাচ্ছাতে মঞ্জইয়া নামের একজন ভদ্রলোক আছেন।"

"তাঁকে দেখতে?"

"না, ওঁর ছেলেকে।"

"যশবন্তকে?"

"না।"

"জয়ন্তকে?"

"না।"

"তা হলে?"

"হনুমন্তকে। কিন্তু আমার আসার আগেই হনুমন্ত ভগবন্ত হয়ে গেছে।"

সকলে হেসে উঠল। তখন ছোটটি বলল, "আপনি ঠাট্টা করছেন, বুঝেছি। বাবাকে দেখতে এসেছেন।"

"না, না, ভগবন্তকে আমাদের গাঁয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"আমি যাব না।"

"তোমাকে না নিয়ে নড়বই না। তোমার বাবাও বলেছেন তোমাকে পাঠাবেন। ওঁর যশুকে চাই, তোমার মার চাই জয়ন্তকে। আমি বললাম, ভগবন্তকে তা হলে আমায় দিয়ে দিন। উনি তাতে রাজী।"

ভগবন্ত দশ বছরের বালক। আমার কথা শুনে মুখ ভার করল, চোখে জলও এসে গেল। ওর মা সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের খেতে দিচ্ছিলেন, ছেলের কাঁদো কাঁদো মুখ দেখে বললেন, "ভগু, তুমি এটুকুও বুঝছ না যে উনি ঠাট্টা করছেন, তোমাকে কি আমি কম ভালোবাসি?"

আমিও হেসে ফেললাম।

তখন ভগবন্ত শান্ত হল।

খাওয়ার পর ওরা সবাই হেডমাস্টারের অনুমতি নিয়ে স্কুল থেকে চলে এল।

ওদের মা যখন বললেন, "এঁকে এবার একটু ঘুমোতে দাও

তোমরা," তখন ভগু বলে উঠল, "চুপ করো। দাদা বলেছে উনি গল্প লেখেন। আমরা ওঁর কাছে গল্প শুনব।"

আমি ওদের কয়েকটা বাঁদরের সত্য ঘটনা শোনালাম। বাঁদর-ছানার মতো উৎসুক হয়ে ভগবন্ত শুনছিল। গল্প শেষ হবার পর আমায় অনুমতি দিল, "এবার আপনি শুতে পারেন।"

আমিও একটু ঘুমিয়ে নিলাম। তারপর উঠে হাতমুখ ধুতেই চা এসে গেল। আমি বাড়ির গৃহিণীকে বললাম, "আপনি বলেছিলেন না, চা নেই? আমার জন্য আনালেন কেন? এক বেলা চা, কফি, না খেলে কি হত শুনি?"

"যাঁদের চা খাওয়া অভ্যাস, শুনেছি একবেলা না খেলেই তাঁদের মাথাব্যথা করে।"

"সকালে যশবন্তর বাড়ি চা খেয়ে এসেছি।"

"তাতে কি হয়েছে?"

"চা যখন এনেছেন তখন নিশ্চয় খাব," বলে চা খেলাম। তারপর মঞ্জুইয়ার কাছে গেলাম কথা বলতে। উনি আবার বিছানায় উঠে বসলেন।

"একটানা এতক্ষণ বসলে আবার পিঠে ব্যথা হবে না?" বললাম।

উনি বললেন, "না।"

"রোজ যদি আপনি এরকম বসতে পারেন, ব্যথা হবে না, তা হলে অসুখ সত্যিই সেরে যাবে। মনে বিশ্বাস থাকা চাই। কখনো কখনো তো মনের জন্যই শরীর অসুস্থ হয়— ডাক্তাররা বলেন।"

"আরম্ভ তো এইভাবেই হয়েছে। ভাগাভাগির পর যখন আর কিছুই রইল না আমাদের, আর তার উপর এত দেনা, তখনই আমার অবস্থা কাহিল হ'ল। সেই যে বিছানা নিলাম, আজ পর্যন্ত ভুগেই চলেছি।"

ওঁর অবস্থা সত্যি করুণ। সেদিন যদি ওঁর বন্ধুবান্ধব বা স্ত্রী ওঁর মনে বল দিতে পারতেন তো উনি সামলে নিতেন। তার বদলে শ্বশুরের দয়া ও সাহায্যই ওঁকে অসহায় করে তুলেছে। তা কি ভালো হয়েছে?

তবে শুধু সান্ত্বনা দিয়ে কি রোগ সারানো যায়? তাই বললাম, "গাঁয়ে ফেরার পর একটা ওষুধ পাঠাব। অনেক বাতের রুগী এই ওষুধে সেরে গেছেন। প্রতিদিন ওটা মালিশ করে তারপর আস্তে আস্তে গা টেপাতে হবে। ভগবানের নাম নেবেন আর বলবেন, 'আর কি, এই তো ভালো হয়ে গেলাম।' বাস্, আপনি আরোগ্য হয়ে যাবেন। দৌড়ঝাঁপ নাই-বা করতে পারলেন, অন্তত বাড়ির মধ্যে চলাফেরা নিশ্চয় করতে পারবেন।"

"সত্যি?"

"কয়েকজন এই ওষুধে সেরে গেছেন। তাই তো আপনাকে বলছি। তবে আমি নিজে বৈদ্যটৈদ্য কিছুই নই।"

"আপনার কথায় আমার আশা হচ্ছে।"

"আশাই আপনাকে সারিয়ে তুলবে।"

"হে ভগবান, তাই হোক্।"

তারপর আমরা অন্য বিষয় আলোচনা করতে লাগলাম। যখন ছেলেরা ও তাদের মা ওখানে ছিলেন না, তখন ওঁকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, "কোডকণীটা কোন্ জায়গা? আপনাকে যেমন প্রতিমাসে পঁচিশ টাকা পাঠাই, সেরকম কোডকণীতেও একজন ভদ্রলোককে আপনার শ্বশুরমশাই টাকা পাঠাতে বলেছিলেন।"

"কোডকণী তো এখানে তিনটে আছে। কোডকণীতে কাকে পাঠান?"

"ধারেশ্বর শীন...।"

শুনে উনি মুচকি হেসে, এদিক-ওদিক দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেলেরা এখানে কেউ নেই তো?"

আমি বললাম, "নেই।"

"আমার শ্বশুরমশাইও ভারি অদ্ভুত ছিলেন···অবশ্য তাতে কোনো দোষ নেই। শীন ওঁর ছেলে···।"

"ছেলে? মানে···?"

"বিশেষ কিছু জানি না। শ্বশুরমশাইয়ের রক্ষিতার ছেলে।

মানে···আমার শ্বশুরের একজন বিবাহিতা স্ত্রী আছেন তা ঠিক। কিন্তু উনি কি তাঁকে নিয়ে সুখী হতে পেরেছিলেন? তাই উনি একজন গায়িকা ধারেশ্বর সরসীকে রেখেছিলেন। শুনেছি ওঁর ক'টি ছেলেও আছে। শীন খুব ভালো তবলা বাজায়। আমার বিয়ের সময় গাঁয়ে খুব জোর গুজব ছিল। তাই বোধহয় শ্বশুর-শাশুড়ীর মধ্যে আরও মন কষাকষির সৃষ্টি হয়েছিল। তা ছাড়া আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে তো রক্ষিতা রাখার রেওয়াজ ছিল, নয় তো···।"

"মানে?"

"কেন? আমাদের পূর্বপুরুষরা কি এরকম করতেন না? কিন্তু তাঁরা গণ্ডায় গণ্ডায় রাখতেন না। তারও একটা নিয়ম ছিল। শুধু তাই নয়, কেউ কেউ তো ওদের নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর মতোই দেখতেন আর সেরকম সম্মানও দিতেন। আমি যতদূর জানি ধারেশ্বর সরসা সেইরকম ছিলেন। ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজনের সামনে শাশুড়ী ওঁকে সরসীকে নিয়ে বিদ্রূপ করতেন। তখন আমার শালাও যুবক, সেও সব বুঝতে পারত। এ-সব ব্যাপারই তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলত। মা-ছেলে সবাই ওঁর বিপক্ষে ছিল। আপনি জানেন, আমার শ্বশুরমশাই কি শাশুড়ীকে কম গহনা দিয়েছেন?"

"—কাকে? ধারেশ্বর··"

"না ভাই, ওকে কা দিয়েছেন তা তো জানা নেই। দিলেও নিজের ধর্মপত্নীর অধিকার খর্ব না করে দিয়ে থাকবেন। আমি আমার শাশুড়ীর কথা বলছি। ওঁকে উনি যথেষ্ট দিয়েছেন। আর যত উনি দিয়েছেন তার দু-গুণ শাশুড়ী নিজে হারিয়েছেন। শ্বশুর যদি গোঁ ধরতেন, উনি কাণাকড়িও পেতেন না। তবে উনি তেমন ছিলেন না। সব ওঁরই উপার্জন ছিল। শ্বশুরমশাই যখন চোচ্চল-মনে থেকে আসেন তখন শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছু টাকা ধার করেন—সে-সব সুদ সমেত আগেই শোধ দিয়ে দেন।

"প্রথম দিকে সুপুরীর ব্যবসায় যত লোকসান হয়েছিল, পরে তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয়। ব্যবসায় তো লাভ লোকসান দু-ই আছে। লোকসান হলেই যে তোমাকে ধূলিসাৎ হতে হবে আর লাভ হলেই হাওয়ায় উড়তে হবে তা তো নয়। কিন্তু কেনাবেচার ব্যাপারে উনি বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই করেই তো লাখপতি হন।

"কুমটা ছেড়ে যাবার সময় কি কম টাকা রেখে গিয়েছিলেন? নিজে তো বিশেষ কিছু সঙ্গে নিয়ে যান নি।"

এর মধ্যে ভগবন্ত এসে পড়ল। আমরা চুপ করে গেলাম। কোডকণীর বিষয় কুমটা গিয়েই জেনে নেব ভেবে ওঁকে আর-কিছু না জিজ্ঞেস করে, ওঁর অনুমতি নিয়ে উঠলাম। বাড়ির গৃহিণীর সঙ্গেও দু-চারটে কথা বললাম। ওঁকেও বললাম, যে ওষুধের কথা বলেছি সেটা পাঠিয়ে দেব। আবার বললাম, "দেখবেন মা, ছেলেদের পড়াশুনা যেন বন্ধ না হয়। পড়াশুনা করে লায়েক হলে আপনাদেরই লাভ। ওদের পড়ার খরচ যশবন্তবাবুর গচ্ছিত টাকা থেকে দিতে পারব···। মঞ্জইয়াবাবুকে শরীর সারাবার জন্য দুধ দই একটু বেশি খেতে দেবেন। কোনো ভাবনা নেই। যশবন্তকে দিয়ে চিঠি লেখাবেন। আমায় বড় ভাইয়ের মতো মনে করবেন।"

বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ির সামনের ক্ষেত পর্যন্ত উনি ও যশবন্ত সঙ্গে এলেন। যশবন্ত আমায় বাজার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

এরপর কুমটা থেকে চলে যাবার আগে, যশবন্ত একবার এসে ওদের বাড়ি আবার নিয়ে গিয়েছিল।

দশ

সভাবন্ত বলল, "আপনি ওখানে গিয়ে খুব ভালো করেছেন। মঞ্জইয়ার অবস্থা তো দেখলেন। সম্ভব হ'লে, ওঁর শ্বশুরের টাকা থেকে

কিছু নিশ্চয় ওঁকে দেবেন। টাকার লোভ ওঁর নেই; তবে গ্রহের ফের। আছে তো তিন ছেলে, তবে সবাই নাবালক, আর নিজে তো একেবারে শয্যাশায়ী।"

"আর দুটি মেয়ের শ্বশুরবাড়ির অবস্থা কিরকম?"

"ওরা তো একপ্রকার বড় ঘরেই পড়েছে। ওদের জন্য ভাববেন না ··· সীতারামের সঙ্গে এখনো দেখা করেন নি? এই তো কাছেই ওদের বাড়ি।"

"আপনাদের মধ্যে কেমন সম্বন্ধ?"

"আপাত দৃষ্টিতে ভালোই, কিন্তু ভিতরের খবর অন্যরকম। ওর আচার-ব্যবহার, ধরন-ধারণ আমার পছন্দ নয়। ওর মনে জিলিপির প্যাঁচ। ও সবাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।"

কথাটা শুনে হেসে ফেললাম।

সভাবন্ধু জিজ্ঞাসা করল, "হাসলেন কেন?"

"ও সবাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বললেন শুনে। এ অভিজ্ঞতা আমারও আছে।"

"তাই নাকি? আপনি তা হলে ওকে দেখেছেন?"

"খোঁজখবর করে উনি আমার বাড়ি যান।" বলে সংক্ষেপে তার বিবরণ দিলাম। তারপর বললাম, "যখন এখানে এসেছি, ওঁর সঙ্গে দেখা তো করবই। উনি আমাকে উকিলের নোটিশ পাঠিয়েছেন।"

"ব্যাস এই? তার জন্য মামলা এতদূর গড়িয়েছে? তবে কেন যাচ্ছেন? আপনার আর কোনো কাজ নেই?"

"তাতে কী আসে যায়? আর যাই হোক, আমার বন্ধুর নিজের ছেলে তো? অন্তত ওর মাকে তো দেখব।"

"গিয়ে কোনো লাভও হবে না। যশবন্তবাবুর মৃত্যুতে কি ওঁর একফোঁটা দুঃখ হয়েছে? ওঁকে বাড়ি থেকে তাঁর স্ত্রীই তাড়িয়েছে। সীতারাম ও-মায়েরই ব্যাটা।"

"সংসারে এ-সব ঘটেই থাকে। বনাবনি ছিল না বুঝি?"

"কাদের মধ্যে? স্বামী-স্ত্রী না বাপ-ছেলের মধ্যে?"

"ছেলে সাবালক হলে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে বাপের সঙ্গে মনো-মালিন্য হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়।"

"কিন্তু এখানে কি যশবন্তবাবু বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে এসেছিলেন? উনি একেবারে রিক্তহস্ত আসেন। কুমটায় এসে নিজের উপার্জনে আবার সব করেন।

"উনি আমার থেকে দশ বছরের বড়। ধীর, স্থির। শ্বশুর-বাড়িতে যখন এলেন একেবারে নিঃস্ব। একজন ব্যবসায়ীর কাছে মুনশীর কাজ পেয়েছিলেন। বছর চারেক খুব পরিশ্রম করেন। কাজে দক্ষতা লাভ করার পর শ্বশুরের থেকে চার-পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়ে নিজের ব্যবসা ফাঁদলেন। তিন বছরের মধ্যে ধারও সব শোধ করে দেন এই তো শুনেছি। আসল কথা, ওঁর ভাগ্য ভালো ছিল। যখন থেকে নিজের বাড়ি করেছেন, তখন থেকেই ওঁর ভাগ্য খুলে গেছে। একাগ্রতা ছিল। অকারণ সময় নষ্ট করতেন না। অনেক ধন উপার্জন করলেন, কখনো অনর্থক খরচ করেন নি। আগের অবস্থা আমার জানা নেই, কিন্তু এটা জানি কুমটা আসার পর স্ত্রী ও ছেলের অর্থকষ্ট হয় নি। সাতাবামকে স্কুলে ভর্তি করলেন, মেয়েদের যথাসময়ে বিয়ে দিলেন।

"টাকা অযথা খরচ করেন নি। শুনেছি 'ঘাটে' যখন পৈতৃক বাড়িতে ছিলেন তখন অনেক টাকা উড়িয়ে দেন। কিন্তু এখানে উনি নিজেকে বেশ সংযমে রাখেন। প্রচুর অর্থ হওয়া সত্ত্বেও, সকলকে নির্বিচারে ধার আর দেন নি। ঘর-পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় না?"

হেসে বললাম, "শুনলাম ওঁর নাকি আর-একটা গুপ্ত ব্যাবসা ছিল?"

ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সভাবন্তু হেসে ফেলল। বলল, "ওহো এ তো সামান্য ব্যাপার, আমাদের এখানে বাঁদা ঘরে ঘরে বেওয়াজই এটা। এ এক সখের ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে ওঁরও একজন ছিল বটে, তবে উনি তাকে বাড়িও করে দেন নি, আর গা সাজিয়ে গহনাও

দেন নি। আর সংযমও হারিয়ে ফেলেন নি। এটাকে যদি দোষ বলে ধরেন তা হলে তিনি দোষী।"

"এর জন্য বাড়িতে খটাখটি লেগেছিল, না?"

"না, না এ তো কিছুই নয়, ঝগড়া-বিবাদের অন্য কোনো বড় কারণ ছিল নিশ্চয়।"

"কী কারণ?"

"তা এখন নাই বললাম···আপনি তো যাচ্ছেনই? গিয়ে দেখলেই টের পাবেন ও কেমন···।"

"একলা যেতে সাহসে কুলোচ্ছে না আমার।"

"চলুন-না আমার সঙ্গে।"

সভাবন্তের আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হলাম। পরদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা একটু বিশ্রাম করে, সীতারাম হেগ গড়ের দোকানে উপস্থিত হলাম। সম্ভবত আমাদের যাবার খবর সভাবন্ত আগেই পাঠিয়ে থাকবে। ওখানে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই দেখলাম সীতারাম ফটকে দাঁড়িয়ে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করে দোকানে নিয়ে বসাল। আমরা আরাম কেদারায় বেশ ভালো করে বসলাম। পান তামাক এল।

জিজ্ঞাসা করল, "চা খাবেন?"

আমি বললাম, "এখুনি খেয়ে এসেছি।" কিন্তু সভাবন্ত বাধা দিয়ে বলে উঠল, "অতিথি এসেছে, চা খাওয়াবে না?" ভিতরে গিয়ে সে চা করতে বলে এল। তারপর সভাবন্তের সঙ্গে সুপুরীর দর, বাজার, আরো নানান বিষয় আলোচনা আরম্ভ করল। সুপুরী খাই তবে তার দর জানি না। আমি চুপ করে বসে রইলাম। সীতারাম যেদিন আমার বাড়ি এসেছিল সেদিন যেমন ওকে আমল না দিয়ে আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তেমনি সেও আমার উপর আজ প্রতিশোধ তুলল। আমাকে অগ্রাহ্য করে শুধু সভাবন্ত ও তার খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলছিল। আমার হাসি পেল। ভালোই হ'ল। নীরস কথোপকথনের চেয়ে নীরবতা ভালো।

ইতিমধ্যে একটি অল্প বয়সের ছেলে আমাদের জলখাবার খেতে ভেতরে ডাকল।

যশবন্তবাবুর মৃত্যুর পর ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে, কী বলব না বলব, ভেবে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

ভেতরে গিয়ে দেখলাম তিনটে পিঁড়ি পাতা রয়েছে। দুটোতে আমরা বসব আর তৃতীয়টি বাড়ির গৃহিণীর জন্য। আমরা বসলে থালাভর্তি খাবার এল। কলার হালুয়া, লুচি, ঝুড়ি ভাজা চিঁড়ে ইত্যাদি আর কফি।

আমি বললাম, "করেছেন কী, এত কে খাবে ?"

সভাবন্ত বলল, "আমরা তো এক্ষুনি খেয়ে বেরিয়েছি।"

সীতারাম বলল, "তা হলে বলে পাঠালে কেন ?"

"তুমি যাতে কোথাও বেরিয়ে না যাও।"

"এ সময় তো আমি দোকানেই থাকি।...নিন খান, রসাগন লুচি স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ ভালো।" এমন সময় কমলাম্মার আবির্ভাব হ'ল।

সীতারাম পরিচয় করিয়ে দিল, "ইনি আমার মা।" আমি বসে থেকেই নমস্কার করলাম।

বেশ ফর্সা, মোটাসোটা। জাঁকজমক তাঁর ছেলের মতোই। কপালে কুমকুমের টিপ যেখানে পরতেন সেখানে একটা ঝাপসা দাগ এখনো রয়েছে। কানে দুল চকচক করছে, পরনে সিল্কের শাড়ী, বেশ ভারিক্কি মনে হচ্ছে ওঁকে।

আমি তখনো খাচ্ছি এমন সময় সীতারাম সভাবন্তকে নিয়ে উঠে পড়ল। আমাদের বলল, "আপনারা আলাপ-সালাপ করুন। আমরা বাইরে বসছি।"

ওর মা বললেন, "আস্তে আস্তে খান, তাড়াহুড়ো করবেন না।"

আমি নীরবে খেতে লাগলাম।

"আমার ছেলের কাছে আমি সব শুনেছি। আপনি আমার স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন।"

"অন্তরঙ্গ আর কোথায়? মাত্র দুছরের পরিচয় ছিল আমাদের।"

"তা সত্ত্বেও, আপনার উপর ওঁর বেশি বিশ্বাস ছিল, যে বিশ্বাস নিজের স্ত্রী বা ছেলের উপর ছিল না….।"

"সেটা একটা যোগাযোগ হতে পারে…কালের গতি। উনি যথার্থই আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছিলেন, কিন্তু কেন তা জানি না।"

"এ তো জলের মতো পরিষ্কার। যাতে তাঁর বংশের কেউ ওঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হতে পারে, তাই আপনাকে উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন।"

"না বৌদি। তাঁর উত্তরাধিকারী হবার আমার কী অধিকার? উনি বোম্বেতে যতদিন ছিলেন, কারুর সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করেন নি।…একবার রেলযাত্রায় আমাদের আলাপ হয়. আমরা দুজনেই পুনা থেকে বোম্বে যাচ্ছিলাম। আমি যে কর্ণাটকি তা উনি টের পেয়েছিলেন। সেই সূত্রেই পরিচয়। শুনেছি উনি যখন অসুস্থ, আমার নামে একটা চিঠি লিখে রেখেছিলেন। ওঁর প্রতি-বেশীকে আমার ঠিকানায় তারও পাঠাতে বলেছিলেন। সেই তার পেয়েই আমায় যেতে হয়েছিল।"

"সীতারাম সব বলেছে। স্ত্রীর উপর শোধ তুললেন তো?… উনি যে আপনাকে টাকা পাঠালেন তা কি আপনি ন্যায়সংগত মনে করেন?"

"আমি বড় সংকুচিত হয়ে আছি। উভয় সংকটে পড়েছি। এইজন্য আপনার ছেলের সন্দেহভাজন হয়েছি। তাকে তার বাবার চিঠি দেখিয়েছি তা সত্ত্বেও সে আমায় উকিলের নোটিশ পাঠিয়েছে।"

"এর চেয়ে যদি ধারেশ্বর সবসার নামে একটা উইল করে যেতেন, সেও ভালো ছিল। ওর ছেলে তো শীন, না? অন্তত তার নামে পাঠালেই সর্বাঙ্গসুন্দর হ'ত।"

"আমাকে এখন এ-সব বলে কী লাভ? আমার তো নিজের জন্য টাকার দরকার নেই।"

"আপনার দরকার না থাকলেও আমাদের তো আছে। ওঁর জন্য আমাদের কি কম কষ্ট আর অপমান সইতে হয়েছে?"

"যিনি চলে গেছেন তাঁর বিষয় কেন এমন অকথা-কুকথা বলছেন? মৃত্যুর সঙ্গে সে-সব ভুলে যাওয়াই আমাদের ধর্ম।"

"মনে হচ্ছে আপনি আমাদের ধর্মোপদেশ দেবার জন্যই এত দূরে এসেছেন। তার চেয়ে উনি থাকতে থাকতে ওঁকেই উপদেশটা দেওয়া কি বন্ধুর উচিত ছিল না?"

"ওঁর জীবদ্দশায়, নিজের সংসারের কারুর বিষয় ভালো-মন্দ কিছুই বলেন নি।"

"বলবার মুখ থাকলে তো?"

আমি বা বললাম না। ভাবলাম তা হলে উনিও চুপ করবেন। কিন্তু চুপ করা তো দূরের কথা আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, "শুনছি চোচকলমানের এক বাঁড় মার্গার নামে আপনি মন্দির করিয়েছেন?"

শুনে শিউরে উঠলাম! এ-যে দেখি কেউটে সাপ।

"জানি বৌদি, আপনি রাগ করেছেন। তবুও কারুর বিষয় এ ভাবে বলটা কি উচিত।"

"কেন উচিত নয়? আমি ওঁর বিবাহিতা স্ত্রী, তবুও সে ভাতার খাকাটা আমার স্বামীকে হাত করেছিল। আর তাকেই খুঁজে আপনি তারই নামে নাকি মন্দির করিয়েছেন?"

"আমি কি করেছি? আসলে তো তাঁর নিজের গুণেই এটা হতে পেরেছে। উনি তো নিজের জন্য কিছু চান নি, ওঁর ভগবানে অগাধ শ্রদ্ধাই আমাকে দিয়ে এ কাজ করাতে পেরেছে।"

"ও, তাই নাকি?"

ওঁর সঙ্গে কথা বাড়াবার আর একবিন্দু আগ্রহ রইল না। কেন মরতে আমি এ কাজে হাত দিলাম। উঠে পড়লাম। তখন গৃহিণী বললেন, "দেরি হয়ে গেল কি? আসুন তা হলে। আবার এ গাঁয়ে আসলে আমাদের বাড়িও আসবেন।"

"তা আসব," বলে আমি প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে এলাম।

সীতারাম জিজ্ঞাসা করল, "এখন তো কিছুদিন আছেন, না ?"

"হ্যাঁ, দু-একদিন তো আছি নিশ্চয় ।"

"ভালো কথা, আপনি কিছু ভাববেন না । এই সামান্য টাকার জন্য আমি মামলা করব না মনস্থ করেছি ।"

"ধন্যবাদ । আমার বয়সের প্রতি অনুকম্পা হ'ল বুঝি ?"

"না, তা কেন ? আমার দু-একজন বন্ধুর কাছে আপনার সুখ্যাতি শুনলাম । এখন আর আপনার উপর আমার অবিশ্বাস নেই । কিন্তু আপনি বা কী করতে পারেন ?"

"আমার আর কি চাই ? তুমি আমার বন্ধুপুত্র, তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না, শুধু এটাই কাম্য ।"

সীতারাম সহজেই ও কথাটা অনুমোদন করল ।

মনটা এবার হাল্কা হল । তারপর সভাবন্তুর সঙ্গে চলে এলাম ।

'বিবাহিতা স্ত্রী'—বলেছিলেন কমলাম্মা : এই বিবাহিত জীবন থেকে উদ্ধার পাবার জন্য মশরপ্পুর আত্মহত্যা করলেও আশ্চর্য ছিল না । পার্বতাম্মার উপর 'ষাঁড়', 'ভাতারখাকী' বলে যে বাক্য-বাণ বর্ষণ করছিলেন—এটা ভুলেই গেছেন উনি নিজেও এখন সেই দলে । যেহেতু বিধবা হবার পরও উনি চুল কাটান নি, তাই বোধহয় নিজেকে সেই দলের বাইরে মনে করছিলেন ।

পথ চলতে চলতে বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করল, "বৌদির সঙ্গে কী কথা হ'ল ভাই ?"

উত্তরে বললাম, "অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা আর মন্দোদরী—আমাদের শাস্ত্রে এঁরা হলেন 'পঞ্চকন্যা', নিত্যস্মরণীয়া । কিন্তু আমাদের সমাজে রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীকে বাদ দেওয়া হয়েছে । আমাদের গ্রামে লোকে বলে— তার দোষেই রাবণ অমন হয়েছিলেন । গাঁয়ে মেয়ে মদাণীকে মন্দোদরী বলা হয় ।"

সভাবন্তু হো হো করে হেসে উঠল । বলল, "আপনিও ওঁকে এক নিমেষে বুঝে ফেললেন ?"

"ওঁর কথাবার্তায় ওঁর স্বভাবের পরিচয় । ওঁর জাঁকজমক, অহংকার,

সব দেখে মনে হয় যেন উনি পৃথিবী জয় করে বসেছেন। আমি এই ভেবে অবাক হচ্ছি যে যশবন্তবাবু এঁর সঙ্গে কি করে অতদিন কাটিয়েছেন।"

"স্বামী-স্ত্রীকে একই রথের দুইটি ঘোড়া বলা হয়। কিন্তু এঁদের রথে ঘোড়া জোতা ছিল না। এঁদের রথে একটি ছিল বাঘ আর একটা ছিল হাতি। যশবন্তবাবু হাতি না হয়ে যদি গোরু হতেন তা হলে বাঘটা ওঁকে গিলেই ফেলত। কিন্তু উনি ছিলেন হাতি। বাঘ তো রথ টানতে পারে না, তাই উনি একাই যতদিন পেরেছিলেন টেনেছিলেন। ভালোমানুষ ছিলেন, তারপর যখন আর পারলেন না রথ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।"

"সর্বদা মায়ের কাছে থাকার দরুন, সীতারামের উপর তার মায়ের প্রভাব খুব বেশি পড়েছে। কিন্তু কাল হোন্নগাচ্ছে যে মেয়েটি দেখলাম, বুঝেছেন কাকে? নাম জলজাক্ষী, ওর হাবভাব, আচার-ব্যবহার কী চমৎকার। ওর স্বামী মঞ্জইয়াও ওর তুল্য। আর তেমনি তাদের ছেলে যশবন্ত, প্রথম যাকে রাস্তায় দেখেছিলাম। সে তো আমার পরিচয় না জেনেও বিনা দ্বিধায় কেতরকী মঞ্জইয়ার বাড়ি দেখাবার জন্য তৈরি হয়ে গেল।"

সভাবন্ত বলল, "সুপুত্র পুণ্যের জোরেই পাওয়া যায়। অর্থ পাওয়া যায় ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায়। কিন্তু চরিত্র, সদাচার এ হচ্ছে পূর্বজন্মের পুণ্যফল।"

আমিও তাতে সায় দিলাম। যে-সব বিষয়ে আমরা অজ্ঞ তাকে ভাগ্য, অদৃষ্ট বলে চালিয়ে দি। আরও বেশি দুর্বোধ্য হলে বলব পূর্বজন্মের ফল। কিন্তু এ-সব তো নিজের চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বভাব, চরিত্র গড়া তো আমাদের নিজেদের হাতে। নিজের ক্ষমতায় আস্থা থাকলে, নিজেই রাস্তা বের করে নেবে। আর সেই জগতে কিছু করে দেখাতে পারবে। আমার বন্ধু নিশ্চয় নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এটা উপলব্ধি করেছেন। আগ্রহ থাকলে, আমরা সবাই সহজে এ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারি।

বাড়ি ফেরার পর সত্যবন্তকে বললাম, "আমি একটু সমুদ্রের দিকে ঘুরে আসছি।" ওখানে পৌঁছুতে প্রায় ঘণ্টা খানেক লাগল। সীতারামের ওখানে যা-কিছু ঘটেছিল তাতে আমার মন বিমিয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রের ধারে বসে অনেকক্ষণ ধরে ঢেউয়ের ওঠানামা দেখলাম। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছিল। খুব বড় ও লাল দেখাচ্ছিল। নিভে যাবার আগে যেমন প্রদীপ একবার খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি সূর্য ডোববার আগে সারা আকাশে ওর সৌন্দর্যের ছটা ছড়িয়ে দেয়। যশবন্তবাবুর জীবন-সায়াহ্নে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, যখন উনি ভালোমন্দ, সুখদুঃখ সবরকম দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এই অস্তগামী সূর্যের মতনই এখন আমি ওঁকে এক পূর্ণমানব রূপে দেখতে পেলাম। ওঁর চেহারা, আচার-ব্যবহার এ-সব স্মৃতি বড়ই মধুর লাগল। ওঁর মৃত্যুও কি সূর্যাস্তের তুল্য নয়? সূর্য অস্ত গেলে সারা আকাশ তার আভায় লাল হয়ে থাকে। যশবন্তবাবু আমায় যে ডায়েরি দিয়ে গিয়েছিলেন সে যেন ঐ সূর্যেরই আভা।

সূর্য অস্ত গেল। আবার কাল তার উদয় হবে। এর থেকেই নিশ্চয় মানুষ ভেবে থাকবে যে মৃত্যুর পর, আবার অন্য দেহ আশ্রয় করে আমরা পৃথিবীতে আসি। মৃত্যুকে যারা চায় না, তারা এই কল্পনা করেই মৃত্যুভয় এড়ায়। সূর্য যেমন দিনের পর দিন উদয় হয় তেমনি কি আমরাও ভিন্ন ভিন্ন শরীরকে আশ্রয় করে বারবার আসব না? সূর্য চিরন্তন, কাল যে সূর্য অস্ত গেছে, আজ তারই উদয়। কিন্তু মানুষের বেলায়, পুনর্জন্মের পর তাকে আর চেনা সম্ভব নয়।

এ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হবার আশায় মানুষ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো একের পর এক বিচিত্র ভাবনা আমার মনে উদয় হতে লাগল। দেখলাম সমুদ্রে ঢেউয়ের খেলা। একটা ঢেউ ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তার অনুগামী ঢেউ এসে তার অস্তিত্ব নিমেষে বিলীন করে দিচ্ছে। এরই পুনরাবৃত্তি হয়েই চলেছে। তবুও

সমুদ্রে ঢেউয়ের অন্ত নেই। একের পর এক ঢেউ এসেই চলেছে। আমাদের জীবনও কি এমনি নয়? পুনর্জন্ম কি এমনই এক ব্যাপার নয়?

এই ধরনের এক স্বপ্নাবস্থায় সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কালো আকাশে তারা ঝলমল করছে। লোকে বলে, যাঁরা পুণ্যবান, তাঁরা মৃত্যুর পর আকাশে নক্ষত্ররূপে বিরাজ করেন।

এখানেও মানুষের আশার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। মৃত্যুর পরও আকাশে চিরদিন থাকার ইচ্ছা। লোকে বলে, ধ্রুবতারা কখনো অস্ত যায় না। মানুষের আয়ুর সঙ্গে তুলনা করলে শুধু নক্ষত্র কেন, পাহাড় পর্বত সবই চিরস্থায়ী। আমার বন্ধুও নক্ষত্রের মতো চিরন্তন, কিন্তু উনি নিজে কি এটা জানতেন?

এক ক্রোশ রাস্তা হেঁটে কুমটার বাজারে ফিরলাম। তখন আটটা বেজে গিয়েছিল। আমার বন্ধু তার মিত্রের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে গিয়েছিল। বৈঠকখানায় কেউ ছিল না। রাত্রে খেতে ওঁদের নটা-দশটা বাজে। তাই ভাবলাম এখানে অনর্থক বসে সময় নষ্ট না করে, উকিল বন্ধুটির ওখানে গিয়েই আলাপ-পরিচয় করা যাক।

মুণ্ডেশ্বর উকিল বাড়িতেই ছিলেন।

উনি বললেন, "কি ব্যাপার? কালও এলেন না, আজও সারাদিন গায়েব।"

"বাঃ! এই তো এলাম! তারপর সব সমাচার ভালো তো? প্র্যাকটিস বেশ ভালোই চলছে, না?"

"আমার পক্ষে ভালোই বলতে হবে। আমি অনেকগুলো কেস আর নিই না। পুরনো যে-ক'টা আছে তাই দেখি। সারাজীবন যদি খাটবই, আরামটা কবে করব বলুন?"

"তাই বলুন, এখন আরাম করবার 'মুড'?" ঠাট্টা করে বললাম।

আমরা এইভাবেই নানারকম গল্প করতে লাগলাম। হঠাৎ উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের সীতারাম হেগ্‌ড়ের বাড়ি গিয়েছিলেন না?"

"আপনি কি করে জানলেন ? আপনাদের এখানে কি দেয়ালেরও কান আছে ?"

"না না, সীতারামই এসেছিল। আমার বেশ জানাশুনা আছে ওঁর সঙ্গে।"

"অনেক দিন থেকে জানেন বুঝি ?"

"ওঁর বাবা যখন এখানে ছিলেন তখন থেকেই। ইনি বাপের মতো নন। ইনি তো পারফেক্ট জেন্ট লম্যান।"

"সে তো হওয়াই উচিত।"

"আপনাদের দুজনের মধ্যে কী একটা ঝগড়া ছিল না ? পরশু আপনাকে দেখে তো ভাবলাম সেইজন্য এসেছেন। ভালোই করেছেন, কোর্টে না গিয়ে এ বিষয় নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নেওয়া ভালো।"

"ঝগড়া তো এমন কিছু নেই।"

"তবে উনি আপনাকে রেজিস্টার্ড নোটিশ কেন পাঠিয়েছিলেন ?"

"নোটিশ ? হ্যা তা পাঠিয়েছিলেন। যতক্ষণ আপনারা উকিলরা আছেন ততক্ষণ এরকম নোটিশ দেওয়া দেনি চলবেই।"

"নকলটা আমিও দেখেছিলাম।"

"কিসের ?"

"নোটিশটার এবং যশবন্তের লেখা চিঠিটারও। আপনার কাছে তো শুধু একটা চিঠি এসেছিল, সেটা তো উইল নয়। লিখেছিলেন না, যতক্ষণ আমি না যাই ততক্ষণ টাকাটা নিজের কাছে রাখবেন। দুজনে আপসে একটা নিষ্পত্তি করে নেওয়াই কি ভালো নয় ?"

"কি রকম ?"

"আপনার খরচটুকু বাদ দিয়ে বাকিটা সীতারামকে দিয়ে দিন।"

"বুঝেছি।"

"কেন ? আমি ঠিক বলছি না ?"

"উকিলের হিসেবে তো ঠিকই।"

"অন্য হিসাবটা কিরকম জানতে পারি ?"

"যশবন্তবাবুর হয়েই তো আমায় দেখতে হবে?"

"দেখুন, উনি তো নেহাত নির্বোধ ছিলেন। একেবারে নিরেট। উনি এখানে থাকতে আমিও ওঁর সান্নিধ্যে আসি। প্রথম থেকেই উনি ভুল রাস্তা ধরেছিলেন। মানে নিজের স্ত্রী-ছেলের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করতেন, ওদের প্রতি কোনো সহানুভূতি ছিল না।"

"তা হতে পারে। শেষ পর্যন্ত সেইভাবেই উনি মারাও গেলেন। উনি বেঁচে থাকতে কেউ ওঁকে শোধরায় নি। তবে এখন আর কি হতে পারে?"

"তা অবশ্য। এখন আর কি করা যেতে পারে! তবে আপনার মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনায়াসেই এই অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেন।"

"কোন্ অবস্থাটা?"

"ওর সম্পত্তির বিষয় বলছিলাম।"

ওঁর এ-সব কথায় আমার বিরক্তি ধরে গেল। আমার পুরনো বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও দেখছি সাভারামের পক্ষ নিচ্ছেন। তাই বললাম, "মিস্টার মুণ্ডেশ্বর, এ প্রসঙ্গটা বদলে ফেলুন, আপনার সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে চাই না।"

তারপর উনি বিষয়-সম্পত্তির কথা আর তুললেন না, তবে আমার বন্ধুর বিষয়ে যা খুশি তাই বলতে লাগলেন। ওঁর মতে কুমটায় যশবন্তবাবুর মতন নীচ আর অধম ব্যক্তি দ্বিতীয় ছিল না। নেহাত কিপটে, বোকা, নিষ্ঠুর, যতরকম উপাধি দেওয়া চলে সব ওঁর প্রাপ্য। তাঁর তুলনায় ওঁর স্ত্রী-ছেলে একেবারে দেবতা।

নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে যদি উনি তাঁর বক্তব্য শোনাতেন তো আমার কিছু বলবার ছিল না, কিন্তু সে সীমা উনি অতিক্রম করেছিলেন, তাই আমিও বিরক্ত হলাম। বললাম, "যশবন্তরায়কে আমিও অল্পস্বল্প জানি। গত পাঁচ-ছ বছরে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়েছিল। উনি দেবতা না হতে পারেন তবে আপনার মতানুযায়ী অত নীচও ছিলেন না। সত্যিই যে উনি ভালো লোক ছিলেন তা আমি জানি।"

"বলছেন কী ?"

"আমার আপনার চেয়ে ঢের ভালো ও যোগ্য ছিলেন উনি" বলে আমি হঠাৎ উঠে পড়লাম।

তখন বোধহয় ওঁরও অনুশোচনা হ'ল, বললেন "এত রেগে যাচ্ছেন কেন ? এ-সব বিষয় একটু ধৈর্য থাকা চাই।"

"মৃত ব্যক্তির বিষয় বলবার সময় তো এ কথা আপনার মনে ছিল না।"

"আই অ্যাম সরি।"

"যাঁর প্রতি অন্যায় করেছেন, তাঁর কাছেই ক্ষমা চান," বলে আমি চলে এলাম।

সেদিন দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা আমায় বিভ্রান্ত করে তুলল। সমুদ্র দেখে আমার মনে যে শান্তি এসেছিল তা সব নষ্ট হ'ল। মুণ্ডেশ্বরকে নিরপেক্ষ ব্যক্তি ভেবেই ওঁর কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু সে একেবারে বিপরীত।

সভারত্নের বাড়ি পৌঁছুতে রাত দশটা বেজে গেল। ও আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় গিয়েছিলেন ?" কোনো জবাব দিলাম না আমি।

"খুব দেরি হয়ে গেছে ভাই, অনেকবার খাবার তাগাদা এসেছে, চলুন আগে খেয়ে নি গে।"

খেতে বসলাম বটে তবে অন্ন আমার মুখে রুচল না।

বন্ধুর নিন্দে শুনে মনটা আমার ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে সংশয় জাগল আমি কি যশবন্তবাবুর পক্ষপাতিত্ব করছি ?

আপনজন, প্রিয়জনের ব্যাপারে আমরা বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। তা যদি না হয় তো আমার মন এত বিচলিত হ'ল কেন ? সীতারাম হেগ্‌ড়ে ও মুণ্ডেশ্বরের বাড়িতে আমি এত অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম কেন ? আর হোন্নগচ্ছেতে এর বিপরীত কেন হ'ল ? তখন এত বাৎসল্য, প্রেম, উথলে উঠল কোথেকে ?

তবে আমি যে মানুষ—আমি অনুভূতির দাস। অপ্রিয় কথায় বিরক্ত হই, আর প্রিয় কথায় আনন্দিত। আমি নির্লিপ্ত নই।

সেদিন খাবার সময় শেষপাতে পায়েস দেওয়া হয়েছিল। আমাকে বলা হ'ল, "আর-একটু পায়েস খান।" কিন্তু পায়েসটা কিসের তা জানি না, এত অন্যমনস্ক ছিলাম। সেইরকম জীবনের স্বাদও থাকবে না, যদি তাকে এমনভাবে গ্রহণ করি। যত্ন করে রেঁধে, আদর করে যে খাওয়াচ্ছে তার কদর যেমন করলাম না, ঠিক সেইরকম করে যদি যশবন্তবাবুর স্নেহের কদর আমি না করতাম, তা হলে কি হত? না, নির্লিপ্ততা আমার চাই না। আমি মানুষ, মানুষের মতোই থাকব।

"পদ্মপত্রমিবাম্ভসি।"

পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতো মানুষকেও নির্লিপ্ত থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যার আশ্রয়ে আছি তাকেও আঁকড়ে থাকা নিষেধ। জলবিন্দুর উপর উপদেশ খাটে, তার তো প্রাণ নেই; তাই বলে মানুষের বেলা এ উপমা চলবে না।

খেয়ে উঠে আমরা বৈঠকখানায় এসে বসলাম। আমার সামনে সভাবন্ত বসে, পানের ডিবেয় পান, কিন্তু আমার মন কোথায় ভেসে বেড়াচ্ছে? ভাবপ্রবণতাকে আমি দোষ বলে গণ্য করি না। তবে হ্যাঁ, একে বিবেকের অধীনে রাখা দরকার। তাই সভাবন্তকে বললাম, "আজ একটা ভুল করে ফেলেছি। তুমি বাড়ি ছিলে না বলে উকিলের ওখানে গিয়েছিলাম।"

"মৃগেশ্বর উকিলের বাড়ি?"

"হ্যাঁ, তোমার মতো ওঁর সঙ্গেও আমার অনেক দিনের পরিচয়। ওঁকেও আমি আমার বন্ধু বলেই মনে করতাম, কিন্তু আমার সে গর্ব আজ খর্ব হয়ে গেছে।"

"অর্থাৎ?"

সংক্ষেপে সভাবন্তকে সব বিবরণ দিলাম: "আজ সন্ধ্যায় হেগ্‌গেডের ওখানেই মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। ভাবলাম বন্ধু

উকিলের কাছে গেলে মন কিছু শান্ত হবে, কিন্তু উল্টে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল সেখানে।"

"সীতারাম আর মুণ্ডেশ্বর উকিলের মধ্যে তো বেশ বন্ধুত্ব।"

"আমি তা জানতাম না।"

"তারপর, হ'ল কি?"

ওখানকার সব ঘটনা বললাম। "বন্ধুর নিন্দে করলে আমিও পাল্টে তাকে খুব শুনিয়ে দিয়েছি।" তারপর বললাম, "সেও তো বন্ধু, তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা আমার উচিত হয় নি।"

"একটা কথা বলব?"

"কি?"

"মুণ্ডেশ্বর উকিলকে আমি হাড়েহাড়ে চিনি। ওর পেটে অনেক বিদ্যে। সেই মহিলাটির সঙ্গে ওর অনেক দিনের সম্বন্ধ।"

"তাই নাকি?"

"বিলক্ষণ। ভাববেন না যেন আমি মিথ্যে রটাচ্ছি।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। তারপর সভাবন্ধুকে বললাম, "আজ জ্যোৎস্না রাত, শুলেও আমার ঘুম আসবে না। চলো-না, কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি।"

"সচরাচর রাত্রে আমি বেড়াই না।"

"একলা যেতে ইচ্ছে করছে না।"

"কোথায় যাবে?"

"কোথায় আবার? হাইস্কুলের টিলায়।"

এগারো

কুমটার কাজ হয়ে গেলে আবার হোজগচ্ছে মজুইয়ার ওখানে গিয়েছিলাম। তাদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে মনটা কিছু শান্ত হ'ল। ধারেশ্বর শীল কিংবা তার মার ঠিকানা উনি জানতেন না।

ধারেশ্বর শীনের একটি বোনও আছে কথায় কথায় বেরুল, সে ওখানেই কোন্ স্কুলে কাজ করে। এবার ফেরবার সময় শুধু যশবন্ত বা জযবন্তই নয়, কনিষ্ঠ ভগবন্তও আমার গলা জড়িয়ে আদর করে বলল, "আবার আসবেন— নিশ্চয় আসবেন।" শেষে মঞ্জুইয়ার স্ত্রীও কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলেছিল, "আমার মায়ের ওখানে হয়ে এসেছেন, না? সবাই ভালো তো?"

ওখান থেকে তার পরের প্রোগ্রাম ভাবতে ভাবতে সভাবন্তর বাড়ি পর্যন্ত হেঁটেই গেলাম। যশবন্তবাবুর আসলের সুদ থেকেই সকলকে প্রতিমাসে টাকা পাঠানো ঠিক হবে। রাস্তায় আসতে আসতে এই-সব ভাবতে লাগলাম। বেনকাইয়ার মন্দিরের খরচ মূলধন থেকেই করেছি। এখন মঞ্জুইয়ার ছেলেদের পড়াবার ভারও নিয়েছি। এ-সবই যদি মূলধন থেকে করি তো আমার বন্ধুর টাকা আর কতদিন থাকবে? এই-সব ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়েই সভাবন্তর বাড়ি প্রবেশ করলাম।

সরসী ও তার ছেলে-মেয়েদের কথা কি সভাবন্তরা জানে? এ বিষয়ে ওদের কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় কিনা ভাবতে লাগলাম।

কুমটায় যদি ওদের বিষয় সবিস্তারে জেনে নিতে পারি তা হলে আমার দায়িত্ব কতখানি বুঝতে পারব। ধারেশ্বর শীন যা লিখেছিল তাতে মনে হয় ওর মা অসুস্থ। যশবন্তবাবুর হিসাবের খাতা ও রসিদগুলো দেখে তো মনে হচ্ছে ওর ভাগে কিছু পড়ে নি। শেষ পর্যন্ত যশবন্তবাবুর আর ওদের মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল জানি। উনি যখন দশ-বারো বছর ধরে বোম্বেতে ছিলেন, তখন ওঁদের মধ্যে কি চিঠির আদান-প্রদান হয় নি? কিংবা মৃত্যুর পূর্বে এই স্নেহের ঋণ শোধ করবার উদ্দেশ্যে এই মাসোহারার বন্দোবস্ত করেছিলেন। তবে ঠিকানাটা কেন দিলেন না? বোধহয় এ-সব কথা জানাতে তাঁর সংকোচ হয়েছিল। তাই সরসীর ছেলের ঠিকানা দিয়েছিলেন। নিজেকে এই বলে বোঝালাম।

শেষ পর্যন্ত সভাবন্তকেই জিজ্ঞাসা করতে হ'ল। ও কিছুক্ষণ

ভেবে বলল, "ওর ছেলে শীন বেঁচে আছে। ওর একটি মেয়েও আছে। সে কাছাকাছি কোনো গ্রামে থাকে। তার বিয়েও হয়ে গেছে। এখানে সিদ্ধপুরে কোথাও পড়ায় শুনেছি। সরসীর দূর-সম্পর্কের কোনো আত্মীয় কুমটায় থাকে। আজ তো থাকবেন, না? সন্ধ্যা পর্যন্ত খবর নিয়ে বলব।"

সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর কোনো কাজ না থাকাতে বেশ লম্বা একটি ঘুম দিলাম। স্বপ্নে যশবন্ত ও সরসীর যুগল রূপ দেখলাম। সরসী কমলাম্মার একেবারে বিপরীত। সুন্দর বলা যায় না। ভালো গাইতে পারে। যেন গোবরে পদ্মফুল। বন্ধুকে ভালোবাসি বলেই স্বপ্নটা দেখলাম। স্বপ্নে আর একটা খারাপ দৃশ্যও দেখলাম। যখন যশবন্ত ছিলেন না সে সময় একদিন মুণ্ডেশ্বর সরসীর বাড়ি এসেছিল। সরসী জিজ্ঞাসা করল, "কি চান আপনি?" উনি বললেন, "যশবন্ত এখানে আছে কিনা দেখতে এসেছি।" সরসী বলল, "ওঁকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখুন।" তবুও ওঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সরসী রেগে দরজা বন্ধ করে দিল। এরপরই সভারঙ্গের ডাক শুনলাম, "ওহে ফকির, সময় হয়ে গেল যে।"

উঠে হাতমুখ ধুয়ে কফি খেলাম। বন্ধু নিজের কাজে চলে গেল। আমিও বেড়াতে বেরুলাম।

বেশি হাঁটবার ইচ্ছে ছিল না। স্বপ্ন দেখে মনটা বেশ প্রফুল্ল ছিল। ভাবলাম এখানেই কাছের বন্দরটায় গিয়ে বসি, তাই আস্তে আস্তে হাটতে হাটতে বন্দরের রাস্তা ধরলাম। সমুদ্রে তখন ভাঁটা পড়েছে। কতকগুলো নৌকা কাদায় আটকে গিয়েছিল। সেখানে জল খুব অল্প। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে মেছুয়াদের ছেলেগুলো জাল ফেলে মাছ ধরছে। ছোট ছোট মাছগুলো জালের মধ্যে পড়লেই লাফিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে—তাদের জীবনের সেটা অন্তিম দিন। লাফালাফির পরও মেছুয়াদের হাতেই পড়ল। মাছগুলোর নাকে নারকোল দড়ি দিয়ে ওরা মাছের মালা গাঁথছিল। তখনো কোনো কোনো মাছ জ্যান্ত ছিল। মালাতেই ছটফট করছিল। আমি এ দৃশ্য

দেখতে না পেরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ভাবলাম মরে গেলে তারা আর ছটফট করবে না।

শুধু সমুদ্র ও রাস্তার লোকজন, গাড়িঘোড়া দেখা ছাড়া তখন আমার আর কি কাজ? মেছুয়াদের একটা ছোট ছেলে এসে জলের ধারে বসল। গেঁদে থেকে একটা পোকা বের করে ছিপে লাগিয়ে ছিপ ফেলল। সে একাগ্র হ'ল, যেন তপস্যায় বসল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও তপস্যায় বসলাম। ওর তপস্যার ফল পেল—গোটাকতক মাছ। একটা মাছ তো ছ-ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু আমার তপস্যার ফল কী পেলাম? মনের মধ্যে এক-একটা চিন্তার তরঙ্গ উঠে কিছুক্ষণ থেকে একটা দাগ কেটে মিলিয়ে যেতে লাগল। সেই চিন্তাগুলিই আমার বন্ধুর পূর্ব ইতিহাস, যা আমার কল্পনাতেই শুধু ছিল। আমার ছিপে কি কোনো মাছই পড়ে নি? কতক্ষণ যে এভাবে বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ দেখি আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম, তারপর সভাবন্ধুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হলাম। রাস্তায় দেখলাম সীতারাম হেগ্‌গড়ে তার কোনো বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছে। ও আমাকে চিনেও চিনল না। আমারও কথা বলবার মতো অবস্থা ছিল না। বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আরাম কেদারায় বসতে না বসতেই ঘুম এসে গেল।

ঘুম ভাঙলে দেখলাম আটটা বেজে গেছে। সভাবন্ধু বসে বসে পান সাজছিল কিন্তু আমায় জাগায় নি। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার, আজ এত ঘুম কেন? দুপুরেও অত ঘুমোলে! খুব ক্লান্ত হয়ে গেছ কি?"

ঘুমের ঘোর এখনো কাটে নি তাই ওর কথার মানে বুঝতেও একটু সময় লাগল।

"হ্যাঁ, ভীষণ ঘুম পেয়েছিল। কাল সারারাত প্রায় জেগেই কেটেছে তো! একেবারেই ঘুমোই নি তা নয়, কিন্তু মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।"

"তুমিও বেশ লোক ভাই। তোমার বন্ধুর বিষয়ে মুণ্ডেশ্বর উকিল

বা সীতারাম কি বললে, তা নিয়ে মনে অশান্তির সৃষ্টি করলে। কুকুরের তাড়া খেয়ে কি দেবতারা স্বর্গ ছেড়ে পালিয়ে যান? এরা যাই বলুক-না কেন, আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে যশবন্ত হেগ গড়ে খুবই ভালোমানুষ ছিলেন। আমাদের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক না থাকলেও ওঁকে আমি ভালো লোক বলেই জানতাম।" এই বলে সে আমাকে আশ্বস্ত করল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "সরসীর কোনো খবর পেলে?"

"হ্যাঁ, এখন আর তোমায় এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। সিদ্ধপুর যাবার দরকার নেই। শুনলাম সরসী প্রায় দু-তিন বছর হ'ল মারা গেছে। ওর ছেলে শীন সিদ্ধপুরের কাছেই কোডকণীতে আছে। কোডকণী নামের এখানে দু-তিনটে গ্রাম আছে। ও সিদ্ধপুরের কোডকণীতে থাকে।"

"তাই নাকি?" ওর বিষয় আমার জানবার কৌতূহল এতে আরও বেড়ে গেল।

"সে তো এখন নেই, তবে তার ছেলেমেয়ে আছে। মেয়েটি সানেকট্টাতে বদলি হয়ে গেছে। ওখানেই ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পড়ায়। ইচ্ছে হলে সানেকট্টাতে যেতে পারো, গোকর্ণর কাছেই। এখান থেকে দু-মাইলও হবে না। বাসেও যেতে পার, নয় তো মিজনি ভবন থেকে নৌকা নিতে পারো। ওর মেয়ে-জামাইকে দেখা হয়ে যাবে।"

"চমৎকার। এ বেশ হবে।"

"তা হলে কি সত্যিই যাবে? তোমারও বাতিক বটে।"

"সরসীর মেয়ে মানে আমার বন্ধুর মেয়ে, না? বুঝলে তো? সরসের বিপরীত হল বিরস। শাস্ত্রসম্মত বিবাহে যে দাম্পত্য জীবন সুখী হবে তা বলা যায় না—তেমন বিবাহের ফল তো দেখছি। এবার আমার বন্ধুর গান্ধর্ব বিবাহের ফলটা দেখতে চাই।"

"ভালো মন্দ দুটোতেই আছে। মঙ্গলসূত্র বাঁধলেই তো আর স্বামী-স্ত্রী এক হয়ে যায় না? তা ছাড়া ভালোলোকের সন্তান

ভালোই হবে, খারাপের সন্তান খারাপই হবে, এও তো বলা যায় না ?"

"তা বটে।"

"তা হলে তুমি যাচ্ছ ?"

"ঘুরেই আসি না ?"

"তা হলে আজকের দক্ষিণহস্তের ব্যাপারটা ? রাত্তিরে অবশ্য ফিরে আসতে পারবে, তবে মধ্যাহ্ন ভোজনের কি হবে ? তার চেয়ে বরং কাল সকালে গেলে হয় না ?

"একবেলা না খেলে কী আসে যায় ?"

"দ্বারেশ্বর শীনের ওখানে কিন্তু যেয়ো না, সে অনেক দূরে থাকে।"

"এ বিষয় আমি এখন পর্যন্ত কিছু ঠিক করি নি। আমার মনে হয় ও আমাকে ঠকিয়েছে।" বলে ওর বিষয় সংক্ষেপে বললাম। "'আপনি খবর দিলেন বলে আমার মা কৃতজ্ঞ হয়েছেন। উনি দুদিন খান নি।' এ রকম চিঠি পেলাম। এমন প্রতারকের সঙ্গে দেখা করার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। আরও একবার এমনি হয়েছিল। তবে সে ঝামেলাটা এখন চুকে গেছে। না, শীনের ওখানে আমি যাব না। সানেকট্টাতে ওর মেয়ে আছে বললে যে, ওখানেই হয়ে আসি তা হলে।"

"হ্যাঁ, শুনেছি তো ওখানেই স্কুলে কাজ করে। ছোট স্কুল। বড় রাস্তার উপর।"

পরদিন সকালে উঠে হাতমুখ ধোবার পরই কুমটা থেকে গোকর্ণর প্রথম বাসটা ধরলাম। গন্তব্যস্থান বেশি দূর ছিল না। সকালবেলা রোদের তেজও কম ছিল। রাস্তার দুধারে গাছ। একটা নদীও পার হতে হল। অপর পারের দৃশ্য অপূর্ব। মনের গ্লানি কেটে গেল। প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ স্কুলের সামনে বাস থেকে নেমে পড়লাম। কিন্তু স্কুলবাড়ির ফটক বন্ধ ছিল। এখনো স্কুল খোলে নি ? ছাত্রছাত্রীও তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপার কি ? ভাবতে ভাবতে চাতালে বসে পড়লাম। আধঘণ্টা হয়ে গেল বসে

বসে। যে চন্দ্রমতির সঙ্গে দেখা করতে এলাম তাঁরও দেখা নাই আর স্কুল-পড়ুয়ারাও আসে নি। তবে কি আজ ছুটি? হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ যে রবিবার। আফসোস হতে লাগল, ওদের বাড়ির ঠিকানা কাউকে না জিজ্ঞেস করে বৃথা এত সময় নষ্ট করলাম। বাইরে এলাম। একটু দূরে দু-একটা বাড়ি দেখা গেল। চন্দ্রমতির বাড়ি কোন্‌টা হতে পারে? জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আবার নাম নিয়ে মুস্কিলে পড়লাম, সভাবন্দু, চন্দ্রমতি না ইন্দুমতি কী বলেছিল, ঠিক স্মরণে আসছে না। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। যেই একটা বাড়ি দেখলাম তার সামনেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। কেউ যদি বাড়ি থেকে বেরোয় সেই আশায়। কিন্তু কেউ বেরুল না। তখন উচ্চস্বরে ডাকলাম, "এই স্কুলের মাস্টারমশাই কোথায় থাকেন?" একটি ভদ্রমহিলা বাইরে এসে বললেন, "মাস্টারমশাই সকালেই গোকর্ণ গেছেন।"

উত্তর শুনে মনঃক্ষুণ্ণ হলাম। মহিলাটি তখনো দাঁড়িয়ে। এটা কোনো মাস্টারেরই বাড়ি তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। বললাম, "আমি মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসি নি। এই স্কুলে একজন শিক্ষয়িত্রী আছেন, না?" মহিলাটি কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর একটু থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

"আপনি কোথেকে আসছেন? কাকে চান?"

ওঁর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, "মা, নামটা আমি ভুলে গেছি, চন্দ্রমতি না ইন্দুমতি। আমি বাইরে থেকে আসছি। একটা কাজের জন্য ওঁকে খুঁজছিলাম। তাঁর বাড়িটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?" উনি হাসলেন। তাঁর হাসিতে যেন জলজ্যোৎস্নার সাদৃশ্য।

উনি এবার আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করলেন—সদুত্তর দিলাম। যেন সামান্য পরিচয়ের আভাস পেয়ে উনি বললেন, "ভিতরে আসুন, এটাই ওঁর বাড়ি।" সংকোচে তাঁকে অনুসরণ করলাম। উনি বললেন, "আসুন-না, আপনার নাম শুনেছি, আপনার বইও পড়েছি।" শুনে আশ্চর্য হলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বৈঠকখানায় পৌঁছুলাম।

একটা বেঞ্চে বসতে দিলেন, তারপর বললেন, "আমি চন্দ্রমতি নয়, ইন্দুমতি। আমিই এখানে পড়াই। আমার স্বামীও এখানে পড়ান। ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, না?"

"না, আপনার সঙ্গে।"

"আমার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ মা, আপনি আমার বন্ধুর মেয়ে তাই এসেছি। আর কোনো কাজ ছিল না। আপনার বড় ভাই শীন আমায় চিঠি লিখে থাকেন। কুমটায় এসেছিলাম। আমার বন্ধু সভাবন্তবাবু খোঁজ নিয়ে বলেছেন, আপনি এখানে থাকেন। তাই দেখা করতে এসেছি।"

"শীননন্না কে আপনি চেনেন?"

"হ্যাঁ, চিঠির মাধ্যমে। চোখে দেখি নি। আপনার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন।"

উনি মাথা হেট করে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"আপনি সংকোচ করবেন না। আমি যশবন্তবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।"

উনি নীচু হয়ে, হাতের ইশারায় দেখালেন, "আমি এতটুকু ছিলাম, যখন আমার বাবা আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।"

"তা আমি কিছুটা জানি।"

"শুনেছি বোম্বেতে থাকেন।"

"এখন আর নেই। এক বছর হ'ল মারা গেছেন।"

"কি? মারা গেছেন? আমার মা ওঁর স্মৃতি সম্বল করে এই দু-বছর হল মারা গেছেন। এবার উনিও গেলেন।"

তারপর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। আমিও কিছু বলতে পারলাম না।

"আমার বড় ভাই সিদ্ধপুরের কাছে কোডকণীতে আছেন। আগে আমি আর মাও ওখানেই ছিলাম। কুমটার মলিন স্মৃতি থেকে মুক্তি পাবার জন্যই মা আমাদের সকলকে নিয়ে ওখানে চলে এসেছিলেন। তারপর আমাদের বড় কষ্টে দিন কাটছিল। শেষে যখন আমরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি তখন মা কোনোমতে ওঁর ঠিকানা জোগাড়

করে, বড়ভাইকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছিলেন। তক্ষুনি উনি একশো টাকা পাঠিয়েছিলেন। সে টাকা মার 'শেষকাজে' খরচ হ'ল। 'শেষ পর্যন্ত আমাদের ভুলে যান নি উনি'···বলে আমার মা শান্তিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এ সংবাদ দিয়ে চিঠি দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু হয়ে ওঠে নি। নানান ঝামেলায় ভুলেই গেলাম। তবে এখন ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের অবস্থা ভালোই, আমি ও আমার স্বামী এখানে স্কুলে পড়িয়ে বেশ সচ্ছল অবস্থায় আছি। বড় ভাইও ভালো আছেন। গাঁয়ে লোকেদের গান ও তবলা শিখিয়ে মন্দ উপার্জন করছেন না।"

তারপর ভেতরে গিয়ে ইন্দুমতি আমার জন্য জলখাবার আনল। চিঁড়ে, মুগডাল ভাজা, আর এক গেলাশ সরবত। আমার বেঞ্চে এ-সব রেখে সেও আর-এক দিকে বসে পড়ল। আর নিজের বাবার সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগল। এমন সরলভাবে প্রশ্ন করছিল যে আমিও নিঃসংকোচে উত্তর দিতে লাগলাম। তারপর বললে, "আপনি কত উদার যে আমার জন্মের ইতিহাস জেনেও আমাকে এত সম্মান করে কথা বলেছেন। আপনি আমার বাবার কথা তুলতেই আমি চমকে উঠেছিলাম। ভয় হয়েছিল আপনি আমাকে বিদ্রূপ করবেন। আমার মার নিষ্ঠা বিবাহিতা পত্নীর চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। কিন্তু পৃথিবীতে শুধু ভালোবাসার কি মূল্য আছে? সমাজে তাঁকে বেশ্যা বলেই হেনস্থা করেছে। তখন আমি খুব ছেলেমানুষ। আমরা সকলেই ওঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতাম। আমার মা তো ওঁকে পূজা করতেন। আর কেউ হলে, উনি আমাদের ত্যাগ করে যাবার আগেই ওঁর সম্পত্তি দখল করে সুখে থাকত। আমার মা তেমন প্রকৃতির ছিলেন না। ওঁর আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল। উনি গাঁ ছেড়ে চলে যাবার বেশ কয়েক বছর পরে আমার মা আমায় সঙ্গোপনে একটি কথা বলেছিলেন। তখন আমার বোঝবার বয়স হয়েছিল। উনি আমায় বলেছিলেন যে আমার বাবার সংসারে ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। কুমটা ছেড়ে যাবেন এই স্থির করার পর উনি

মার কাছে এসে খুব কেঁদেছিলেন। মাকে বলেছিলেন, 'সরসী, আজ পর্যন্ত তোমায় আমি কিছু দিতে পারি নি। তবুও তুমি আমাকে বিবাহিতা স্ত্রীর চেয়ে বেশি বিশ্বাস কর— আমি এখন চলে যাচ্ছি ; তোমার কি চাই, টাকা চাইলে টাকা দেব, বাড়ি চাও তো বাড়ি করে দেব। তোমার ঋণ আমায় শোধ করে যেতে হবে তো ?'

"এমন উদারতা আর ক'জনে দেখাতে পারে ? ওঁর কষ্টের কথা আমার মা সব জানতেন। টাকার লোভ মার ছিল না। তাই মা বলেছিলেন, 'আমার উপর আপনার বিশ্বাস যেন সর্বদা থাকে। এই আমার কামনা, আর কিছু আমি চাই না।' আমার মা কখনো মিথ্যে কথা বলতেন না। তাই জানি এটা সত্য। মা ভাবলেন উনি যদি সব কিছু আমাদের দিয়ে যান তা হলে তাঁর কী থাকবে ? আসলে তো ওঁর জীবন এত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, যে উনি আত্মহত্যাও করতে পারতেন, মা আমাকে এ কথাও বলেছিলেন।"

এ-সব বলতে বলতে ইন্দুমতি কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ল। আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কথায় কি কারুর দুঃখ ঘোচানো যায় ? তার ভাইয়ের কথা তুলতে ইচ্ছে করল না। কারণ সে তো মায়ের মৃত্যুসংবাদ আমার কাছে ভাঙে নি। এ কথা জানলে ও আরও দুঃখ পেত।

তারপর ওদের চাকরিবাকরি ও অবস্থার বিষয় সবিস্তার জানলাম।

যখন আমি যাবার জন্য উঠছি, তখন ও জিজ্ঞেস করল, আমার কাছে ওর বাবার কোনো ফোটো আছে কিনা ? আমি ওকে একটা ফোটো পাঠাব বলে কথা দিলাম। শুনে খুব খুশি হল। আমিও তারপর ওর মার কোনো ফোটো আছে কিনা জানতে চাইলাম। ও বলল, কোডকণীতে একটা আছে, ও গেলে নিয়ে আসবে। তবে সেটা খুব পুরনো ও অস্পষ্ট। আমিও আগ্রহ করেই বললাম, "সামান্য অস্পষ্ট হলেও কোনো ভালো চিত্রকরকে দিয়ে ওটা আঁকিয়ে নেওয়া যাবে।"

তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "ক'টার সময় বাস আসে? আমার কাজ তো হ'ল, এবার আসি তা হলে?"

"এখানে বাস সর্বদাই চলে, সেজন্য কিছু ভাবতে হবে না। আপনি এখন যেতে পারবেন না কিন্তু। উনি এখনি এসে পড়বেন, ওঁর সঙ্গে আলাপ করবেন না? উনিও আপনার লেখা বই পড়েন।"

"বই লিখে তো মুস্কিল হ'ল দেখছি।"

"আপনি ধারবাড়ের ভাষা বলছেন যে।"

"আমার কাছে, ধারবাড়, কুমটা, মঙ্গলুর, সব সমান।"

ইতিমধ্যে রাস্তায় একটা বাস থামবার শব্দ হল। "এসে গেছেন," বলে উঠল ইন্দুমতি, ওর চেহারা খুশিতে ঝলমল করে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাস্টারও এসে পড়লেন। ইন্দুমতি বৈঠকখানার সিঁড়ি দিয়ে নেমে দৌড়ে খিড়কির দোড়ে গিয়ে ওঁর কাঁধে হাত রেখে আমাকে দেখাল। উনিও তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমায় নমস্কার করলেন। ইন্দুমতি ওঁকে আগেই আমার কথা বলে দিয়েছে। উনিও অনেক দিনের পরিচিতের মতন কথাবার্তা শুরু করলেন।

সেদিন দুপুরে ওখানেই খেলাম। তারপরও ওরা আমায় ছাড়ল না। আমার গাঁয়ের বিষয়, আমার বিষয় সব জিজ্ঞাসা করল। সন্ধ্যাবেলা ওদের সঙ্গে সানেকট্টার নুনের ডিপো দেখলাম। বড় বড় গর্ত খুঁড়ে তাতে সমুদ্রের নোনাজল সংগ্রহ করে শুকিয়ে নিয়ে নুন তৈরি করাই ওখানকার কাজ। নুনের স্তূপগুলো শিশিরের মতো সাদা ঝকঝক করছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা গল্পে মশগুল রইলাম। সূর্য অস্ত গেলে বাড়ি ফিরলাম।

ইন্দুমতি ও জলজাক্ষীর স্বভাবে খুবই মিল ছিল, চেহারায়ও সাদৃশ্য ছিল। ইন্দুমতির রঙ একটু চাপা। কিন্তু চলন-বলন একেবারে জলজাক্ষীর মতোই। তবে জলজাক্ষীর তিনটি সন্তান হ'ল, সংসারে কষ্টও অনেক পেয়েছে। সে তুলনায় ইন্দুমতির এখনো

সন্তান হয় নি, যোগ্য স্বামীর হাতে পড়েছে। সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটছে। ওরা দুজনেই ভারি সরল।

পরদিন সকালের বাস ধরলাম। ওরা দুজনেই সেখানে এসে আমায় বিদায় দিল। আসবার সময় ইন্দুমতি ফোটোর কথা আবার মনে করিয়ে দিল। কুমটায় ফিরে আরও চারদিন থাকলাম। এরমধ্যে গত কয়দিনের ঘটনা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। দেখলাম এ যাত্রায় যথেষ্ট লাভ হয়েছে। আনন্দের শুধু একটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা অনেক দুঃখের স্মৃতিকে মুছে দিতে পারে।

সভাবন্তর কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য বাসে চড়লাম। সারা রাস্তা আমার নিরুদ্‌বেগে কাটল। আসবার সময় গরমে পথের কষ্ট যে আমাকে পীড়িত করেছিল তা এখন গায়ে লাগল না। কুমটা থেকে কুন্দাপুর গিয়ে, বেড়িয়ে-টেড়িয়ে, মনের আনন্দে বাড়ি ফিরলাম।

বাড়ি পৌঁছুবার পর এত উৎসাহ ছিল যেন আমি দিগ বিজয় করে ফিরেছি। এবার আমার বন্ধু যশবন্তের সম্পূর্ণ ছবি কল্পনা করতে পারি—যে ছবি গড়ে তোলবার সম্যক দৃষ্টি ও আধার দুটোই পেয়ে গেছি আমি।

মুদ্রার দু-পিঠই আমার দেখা হয়ে গেছে। যখন এটা চালু ছিল তখনো দেখেছি, আবার চলতে চলতে যখন এর অক্ষরগুলো মিলিয়ে গিয়ে শুধু চকচক করতে থাকল তখনো দেখেছি। এখনকার এ অবস্থা সত্ত্বেও এর অতীতের ইতিহাস আমার কাছে উজ্জ্বল ছিল। এ মুদ্রা কোন্ ধাতুর তৈরি, কোন্ সময়ের, যে বিষয় আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। তার মূল্য আমি ঠিক জানতাম। আর যখন ওটা অচল হল, আমার বন্ধুর মৃত্যু হ'ল তখনো ওর আসল সোনার দাম কমে নি— যে পরীক্ষা করতে পারে তার দৃষ্টিতে।

এ মুদ্রা আমার খারাপ নয়। এটা কাগজের নোটও নয়, যার মূল্য শুধু যে সরকার ওটা ছেপেছে তার সময়ের মধ্যেই সীমিত। শেষে শুধু কাগজের টুকরোই থেকে যায়।

এ খারাপ মুদ্রাও নয়, কাগজের নোটও নয়। আমি যাচাই করে দেখেছি, এ মুদ্রা শুধু সোনার তৈরি— টেঁকসই করবার জন্য অল্প তামা মেশানো হয়েছে। স্যাকরার মতো আমি বলতে পারব ওতে ঠিক কতটা সোনা আর কতটা তামা।

আমার কষ্টিপাথর হ'ল যশবন্তের ডায়েরি। আর-একটা কষ্টি-পাথর হ'ল বিষ্ণুপন্ত ঘাটে। সময়াভাবে এখন পুনায় যাওয়া হচ্ছে না। গেলেই জানা যাবে উনি কষ্টিপাথর হবার যোগ্য কি না। তাই এখন শুধু ডায়েরিই পড়ছি।

সরসীর বিষয় যশবন্তবাবু ডায়েরিতে কিছুই লেখেন নি, এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু এখন মনে হল এমন সুমধুর স্মৃতির বিষয় উনি কিছুই লিখবেন না, সে কি সম্ভব? এই উদ্দেশ্যে আবার ডায়েরিটা আদ্যোপান্ত পড়তে লাগলাম। একেবারে শেষের পৃষ্ঠায় দেখলাম, 'সিরসির নিজের বাড়িতে', আগে এটাকে স্বাদার কাছে সিরসি গ্রাম ভেবেই পাতাটা উল্টেছিলাম। সিরসির আড়ালে যে সরসীকেই লক্ষ্য করে উনি লিখেছিলেন তা এখন বুঝলাম।

শেষ পৃষ্ঠাটাকে উনি ডায়েরির মলাটের সঙ্গে সেঁটে দিয়েছিলেন। ওটাকে আস্তে আস্তে ছাড়াবার পর দেখলাম, পিছনে আরো লেখা রয়েছে। জেনেশুনেই ওটা লুকিয়েছিলেন। একটা রেখাচিত্রও ছিল, সরসীর কোমল সৌম্য সুশ্রী চেহারা।

বারো

"জীবনে যা কিছু সুখ পেয়েছি তা শুধু সরসীর কাছে কিংবা পার্বতাম্মার কাছে।

"মল্লিকালতার কথা মনে এলেই ভাবি যে ওর অস্তিত্ব কেবল নিজেরই জন্য, আমগাছের জন্য নয়। নিজেকে আমগাছের জায়গায়

রেখে, যতই মনকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে এ মল্লিকালতা আমারই, এর ফুলও আমার, কিন্তু শেষপর্যন্ত এই দেখি, না লতা, না ফুল, কেহই আমার নয়।

"সরসী কিন্তু সেরকম নয়। সে সমাজ-বহিষ্কৃতা, কিন্তু তবুও সেরকম নয়। নারীচরিত্র সব সময় বংশের উপর নির্ভর করে না। লাউগাছের ফল একরকম হয়। একটা দিয়ে মদিরাপাত্র তৈরি হয়, আর-একটা দিয়ে তানপুরা। তানপুরার কথা কেন মনে পড়ল? সে তানপুরার সঙ্গে গান শোনাত বলে। টাকা দিয়ে গান শোনা যায়, দৈহিক সুখ পাওয়া যায়। কিন্তু মনের আনন্দ টাকা দিকে কেনা যায় না। যে আত্মসমর্পণ করতে পারে সেই মনের আনন্দ দিতে পারে।

"সরসী সেইরকম ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে ছেড়ে চলে এলাম। ও যদি আমাকে এত সহজে ছুটি না দিত, জানি না আমার কী অবস্থা হত। আমার থেকে ও অনেক কিছু দাবি করতে পারত, কিন্তু করে নি। যখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কী চাও?' শুধু বললে, 'আপনি যেন কখনো আমায় অবিশ্বাস না করেন, এই চাই।' কতকাল আগের কথা, কিন্তু ওকে আমি ভুলতে পারি নি। কত বড় ত্যাগই না সে করেছে। 'গান শিখিয়ে আমি চালিয়ে নেব, আপনি কত কষ্ট করবেন?' সত্যিই অসাধারণ মেয়ে বটে। কেন যে সে আমায় এত বিশ্বাস করত জানি না, আমি কি তার অত বিশ্বাসের যোগ্য ছিলাম?"

এ-সব পড়বার পরই আমার চোখের সামনে ইন্দুমতির মায়ের চেহারা ভেসে উঠল। ইন্দুর চেহারায় বাপের আদল। রূপগুণেও বাপের মতোই, ওর বড় ভাইকে আমার ভালো লাগে নি সামান্য টাকার লোভে মার মৃত্যুসংবাদ গোপন করেছিল ব'লে। শম্ভু হেগ্‌গড়ে আর এ, দুজনেই প্রতারণা করেছিল।

গাঁয়ে ফেরার পর একমাস কেটে গেছে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা ঋতুতে চারিদিক সবুজ হয়ে উঠেছে। ইন্দুমতি আমার ঠিকানা নিয়েছিল।

ভাইয়ের কাছ থেকে মার ফোটো আনিয়ে, আমায় পাঠিয়ে লিখেছে, "কই আমার বাবার ফোটো পাঠালেন না তো ?"

এই ছবি দুটো দেখে কোনো ভালো শিল্পী দুজনেব একটি ভালো চিত্র এঁকে দেয়, তার চেষ্টায় রইলাম। তবে এ কাজ কোনো সাধারণ শিল্পী করতে পারবে না। তা ছাড়া আমাকেই ওদের স্বভাবের বর্ণনাও দিতে হবে, তবে তো ছবির মধ্যে ঠিক প্রাণ ফোটাতে পারবে ? অবশেষে একজন আর্টিস্ট বন্ধুর কথা মনে পড়ল।

ইন্দুর কাছে যশবন্তবাবুর ফোটোর একটা কপি করিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তখন জুন মাস, তাই যশবন্তের পাসের খবর চেয়ে জলজাক্ষীকে চিঠি লিখলাম। ওঁকে প্রতিমাসে যে পঁচিশ টাকা পাঠাতাম তা ছাড়া এবার পঁচিশ টাকা আরো বেশি পাঠালাম। একটা ফোটো তার কাছেও পাঠালাম। জলজাক্ষী যশবন্তকে দিয়ে চিঠি লেখালো,—যশবন্ত পাস করেছে, আর ওর ছোট ভাইরাও। জয়ন্ত হাইস্কুলে গেছে। "দাদামশাইয়েব ফোটো পেয়ে আমাদের খুব ভালো লেগেছে। মা কিন্তু কেঁদে ফেলেছিল। শোবার ঘরে বাবা ওটা টাঙিয়ে দিয়েছেন। তাতে রোজ একটি করে তাজা ফুলের মালা পরানো হয়, যেন ঠাকুর দেবতা !" ওদের এরকম ভক্তিভাব দেখে মন খুব প্রসন্ন হল। আমার ফোটো পাঠানো সার্থক হল।

ইন্দুও ভাবি খুশি হয়েছিল। ফোটোটা পেয়ে একটা মস্ত চিঠি লিখেছিল। "ছেলেবেলায় বাবাকে দেখেছিলাম, কোলেও উঠেছি, কিন্তু তাঁর চেহারা ঠিক মনে পড়ছিল না। ফোটোটা দেখতেই মনে পড়ে গেল। আপনি ফোটো পাঠিয়েছেন বলে যে আমার কী আনন্দ হয়েছে বলতে পারি না। সত্যি বলতে কি সেদিন আমি খেতেও ভুলে গিয়েছিলাম। আমি ওঁর মেয়ে বলে গর্ববোধ করছি। আজ আমার মা বেঁচে থাকলে, ছবিটা বুকে ধরে রাখতেন। লোকে যে যা বলে বলুক। নিজের লোক তো নিজেরই, না ?"

এরপর বিষ্ণুপন্তের সঙ্গে দেখা কবার আগ্রহ আরো বেড়ে গেল।

কবে যে ওঁর কাছে গিয়ে আমার বন্ধুর বিষয় আরো কিছু জানবার সুযোগ পাব জানি না। পুনা খুব কাছেও নয়, তাই একটা চিঠি দিলাম —"ঘাটে মহাশয়, আপনার বইটা কতদূর এগলো ? আপনার ওখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার সুবিধা যে কবে হবে তা কিছুই বলতে পারছি না। কিন্তু আপনার শরীর ভালো থাকলে যদি আপনি সংক্ষেপে যশবন্তবাবুর বিষয় কিছু আমায় লিখতে পারেন তা হলে বাধিত হব। যশবন্তবাবুর সঙ্গে আপনার স্নেহ-সম্বন্ধ কেমন করে হল ? মত-মতান্তর, ধর্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি বিষয়ে আপনার সঙ্গে নিশ্চয় উনি আলোচনা করতেন। কী কী বিষয় ওঁর বেশি প্রিয় ছিল ? আপনি তো ধর্মশাস্ত্রের উপরই বই লিখছেন ? আমি যতদূর জানি আমাদের সেকালের নিয়ম-কানুনে ওঁর বিশ্বাস ছিল না। আপনার আর ওঁর মনের এত মিল কি করে হ'ল ? চিঠিতে এত সব লেখা মুশকিল, তবে আপনি পণ্ডিত মানুষ, দু-চার লাইনে কিছু লিখে দিলেই যথেষ্ট। এ মাসের টাকাটা চিঠির সঙ্গে পোস্টাল অর্ডারে পাঠাচ্ছি। ভুলেও মনে করবেন না যেন আমার পত্রের সঙ্গে এ টাকার কোনো সম্পর্ক আছে।"

প্রায় দশদিন পরে ওঁর একটা বড় চিঠি পেলাম। তবে তা পড়ে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। এর আগে পর্যন্ত ওঁর পোস্টকার্ড ছাড়া কোনো বড় চিঠি আসে নি। তুমি কেমন আছ, বা আমি ভালো আছি, কিংবা আমার লেখার কাজ ঠিক চলছে— এর চেয়ে বেশি কিছু থাকত না সে চিঠিতে। এর আগের কার্ডটায় উনি লিখেছিলেন, "যশবন্তবাবু আমাকে বিশ্বাস করে আমার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পঁচিশ টাকা করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। ওঁর কাছে পঁচিশ টাকা বেশি কিছু নয় কিন্তু এখন আমি এক ভাবনায় পড়েছি। আমার জামাই এখন কিছু সাহায্য করছে। ছেলেও বড় হয়েছে, চাকরি খুঁজছে। আমার লেখাটাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এটা প্রকাশ করা একটা মস্ত সমস্যা।"

ওঁর বিষয় কিছুই আমার জানা নেই, তাই কোনোরকম আশা

দেওয়া সংগত মনে হল না। সন্দেহ হল, ইনি কি গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য আমার কাছে সাহায্য চাইছেন? কিন্তু চিঠিতে প্রথম দিকে যা লিখেছেন তাতে তাঁর প্রকৃতি ঠিক সেরকম মনে হল না। শেষে এ বিষয় জানার চেষ্টা না করে, আর চিঠি লিখি নি।

কিন্তু এবারকার চিঠিতে তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেল। চিঠিটার সারাংশ দিলাম। 'মহাশয়' বলে আরম্ভ করেছেন। পণ্ডিত-মানুষ যে। আমার একটু হাসি পেল। তারপর লিখেছেন, "যশবন্তবাবুর বিষয় আপনার জানবার আগ্রহ স্বাভাবিক। আমি যেটুকু জানি তা আপনাকে নিশ্চয় শোনাব। তবে আমি যে ওঁকে সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছি সে অহংকার আমার নেই। আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে বিপরীত ছিল। আমি নিষ্ঠাবান ধার্মিক লোক। সেকালের রীতিনীতি আমি মানি। উনি অন্ধ বিশ্বাস, অন্ধ সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছিলেন। উনি আমায় ঠাট্টা করে বলতেন: 'আপনি হচ্ছেন পণ্ডিতমানুষ। বটগাছ তার অগুন্তি শেকড় মাটিতে গেড়ে যেমন হাজার হাজার বছর বাঁচে, তেমনি আপনিও সনাতন ধর্মে বিশ্বাস করে আরামে আছেন। আপনার কোনো ভাবনাই নেই।'

"প্রথম যখন উনি মহাবলেশ্বর এসেছিলেন···তখন একলা ছিলেন। থাকবার জন্য বাসা খুঁজছিলেন। আমি বলেছিলাম—'আপনার যদি পছন্দ হয় তো আমার এই কুঁড়েঘরটার অর্ধেক আপনাকে ভাড়া দিতে পারি।' উনি বললেন, 'মন্দ কি। বড় বাংলো বাড়ি নিয়ে কী করব যখন শান্তির সন্ধানে এসেছি। এ পাহাড়ের দৃশ্যটাও চমৎকার। এখানে বসে ছবি আঁকতে পারি।' উনি দুমাস এখানেই ছিলেন। নিজের হাতেই রান্নাবান্না করতেন।

"ওঁর সব-কিছুই যেন অসাধারণ ছিল। বয়সও হয়েছিল, স্বাস্থ্যও বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না। আমার মতো অসুস্থ ছিলেন না বটে, তবুও নিজের হাতে রেঁধে খাওয়া কি কম কথা? মানুষ একলা থাকতে পারে না। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসতেন। বলতেন, 'কি করছেন, পণ্ডিতমশাই?' এ ধরনের অল্প কথাবার্তা

আমাদেব মধ্যে হত। হাঁপানীর দরুন বেশি পরিশ্রম করতে পারতাম না। সংস্কৃত শিক্ষা বংশানুক্রমে পেয়েছি। ধর্মশাস্ত্র পড়তে ভালো লাগত। সেরকম অনেক বই পড়েছিলাম। একদিন মনে হল, এত যে আমি পড়লাম, তা কী করে কাজে লাগানো যায়। ভাবলাম, যারা সংস্কৃত জানে না তাদের আমি মারাঠিতে এ-সব বোঝাতে পারি। তখন 'আমাদেব ধর্ম্মশাস্ত্র' বলে একটা বই লিখতে আরম্ভ কবলাম। যশবন্তবাবু এটা জানতেন।

"তাবপর থেকে প্রতিদিন উনি আমাব কাছে এক ঘণ্টা করে বসতেন। আমার বইপত্র দেখে জিজ্ঞাসা করতেন, 'এটা কী গ্রন্থ, কোন্ সময়ের লেখা, কী লেখা আছে এতে'—এইরকম নানান প্রশ্ন। আমি আমাব বুদ্ধি অনুযায়ী উত্তর দিতাম। একদিন ভাগবদ্‌গীতার বিষয় আলোচনা হল।

"আমি বললাম, 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এরকম বলেছেন।'

"উনি বলে উঠলেন, 'আপনি কি তা নিজে শুনেছিলেন? এটা কোন্ যুগের কথা?'

"মহাভারতেব যুগের। অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগেকার।'

"গীতা মহাভারতেরই একটা অঙ্গ না?

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ঋষি ব্যাসই তো এব রচয়িতা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।'

"ব্যাস কোন্ যুগের লোক?"

"মহাভারতের যুগেব।'

"এ-সব ছাড়ুন এখন। ইতিহাসের ব্যাস ঋষি যে মহাভারত লিখেছিলেন তিনি কবে ছিলেন? আপনাব পণ্ডিতরা এ বিষয়ে কি বলেন?"

"আমি বৈদ্যমহাশয়েব মত কি, তাই বললাম।

"তা হলে গীতাও সেই যুগের হল না? পাঁচ হাজার বছর আগে কৃষ্ণ যা বলেছিলেন, সেটাই ব্যাস ঋষি নিজের ভাষায় বলেছেন।'

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ…'বলে আমি যেই বাধা দিতে গেছি, উনি আবার চেপে ধরলেন, 'চার-পাঁচ হাজার বছর পরে যা ব্যাস ঋষির মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন।'

"আমি বললাম, 'আমি কিন্তু জিনিষটা এ ভাবে নিই নি।'

"আপনি এই বলবেন যে ব্রহ্মা নিজে এসে বেদ শুনিয়ে গেছেন।"

"তা তো সত্যিই।'

"তা হলে আপনার আমার মধ্যে এ বিষয় নিয়ে কোনো আলোচনা না করাই উচিত।"

"এইরকম আলোচনা আমাদের মধ্যে প্রায় রোজ হত। তাই বললাম, 'আমাদের দুজনের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত।' অবশ্য এতে আমার আশ্চর্যের কিছু ছিল না; আমার আশ্চয লেগেছিল যখন উনি আমায় মারাঠিতে ধর্মশাস্ত্রের বই লিখতে উৎসাহ দিলেন। আমি ওঁকে বলেছিলাম, 'যশবন্তবাবু, আপনার নিয়ম-কানুন বোঝা ভার। এদিকে আপনি আমার সঙ্গে সহমত নন, বলেন ধর্মশাস্ত্র হচ্ছে কত হাজার লোকের কত হাজার বছরের পুরনো বিশ্বাস, কিন্তু ওদিকে আমায় তা লিখতেও আপনি উৎসাহ দিচ্ছেন।' এর উত্তরে উনি শুধু বললেন, 'আমি যা, আপনি তো তা নন ঘাটে মশাই।'

"তা কি করে হতে পারি?"

"তাই আপনার লেখা দরকার। আমি যা বিশ্বাস করি সেটা শুধু আমারই। সেইরকম আপনার বিশ্বাস শুধু আপনার। সত্যের সন্ধান কে পেতে পারে তা বলা যায় না। আমিও পেতে পারি আর আপনিও। কিংবা দুজনের কেউই নয়। আর এও হতে পারে যে আমাদের দুজনেরই চিন্তাধারায় সত্য অসত্য দুইয়ের মিশ্রণ রয়েছে।'

"তা সম্ভব।'

"আপনি স্বীকার করছেন?"

"না স্বীকার করেও চলতে পারে।'

"যাই হোক, আপনার চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদেরও পরিচয়

হওয়া দরকার। বুদ্ধিমান হই বা না হই, আমরা নিজেকেই বুদ্ধিমান মনে করে নিজেরই পথে চলতে থাকি। তবে যেটাকে আমি সত্য মনে করি সেটাকে জোরজবরদস্তি করে অপরের উপর চাপানো উচিত নয়।'

"ওঁর কথা শুনে আমার ভাই খুব আশ্চর্য লাগল। আমাদের বিদ্বান কিংবা পণ্ডিতদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দোষ হল, প্রত্যেকে নিজের মতই ঠিক মনে করে, যেন বাকী সবাই মূর্খ। আমার বিশ্বাস ছিল, সংসারের হাজার ঝামেলার মধ্যেও সত্য নিজের জ্ঞানে অটল, তাকে দাবিয়ে রাখা অসম্ভব। কিন্তু এ বিষয় যশবন্তবাবুই আমার ভুল ভেঙে দিলেন। ওঁর বিষয় আর কী লিখতে পারি ভাই। উনি অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। ওঁর আসল রূপ বাইরে থেকে বোঝা যেত না।

"তারপর উনি আমায় ঐ কাজটা করতে পরামর্শ দিলেন: 'যে কাজ আপনি করতে পারেন সেটা আপনারই করা কর্তব্য। খুব বেশি সাহায্য তো করতে পারব না, তবে কাগজ কালি ও গোটাকতক বইয়ের জন্য যা লাগবে তা আমি দেব।' এটাই আপনার সেই মাসোহারা। উনি এ ভাবেই দিয়ে এসেছেন।

"এবার কিন্তু আমার খুব ভয় করছে। এ মাসের প্রথমে পাঁচশো পাতার বইটা অনেক খেটে শেষ করতে পেরেছি। আমি ধর্মভীরু লোক, সে তো আগেই বলেছি। যশবন্তবাবুর কথায় আমার চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছে। উনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতেন —এটা কবেকার কথা, কে বলেছে, কখন বলেছে, কেমন করে এর মীমাংসা হ'ল ইত্যাদি।—তখনই বুঝতে পারলাম যে আমার এ কাজটা যত সরল মনে হয়েছিল তত নয়। আগে যা লিখছিলাম সেটা নিঃসন্দেহে ঠিক বলেই জানতাম। এখন কিন্তু সে-সব ঠিক কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ হতে লাগল। যাই হোক, আমার লেখা আমি লিখে যাচ্ছি, সেটা ঠিক না ভুল পণ্ডিতরাই নির্ণয় করবেন। আপনি কবে আসছেন?" এইখানেই চিঠি শেষ।

বর্ষা শেষে আকাশে শরতের মেঘ দেখা দিয়েছে। চারিদিক সবুজ রঙে ভরে গেছে। পশুপাখিরা বর্ষার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে মনের আনন্দে বিচরণ করছে। চারিদিকেই ওদের আহারের সামগ্রী। কত পাখির কূজন কানে অমৃত বর্ষণ করছে। সূর্যের সঙ্গে মেঘের লুকোচুরি খেলাও শেষ। নীল আকাশ ঝলমল করছে। এ সময় কার না আনন্দ হয়?

বোম্বের কথা মনে পড়ে গেল। যুদ্ধের সময় বোম্বে ও আমাদের গ্রামের মধ্যে জাহাজ চলাচল বন্ধ ছিল, তবুও যাওয়া ঠিক করলাম। বাসে যাত্রা করলাম। পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে বাস চলল। তারপর সমতল প্রদেশে এসে ট্রেন ধরলাম। এখানকার বর্ষা আমাদের দেশের মতো কিংবা পাহাড়ের মতো নয়। কালোমাটির সারা রাস্তা জোয়ার, কাপাস, কালোতিলের সবুজ ফসলে ছেয়ে আছে। আমি ট্রেনে জানলার পাশে বসে দৃশ্য দেখছিলাম। হাওয়ায় ক্ষেতে যে ঢেউ তুলছিল তা দেখে আমার মনেও আনন্দের ঢেউ উঠছিল বলা বাহুল্য। বেলগাঁ পর্যন্ত চারিদিক সবুজে সবুজ। তার পর সন্ধ্যা হল। গাড়িতে বিশেষ গোলমালও ছিল না। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে সকালে পুনাতে জেগে উঠলাম।

বিষ্ণুপন্ত বরাবর বাড়িতেই থাকবেন, ওঁর চিঠিতে জেনেছিলাম। তাই স্টেশন থেকে টাঙ্গা করে সোজা শনিবারপেঠে ওঁর বাড়ি গেলাম। কিন্তু তখন উনি বাড়ি ছিলেন না। উনি জামাইয়ের বাড়ি থাকতেন। বাড়িতে মেয়ে-জামাই ছিল। কোনো কাজে উনি নাসিক গেছেন জানলাম। নাক চুলকাতে চুলকাতে জিজ্ঞাসা করলাম, "কবে ফিরবেন?"

"কালই এসে যাবেন," ওরা জানালো। আমি আমার পরিচয় দিলাম। বিষ্ণুপন্ত ফিরে আসা পর্যন্ত ওদের বাড়িতে আমায় থাকতে ওরা অনুরোধ করল। কিন্তু বিষ্ণুপন্তের অনুপস্থিতিতে ও-বাড়িতে থাকা সমীচীন নয় ভেবে বললাম, "আমি আটদিন পরে আবার আসব।" তারপর জলটল খেয়ে পন্তের নামে একটা চিঠি লিখে

রেখে এলাম। ওখান থেকে তখনি ট্রেনে বোম্বে রওনা হলাম।

যখন আমার মন খুশিতে অথবা বিষাদে ভরা থাকত তখন আমি তিন-চার দিনের জন্য বোম্বে ঘুরে আসতাম। বোম্বের তুলনায় আমাদের এখানটা নির্জন বলা চলে। বোম্বেতে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস, যাকে বলে—লোকারণ্য। আমার বন্ধু যশবন্তরায় তাই বলতেন, "অরণ্যটা যত বিশাল হবে, তাতে গাছপালাও হবে রকমারি। যে গাছ আপনি চান, তাই পাবেন। তবে গাছ শুধু চেনা চাই।"

ওখানে আমি কয়েকটা গাছ চিনতাম। গাছ—মানে লোক। এখানে আমার কতকগুলি বন্ধু থাকে— যারা এখানেই জন্মেছে, সারাজীবন এখানেই কাটিয়েছে আর যারা বোধহয় মরবেও এখানে। তারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাদের সঙ্গে কিছুদিন কাটালাম।

আসল যে কাজটা করব বলে মনস্থ করে এবার এসেছি, সেটা করা এখনও বাকী আছে। আমার আর্টিস্ট বন্ধু এখানেই থাকে। বোম্বে পৌঁছেই ওর সঙ্গে দেখা করেছি। বলেছি, "এতবার আপনার এখানে এসেছি, কিন্তু এবার আসার উদ্দেশ্য একেবারে ভিন্ন, বুঝেছেন? এবার আপনার পরীক্ষা নিতে এসেছি।" এই বলে, ব্যাগ থেকে যশবন্তবাবুর আঁকা গোটাকতক ছবি বের করে ওঁর সামনে রাখলাম। সঙ্গে যশবন্তবাবুর ফোটোটাও ছিল। বন্ধু যশবন্তের ফটোর দিকে তাকাল না দেখে ওটাকে পকেটস্থ করলাম। বন্ধু বেশ উৎসুক হয়ে এক একটা ছবি অনেকক্ষণ দেখল। 'গোরু', 'মোষের বাছুর', 'দাদা', 'বীমা', 'টাম।' ইত্যাদি। এ-সব দেখে ও হাসল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "হাসলে যে?"

"ইনি একচক্ষু হরিণ, আমরা তা নয়। চিত্রশিল্পী ইনি নন। এ-সব যে শিখতে হয়— এতে উনি নিপুণতা লাভ করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি যে কিছুই জানেন না, এ বলা যায় না। ওঁর মধ্যে দেখবার শক্তি আছে। এগুলো কে এঁকেছে?"

এখন পকেট থেকে ফোটো বার করে দেখালাম।

"ইনি কোথাকার লোক?"

"স্বর্গপুরের।"

"কোন স্বর্গপুর?"

"স্বর্গের পুরই স্বর্গপুর।"

"মারা গেছেন?"

"এবার খুশি তো? আপনি উনি, দুজনেই চিত্রকর, কিন্তু এখন আপনাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে না।" তারপর ওঁর বোম্বেতে থাকবার কথা বললাম। আমি যে উদ্দেশ্যে এসেছি তা সিদ্ধ করবার জন্য ওঁর জীবনের ছোটখাটো অল্প-স্বল্প ঘটনারও উল্লেখ করলাম। তারপর আস্তে এও বললাম, "আমি ওঁর জীবনী লিখছি। আপনি যদি ওঁকে চাক্ষুষ দেখতেন তো ভালো হ'ত। তবে যিনি মারা গেছেন তাঁকে আর কি করে দেখানো যেতে পারে। তার চেয়ে আপনি এই ফোটো রাখুন। আর এর সঙ্গে এটাও।" বলে সরসীর অস্পষ্ট ফোটোটা দিলাম। তা ছাড়া যে রেখাচিত্রটা ডায়েরির শেষ পৃষ্ঠায় ছিল সেটাও দিলাম। যশবন্তবাবুর দাম্পত্য-জীবন, সরসীর সঙ্গে সম্পর্ক, সব ওঁকে বললাম। "এবার এগুলি নিয়ে আপনি যা করতে পারেন করুন। চার দিন পরে আমি ফিরব। কিছু না করতে পারলে সব ফিরিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের ওখানে একজন ড্রইং মাস্টার আছেন, শেষে তাঁরই শরণাপন্ন হতে হবে। উনি যে-সব মৃত লোকের নামও জানেন না তাঁদের মস্ত ছবি এঁকে মাথায় জরির পাগড়ি পরিয়ে, পাশে ফুলদানী রেখে, 'ইনি অমুক জায়গার মহারাজ' লিখে দেন। তার মানে এই হ'ল যে আপনি পারেন তো ছবি এঁকে দিন, নইলে হার মেনে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করুন।" বলে ঠাট্টা করলাম।

বন্ধু বললেন, "আপাতত আমি কিছু বলতে পারছি না। শেষে যদি আত্মহত্যাই করতে হয় তো এক কাপ কফিতে ডুবে প্রাণ দেব।"

চার দিন পরে গিয়ে দেখলাম, ছবি আঁকা হয়ে গেছে। ছবিতে

তানপুরা কোলে নিরাভরণা সুন্দরী সরসী গান গাইছে, আর কাছেই যশবন্তবাবু ভাবে বিভোর হয়ে বসে গান শুনছেন।

ছবিটা দেখেই বলে ফেললাম, "ইন্দুমতি এটা দেখলে নেচে উঠবে।"

"ইন্দুমতি কে?" জিজ্ঞাসা করলে, বন্ধুকে ওদের কথাও বললাম।

আসল কাজ হয়ে যাবার পর, ছোটখাটো যে-সব কাজ বাকি ছিল সে-সব সেরে পুনায় গেলাম। বিষ্ণুপন্ত নিজে এবার দরজা খুললেন। ফর্সা, ছিপছিপে চেহারা, বেশি লম্বা নয়। আমাকে অভ্যর্থনা করে তাঁর নিজের মৃগচর্মে আমায় বসালেন। কুশল-প্রশ্নাদির পর কথাবার্তা শুরু হল। যশবন্তবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। তারপর, 'ধর্ম্মশাস্ত্র বিচার' বইটার পাণ্ডুলিপি আমায় দেখালেন। বললেন, "যশবন্তবাবুর কাছে বই লেখাতে যে প্রেরণা পেয়েছিলাম তার তুলনায় তাঁর আর্থিক সাহায্য কিছুই নয়। এটা ছাপা হবে কিনা, আর ছাপা হলেও কত পাঠক জুটবে তা বলতে পারি না। আমি সেরকম কোনো বড় লেখকও নয়। কিন্তু আমার কর্তব্য আমি করেছি।

"আর একটা কথা— আপনি কিছু মনে করবেন না। এ কাজটা শেষ হবার পর আর আমি যশবন্তবাবুর টাকা নিতে পারব না।"

আমি আশ্চর্য হলাম।

বিষ্ণুপন্তের সঙ্গে সেদিন অনেক কথা হল। মারাঠি ছেড়ে উনি ইংরাজিতে বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না।

ওঁর জামাই আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করল। প্রথম চিঠিটা উনি মারাঠিতে লিখেছিলেন, তখন তার অনুবাদ করাতে হয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে উনি জামাইকে দিয়ে ইংরাজিতেই চিঠি লেখাতেন।

যশবন্তবাবু ও ওঁর মধ্যে যে আলোচনা হত, তার গোটাকতক দৃষ্টান্ত দিলেন। বিষ্ণুপন্ত ধার্মিক লোক, তাই ওঁদের আলোচনাও ধর্ম নিয়েই হত। তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস, জীবনের সমস্যা,

মত-মতান্তর, ইত্যাদি বিষয় চর্চা হত। পন্তের ধারণা, ওঁদের দুজনের চিন্তাধারায় আকাশপাতাল প্রভেদ ছিল।

"আসলে আমাদের দুজনের সংস্কারই ছিল আলাদা— অতএব মতও আলাদা হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু উনি ছিলেন অতি সদাশয়, তাই আমায় এত সাহায্য করেছিলেন। এত উৎসাহ দিয়েছিলেন।"

আমি ওঁর কথায় সায় দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা বলুন তো পুনর্জন্ম, আত্মা, পরমাত্মা, এ-সব বিষয়ে আপনাদের কি মতামত ছিল?"

"আকাশে আর পাতালে যেরকম প্রভেদ। আমি ছিলাম বিষ্ণুপন্থ, উনি ছিলেন যশবন্ত রায়।"

"ওঁর কি মত ছিল তা আপনি জানতে পেরেছিলেন?"

"ওঁর মতকে একরকম অদ্বৈতবাদ বলা চলে। তাকে আমি আধুনিক অদ্বৈতবাদ আখ্যা দিয়েছি। যেমন দ্বৈতবাদীরা শঙ্করাচার্যকে নাস্তিক বলে থাকে সেরকম আমিও ওঁর একটা আলাদা নাম দিতে পারি। এরকম লোকের বিশ্বাস জীবনের উপর। আত্মা-পরমাত্মার প্রশ্ন তাই এরকম লোকের কাছে ওঠেই না। ভক্তি, মোক্ষ— এ-সব কথা ওঁদের কাছে নিরর্থক। আমি একবার ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি কি বলতে চান, পরমাত্মা নেই?' তখন উনি উল্টে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা তো আপনিই বলতে পারবেন, যদি তাঁকে দেখে থাকেন।'

"বেদে যে তাঁর কথা আছে। প্রত্যেক ধর্মেই আছে।"

"যে-সব ধর্মের কথা আপনি জানেন, শুধু তাদেরই মধ্যে তো? এমন ধর্মও তো আছে যাতে পরমাত্মার কথাই তোলা হয় নি। এরকম ধর্মে— নিজেকে জানা, আত্মজ্ঞান নিয়েই কথা তোলা হয়েছে।"

"আমি যদি বলি, সব ধর্মের মধ্যে সনাতন ধর্মই শ্রেষ্ঠ।"

"যার যা বিশ্বাস, তার পক্ষে সেটাই শ্রেষ্ঠ" বলে উনি শুধু হাসলেন।

"প্রশ্ন উঠতে পারে— তা হলে কি উনি নাস্তিক ছিলেন ? জগতের জীব বলো, প্রাণী বলো, সকলের উপর ওঁর অগাধ প্রেম ছিল, ওঁর কাছে সবাই সমান। উনি কারুর মধ্যে ভেদভাব করতেন না, দ্বৈতদৃষ্টিতে দেখতেন না। তাই অদ্বৈত শব্দ ব্যবহার করেছিলাম। এটাকে ঠিক ধার্মিক চিন্তাধারা বলা চলে না।"

যশবন্তবাবুর সঙ্গে মতভেদ থাকলেও, তাঁর ব্যক্তিত্বে বিষ্ণুপন্তের অপার শ্রদ্ধা দেখলাম।

সেখান থেকে ওঠার আগে জিজ্ঞাসা করলাম, "বইটা ছাপাবার কি ব্যবস্থা করেছেন ?"

বললেন, "কিছুই করি নি।"

"কত লাগবে ?"

"আর্যভূষণ প্রেস তো বলছে, প্রায় তিন হাজার।"

"কোনো প্রকাশককে দেখান নি ?"

"দেখাই নি তা বলব না। তবে কোনো লাভ হয় নি। ওরা কেউ নেবে না। গল্প, উপন্যাস তো নয় ? এ যুগে ধর্মশাস্ত্র কে পড়তে যাবে ?"

হাসতে হাসতে বললাম, "আমি তো গল্প, উপন্যাস লিখি। আমি জানি গল্প লিখলে লোকে পড়বে, কিন্তু ওটা কে পড়বে ? আধুনিকতা একেই বলে। ভুঁইফোড় আধুনিকতা। এরা জানে না যে ফুল ফোটার আগে, বীজ থেকে গাছ হবে, গাছ থেকে শাখা-প্রশাখা বেরুবে, তারপর কুঁড়ি হবে, তারপরই ফুল ও ফল। তবুও আপনি চেষ্টা করে দেখুন," বলে চলে এলাম।

আপনারা বুঝতেই পারছেন আমি বেশ প্রফুল্ল হয়ে বাড়ি ফিরলাম। আস্তে আস্তে আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। যশবন্তবাবু যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা এখন সহজেই উদ্ধার হয়ে যাবে। বেনকাইয়ার মন্দিরের সংস্কারে প্রায় দু-হাজার খরচ হয়েছে। শীনকে টাকা না দিলেও চলবে, কিন্তু মঙ্গাইয়া ও তাঁর ছেলেদের দিতেই হবে। কত খরচ করলাম, কত বাঁচল—হিসাব করতে

লাগলাম। বেনকাইয়ার মন্দির তো করতেই হবে ভেবেছিলাম। বিষ্ণু পন্তের বইটা ছাপাবার জন্য যশবন্তবাবুর নাম করে তিনহাজার দিতেই হবে। বাকী টাকা থেকে যশবন্তবাবুর জামাই-এর পরিবারকেও দেব নিশ্চয়। এরজন্য যা দরকার তা করতে লাগলাম। মঞ্জুইয়াকেও জিজ্ঞাসা করলাম। পন্তকে চিঠি দিলাম। ইন্দুমতিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওর পিতার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ও কী চায়। যা চাইল তাই করলাম। নিজের জন্য আমি শুধু ওঁর ডায়েরিটা রাখলাম।

এবার শেষ হিসাব করে দেখা যাক্। আমার হিসাব নয়: যশবন্তবাবুর সারাজীবনের লেনদেনের হিসাব-নিকাশ। তাঁর ডায়েরির মাধ্যমে যে দৃষ্টি আমি লাভ করেছি, সেই দৃষ্টি দিয়ে তাঁর সারাজীবনের হিসাব।

সমাজ থেকে, সংসার থেকে মানুষ যত নিয়েছে, যাবার আগে তার থেকে কম দিয়েছে, না বেশি? ঋণ শোধ করার পর কে কার ঋণী রইল?

আমার মতে, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যশবন্তবাবু নিয়েছেন যত, তার থেকে কোনো অংশে কম দেন নি।